শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

পঞ্চদশ পর্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে, কমলকুটিরে ও শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়িতে গমন

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে আগমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন

১৬ই অক্টোবরের পর আবার আমরা আসছি ২৬শে নভেম্বরের বর্ণনায় (পৃঃ ২৯৬), এক মাসেরও অধিক দিন পর মাস্টারমশাই বর্ণনা দিচ্ছেন। কোন কারণে মাস্টারমশাই হয়ত এত দিন ঠাকুরের কাছে আসতে পারেননি।

২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩ সালের কথা ভাবলেই মনে হয়, এই তো সেদিনকার কথা। ১৯৮৩তে আমি রামকৃষ্ণ মিশনে এসে গেছি –মাত্র একশ বছরের তফাৎ, ভাবলে কেমন অবাক লাগে। আর যেসব জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসব জায়গার নাম এখনও অপরিবর্তিত আছে –সেই দক্ষিণেশ্বর, বেলঘরিয়া, বাগবাজার, বড়বাজার। ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে ঠাকুরের অনুরাগীরা যাঁরা কলকাতায় আসেন, তাঁরা এবং বর্তমানকালের বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুরের ভক্ত যাঁরা আছেন, তাঁরা কলকাতায় এলে ঠাকুর যে যে জায়গায় গিয়েছিলেন, সেই লীলাস্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। সেইরকম একটি জায়গা হল সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজ, যেখানে এই দিন ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হবে। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন। পরে পরে যখন ইতিহাস রচনা হবে তখন এই বর্ণনাগুলি কাজে দেবে। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তরা এসেছেন। ঠাকুর সবার সাথে আলাপ করছেন।

সমাজের পদ্ধতি অনুসারে পূজাদি সম্পন্ন হয়ে গেল। এটা খুব জরুরী –যে মতকে আপনি গ্রহণ করেছেন, সেই মতে যে রীতি অনুসারে উপাচার ও পূজাদি করার পদ্ধতি আছে সেই অনুসারে সব কিছু পালন করতে হয়। ইদানিং ইয়ং ছেলেমেয়েরা, নূতন প্রজন্মের যারা তারা প্রশ্ন করে, এটা কেন করা, সেটা কেন করা, ইত্যাদি। এত প্রশ্ন করার কি আছে। বিভিন্ন বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে ক্লাশ শুরু হওয়ার আগে সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে সমবেত ভাবে প্রার্থনা করে। বিভিন্ন স্কুলে প্রারম্ভিক প্রার্থনা বিভিন্ন প্রকারে হয়। এক এক স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীত এক এক রকমের হয়। প্রত্যেক স্কুলে তাদের নিজস্ব একটা বিধি আছে। আমাদের মিলিটারিতেও এক একটা রেজিমেন্টে এক এক রকমের রিচুয়াল। রিচুয়াল হল একজন একক, তারা যে এটার পুরো সমূহ, যেটার সঙ্গে নিজেকে এক মনে করছে –এটাই হল ওই রিচুয়ালের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া।

ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনকে আধার করে কেউ যদি রিচুয়ালস করেন, ধরুন, আপনারা যাঁরা আমাদের ক্লাশ শুনছেন, আপনারা ভক্ত বলেই শুনছেন। এরপর আপনার মনে ইচ্ছে হতে পারে, রামকৃষ্ণ মিশনের যে দিনলিপি, সেই দিনলিপি অনুযায়ী আমি জীবনযাপন করব। আমরা সন্ন্যাসীরা তখন স্বাভাবিক ভাবে আপনাকে বলব –সকালবেলা শীতকালে সকাল সাড়ে চারটা আর গরমকালে চারটের সময় বেলুড় মঠে মঙ্গল আরতি হয়। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা সবাই মঙ্গলারতিতে অংশগ্রহণ করেন।

আপনাদের পক্ষে অত সকালে ওঠা সম্ভব হবে না। তাই আপনারা সকাল পাঁচটার সময় উঠে এক ঘন্টা কি দু ঘন্টা জপধ্যান করলেন, তারপর স্তব পাঠাদি করলেন। আমাদের বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীরা যাঁদের তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাঁদের দু বছরের জন্য আমাদের ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে থাকতে হয়। এই দুটি বছর তাঁদের একেবারে নির্দিষ্ট সুশৃঙ্খল দৈনন্দিন রুটিনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। মঙ্গল আরতির পর মন্দিরে জপধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ এবং সাড়ে ছটার সময় ব্রেকফাস্ট। তারপর মন্দিরাদিতে প্রণাম করে পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গেলেন। নটা থেকে ক্লাশ, পৌনে বারোটার সময় দুপুরের খাওয়া, তারপর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম।

আপনারা সংসারে আছেন, আপনাদের রুটিন এনাদের থেকে একটু ডানদিক বামদিক হবে। বিকালবেলা একটু হাঁটাহাটি, ঘোরাফেরা। সূর্যাস্তের পর মন্দিরের সন্ধ্যারতি, দিন শেষ। এরপর আবার জপধ্যান, রাত্রিতে হাল্কা খাওয়া। খাওয়ার পর নিজের মত একটু পাঠ করলেন, গল্প করলেন –তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এই হল রামকৃষ্ণ মিশনের জীবনধারা। যে কোন মানুষ খুব সহজে এই জীবনধারাকে আপন করে নিতে পারেন; কারণ এটাই হল হিন্দু জীবনধারা। আমরা অল্প বয়স থেকে দেখে আসছি, আমাদের এখানে যাঁরা বিভিন্ন ধরণের কাজ করছেন, এখানে ইঞ্জিনিয়ার আছেন, ডাক্তার আছেন, কলেজের শিক্ষক আছেন, স্কুলের শিক্ষক আছেন; সবারই একই রকম জীবনধারা।

ব্রাহ্মসমাজের সবাই যে খুব উচ্চমার্গের তা তো নন, সব রকমের মানুষ আছেন। কিন্তু ওনাদের যে অর্চনাবিধি, সেই বিধিকে ধরে ধরেই সবাই উঠছেন। রামকৃষ্ণ মিশনে যাঁরা নূতন জয়েন করেন, একদিনেই তাঁরা বিরাট কিছু হয়ে যাচ্ছেন, তা তো না। আজকে আপনারা যাঁদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, ইউটিউবে যাঁদের আপনারা দেখছেন, এনারাও সবাই একদিন নূতন ব্রহ্মচারী ছিলেন। এনারাও এক সময় বড়দের হাত ধরে উপরে উঠেছেন। এই রকমই তাঁদের জীবনধারা ছিল, এভাবেই তাঁরা ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরী করেছেন। পরিশ্রম, নিষ্ঠার প্রভাবে আজ তিনি এই জায়গায় এসে পৌঁছেছেন। অনেকে বলতে পারেন, ঠাকুরের কৃপাতে পৌঁছেছেন; বলতে পারেন কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা আর পরিশ্রমটাকে তো অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সবাইকে তো ঠাকুর কৃপা করছেন না। আজকেই একজন ভক্তের সাথে আমার মন্দিরে দেখা হল। বয়স্ক মানুষ, দেখা হতেই চোখে জল নিয়ে বলতে শুরু করলেন –ঠাকুরের ইচ্ছাতেই আজ আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, ঠাকুরের কি কৃপা। আরে, ঠাকুরের ইচ্ছা এখানে কি আছে? বছরের পর বছর ধরে আমি রোজ এই সময় মন্দিরে থাকি, তা আপনি এখন এসেছেন এতে ঠাকুরের ইচ্ছার কি আছে। তবে ওনার ভাব, এর বেশি বলাও যায় না। কিছু বললে লোকেরা কষ্ট পাবেন। কিন্তু কি হয়, এগুলোই অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে খেলো হয়ে যায়।

যাই হোক, ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে উপাসনাদি চলছে। মাস্টারমশাই এখানে ঠাকুরের খুব সুন্দর একটা বর্ণনা করছেন –**পরমহংস ভাবে নিমগ্ন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক্ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন। আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন, আর দেহটি মাত্র শূন্যমন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে**। বেদের ঋষিরা কিভাবে থাকতেন, কি কি করতেন আমরা খুব বেশি জানিনা। মহাভারতে, ভাগবতে কিছু কাহিনী আদিতে ঋষিদের কিছু কিছু বর্ণনা আমরা পাই। কিন্তু আমাদের যে মূল গ্রন্থ বেদ উপনিষদে সে-রকম কিছু পাই না। উপনিষদে আমরা পাই, ঋষির আশ্রমে থাকতেন, গরু চড়াতেন, তার সাথে বেদ মুখস্ত করছেন। কিন্তু সেই সময় অবতার পুরুষ যখন আসতেন, বা অতি উচ্চমানের যে ঋষিরা ছিলেন, তাঁদের জীবনধারা কেমন ছিল আমরা জানি না।

গীতায় অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করছেন –*স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। স্থিতধীঃ কি প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।।* যিনি ধর্মপ্রাণ মানুষ, যিনি ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁদের আচরণ কি রকম হয় আমরা জানিনা। মহাভারতে আছে, যুদ্ধের অনেক পরে একদিন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, যুদ্ধের সময় আপনি আমাকে যে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটা আমি ভুলে গেছি। অনেকে মনে করেন মহাভারতে পরে এই অংশটাকে আলাদা রচনা করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে এটাও

জুড়ে দিতে হবে –মনে না থাকারই কথা। যাই হোক, অর্জুনের কথা শুনে ভগবান অসন্তুষ্ট হয়ে খুব সুন্দর কথা বলছেন, তখন আমি একটা ভাব অবস্থায় ছিলাম, তাই আমি এখান আর ওই কথাগুলো বলতে পারব না, তবে তোমাকে অন্য ভাবে জিনিসটাকে বলছি। চৈতন্যচরিতামৃত যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা দেখবেন, সেখানে থেকে থেকে মহাপ্রভুর অন্তর্দশার বর্ণনা পাওয়া যাবে।

যত আমরা ইতিহাসের কাছে এই ধরণের কাউকে পাব, তত আমরা এই জিনিসটাকে ভাল বুঝতে পারব। সন্ত মহাত্মারা কিন্তু সবাই এই রকম হন না। কদাচিৎ কখন জীবনে একবার দুবার একটু সমাধি হল, তার বেশি না। কিন্তু ঠাকুরের এটাই মুহুর্মুহু হচ্ছে। এটাই অবাক লাগে, ওখানে ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা সবাই মিলিত হয়েছেন, তাঁরা চোখের সামনে ঠাকুরের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন। ব্রাহ্মরা উপাসনাতে উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করছেন, '*সত্যং জ্ঞানমনন্তং*' ইত্যাদি, শব্দগুলো শুনতেই তিনি সমাধিতে লীন্ হয়ে যাচ্ছেন। এই দৃশ্য উপস্থিত ব্রাহ্মদের মধ্যে কোথাও একটা জোর দাগ ছাড়ার কথা, হয়ত ছেড়েছিল। যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁরাই হয়ত আজ আমি আপনি হয়ে জন্মগ্রহণ করে কথামৃতে সেই দৃশ্যের বর্ণনা শ্রবণ করছি। পুরোমাত্রায় সম্ভবনা আছে। মানুষ যখন চোখ দিয়ে কোন অদ্ভুত জিনিসকে অনুভব করে; যেমন ধরুন, একজন ভিভিআইপির সঙ্গে যদি আপনার দেখা হয় বা প্রথম যেদিন হিমালয় দেখলেন, বা কোন অঘটন ঘটতে দেখলেন, এই দৃশ্যের একটা ছাপ ভিতরে থেকে যাবে। ঠাকুরের এই সমাধির অবস্থা দেখে তাঁদের ভিতর যদি ছাপ না পড়ে, তাহলে তো অবাক হওয়ারই কথা। একটাই বলতে পারি, আমরাই হয়ত তখন সেইখানে ছিলাম। সেখান থেকে আজ এই জন্মে আমরা একটু ভালো হয়ে ঠাকুরের ভাবধারাতে এসে জুড়ে গেছি। আমি এটা আমার অনুমানে আন্দাজে বলছি, বাস্তব মনে করে নেবেন না।

কীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
গৃহস্থের প্রতি উপদেশ

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন, 'নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করা কঠিন'। আপনারা অনেকেই তর্ক করেন, সংসারে থেকে কেন হবে না, কেন কিছু করা যাবে না, ইত্যাদি; দেখুন ঠাকুর পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করা কঠিন। **প্রতাপ বলেছিল, মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করেছিলেন, আমরাও তাই করব**। গীতাতেও ভগবান জনক রাজার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন –*কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ*। **আমি বললুম, মনে করলেই কি জনক রাজা হওয়া যায়! জনক রাজা কত তপস্যা করে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা করে তবে সংসারে ফিরে গিছলেন**।

এখানে একটা দুটো কথা বলা দরকার। প্রথমের দিকে শেখার সময় একজনকে ধরে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে আমার কিছু শ্রোতা ভক্তদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যাঁরা এসে বলেন, 'মহারাজ ধন্য হয়ে গেলাম আপনার দেখা পেয়ে, আপনার ক্লাশ আমি নিয়মিত ইউটিউবে শুনি। আপনি অমুক মহারাজ না'? বলেই, অন্য একজন মহারাজের নাম নিচ্ছেন। অথচ নিয়মিত শুনছেন, কাকে শুনছেন জানি না। আবার আর-একদিন আর-একজন ভক্ত এসে দেখা করে বলছেন, 'আমি আপনাকে নিয়মিত শুনি', বলেই আবার দেখাচ্ছেন 'এই বই কিনলাম, বিদেশের অমুক মহারাজ এই বইএর উপর অনেক লেকচার দিয়েছেন'। আমি বললাম, 'ভাই যাঁকেই করো, গুরু একজনকেই করো। একটু এখানে, একটু ওখানে –এভাবে হয় না'। প্রথমের দিকে শেখার সময় একজনকে ধরেই এগোতে হয়। অনেকটা পাকা হয়ে গেলে তখন আর-একটু এদিক ওদিক দেখতে হয়। তারপর যেটা খাটে সেটাই নেবেন, বাকিটা ঠাকুর দেখে নেবেন। প্রথমের দিকে গুরু ভালমন্দ হয় না, মায়ের মত। আমার মা গ্রামের মেয়ে,

পড়াশোনা করা হয়নি, কিন্তু বুদ্ধি বিরাট; লেখাপড়া হয়নি তো কি হল! ভাল হোক, মন্দ হোক, শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক মা মায়ই। যাঁর কাছে আপনি প্রথম শাস্ত্র শুনছেন, তিনি আপনার গুরু।

আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, গত হয়েছেন; শেষের দিকে বারাসত মঠে ছিলেন; এত ভাল মানুষ ছিলেন যে কি বলব। এক সময় তিনি সারদাপীঠে ছিলেন। নূতন কোন ব্রহ্মচারীকে একদিন বলছেন, 'দেখ ভাই, আমি পণ্ডিত নই, তুমিও পণ্ডিত নও, কিন্তু সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না; আমার সঙ্গে চলো, আমার সাথে বসে গীতা পাঠ কর, গীতা মুখস্ত কর'। এটা আমি অনেক আগেকার কথা বলছি, সত্তর দশকের কথা হবে। এই ভাবে তিনি অনেক নূতন ব্রহ্মচারীদের নিয়ে গীতা মুখস্ত করিয়ে দিতেন। উনি কোন পণ্ডিত সাধু ছিলেন না, কোন দিন ওনাকে আমি বক্তৃতা দিতে দেখিনি। কি মধুর ভাব, সবার প্রতি কি ভালবাসা। কি সুন্দর কথা –আমিও পণ্ডিত না, তুমিও পণ্ডিত না; আমার সঙ্গে বসো, গীতা মুখস্ত কর। সেই ব্রহ্মচারীদের মধ্যে আজ অনেকেই বিরাট নাম করেছেন। এই হচ্ছে ভাব। ওনার কাছে যাঁরা গীতা শিখেছিলেন, কিছু না হোক তাঁদের নিজেদের ধন্য মনে করা উচিত।

অনেক পরে ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়। বেলুড় মঠে আমরা একসাথে ডাইনিং হলে পাশাপাশি বসে খেতাম। এক সময় আমি আমার পোস্টিংএর জন্য কিছু দিন বেলুড় মঠে থাকতে হয়েছিল। সেই সময় তিনি একজন সেতার বাদকের একটা খুব সুন্দর গল্প বললেন। খুব মিষ্টি করে বললেন, 'যে কোন কারণে তোমাকে আজ বেলুড় মঠে থাকতে হচ্ছে, এখন তোমার হাতে কোন কাজ নেই, এই সময় তুমি তোমার শক্তি সঞ্চয় করে নাও, এটাই পরে তোমার কাজে দেবে'। ওনার এই কথাটা আজ পর্যন্ত আমি ভুলতে পারলাম না। কাজের সুযোগ যখন নেই, হাতে কোন কাজ নেই –এই সুযোগ, শক্তি সঞ্চয় কর। যখন কাজের সুযোগ আসবে, তখন সেই শক্তির প্রকাশ কর।

আপনারা নিয়মিত যাঁরা আমাদের ক্লাশগুলো শুনছেন, গীতা ও উপনিষদে অনেকবার শুনে থাকবেন, সেখানে বলছেন –হিন্দু ধর্ম ধর্মসাধনের জন্য দুই প্রকার পথের কথা বলেন। প্রথম পথ প্রবৃত্তিলক্ষণ, কর্মের পথ আর দ্বিতীয় পথ নিবৃত্তিলক্ষণ, ত্যাগের পথ। ত্যাগের পথ সন্ন্যাসীদের জন্য, ত্যাগ ছাড়া হয় না। যাঁরা সংসারে কর্ম আদি করেন, তাঁদের বলা হয় কর্মের মাধ্যমে ধর্মসাধন। অর্থাৎ তোমার যে নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি কর্ম করতে হবে, এই কর্মগুলিকে যতটা সম্ভব নিষ্কাম ভাবে করা। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলছেন –*ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*, সমস্ত কিছুকে ঈশ্বর রূপে দেখ। যদি এটা না করতে পার, ত্যাগের পথ যদি তুমি না নিতে পার, তাহলে –*কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি*, কাজ করে যাও। *ন কর্ম লিপ্যতে নরে* –কিন্তু কর্মে লিপ্ত হবে না।

তার মানে সংসারে থেকেও সাধন করা যায়। আমরাও অনেক সাধকদের দেখি যাঁরা সংসারে থেকে সাধনা করেছেন। অনেক সিদ্ধপুরুষের কথা, রাজা জনকের কথা, যাজ্ঞবল্ক্যের কথা আমরা পাই, আর অনেক ঋষিদেরও জানি, যাঁরা সংসারে ছিলেন। অবতারদের মধ্যে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, এনারাও সংসারে ছিলেন। আবার অন্য দিকে কপিল মুনি ত্যাগী ছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু ত্যাগী ছিলেন। আমাদের ঠাকুরও ত্যাগী ছিলেন, কিন্তু সংসারকেও ছুঁয়ে রেখেছিলেন।

প্রায়ই লোকেরা বলে, আমি জনক রাজার মত। কিন্তু জনকের ত্যাগ, তপস্যা কতটা নেবেন বলা মুশকিল, হয়ত আবার রাজা হওয়ার ইচ্ছাও আছে। সবাই রাজা জনকের মত হওয়ার কথা বলেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মত হব কেউ বলেন না, আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি। আমাদের ভক্তদের মধ্যে প্রচুর ভক্ত আছেন যাঁরা সংসারে থেকে সাধনা করে যাচ্ছেন। তাহলে সংসারে থেকে কতটা হবে?

ঠাকুর এখানে জনক রাজার কথা উঠতে বলছেন –জনক রাজা কত তপস্যা করে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা করে তবে সংসারে ফিরে গিছলেন।

তপস্যা চাই। এই তপস্যার পর যদি সংসার করেন বা সংসারে থেকে যদি এভাবে তপস্যা করতে পারেন, তাহলে হবে। তা নাহলে যেটা হয় সেটা খুব বিপজ্জনক। কি রকম বিপজ্জনক? সংসারে থেকে সংসারের টুকটাক যে ভোগটুকু করছেন; কিন্তু যখনই আপনি ঠাকুরের কাছে আসছেন, এসে আপনি সেই প্রার্থনাই করছেন –ঠাকুর আমার যেন এই ভাল হয়, এই সমস্যা যেন মিটে যায় ইত্যাদি।

কিছু দিন আগে সকালবেলা আমি মন্দিরে যাচ্ছি। সকাল সাতটার মধ্যে আমি মন্দিরে পৌঁছে যাই। সেদিন আমি সাড়ে সাতটা কি পৌনে আটটার সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি, দেখছি একজন মহিলা ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। ওই দেখে আমার খুব রাগ হয়ে গেল, আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। জোর ধমক দিলাম –'আনন্দস্বরূপ যিনি, তাঁর সামনে এসে আপনি কাঁদছেন? আপনার লজ্জা করা উচিত। ঠাকুরের কোন ভাব কি এখনও আপনার ভিতরে ঢোকেনি'? একটা ঘটনার কথা আগে হয়ত আপনাদের বলেছি।

অনেক বছর আগে আমার সেন্টারে কর্তাদের সাথে আমার একটু মতান্তর হয়েছিল। অল্প বয়স তখন, ঠিক করলাম বেলুড় মঠে এসে কর্তাদের গিয়ে সব বলব, দেখুন ওখানে এই এই হচ্ছে। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ, আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওনাকে গিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করার পর আমাকে দেখে কি মধুর হাসি, বয়স কম হলেও আমাকে চিনতেন। কি খবর, কেমন আছ, কবে এলে? আপনাদের আমি সত্যি কথা বলি –আমি লজ্জায় মরে গেলাম। যিনি সঙ্ঘের প্রধান, যিনি ভালবাসার প্রতিমূর্তি, যাঁর মধ্যে এই ভাব, কি করে আমার মাথায় এই ধরণের ভাবের উদয় হয়, তাঁকে কি করে আমার মনের আবর্জনাগুলো বলব?

এই রকম আর-একটা ঘটনার কথা আগে বলেছিলাম। একবার আমি খুব রেগেমেগে ছিলাম, ওই অবস্থায় আমি মন্দিরে আরতিতে আসছিলাম আর ঠিক সেই সময়েই রাম মহারাজ, স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই বলছেন, 'কি হল, খুব তেতে আছ মনে হচ্ছে'? পুরোটা ওনাকে বললাম। উনি চুপ করে পুরোটাই শুনলেন। সবটা শোনার পর বলছেন – 'তিন লোকের যিনি রাজা, তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আরতিতে এই রকম মন নিয়ে তাঁর সামনে তুমি যাচ্ছ'? ফণা তোলা সর্প মন্ত্রবিদ্ধ হয়ে যেমন কেঁচো হয়ে গর্তের ভিতর ঢুকে যায়, আমার অহঙ্কারও ঠিক সেই রকম লজ্জায় মাথাটা হেঁট করে দিল।

ঠাকুর আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তিন লোকের অধিপতি, যাবতীয় যা কিছু আছে সবের তিনি অধিপতি, তাঁর সামনে এই রকম কাঙালি হয়ে ক্রন্দন করবেন –ওগো ঠাকুর আমার কি হলো গো? কান্নাকাটি করার থাকলে বাড়িতে বসে কাঁদুন, এখানে এসে কেন এই আধ্যাত্মিক পরিবেশটাকে নষ্ট করছেন? আর কিছু না হোক ওখানকার তন্মাত্রাটা তো নষ্ট করছেন। আর পাঁচজন যাঁরা ঠাকুরের নাম করছেন, তাঁদের মনকে আপনি বিষিয়ে দিচ্ছেন। বিষয় কামনা আপনি তো করবেনই করবেন, আপনার স্বভাবেই এটা। ফলে কি হবে, ত্যাগ হওয়া তো দূরের কথা, নিষ্কাম কর্ম করা তো দূরের কথা; আরও ভোগ-বাসনা বাড়বে। হয়ত আপনারা জিনিসটা বুঝলেন না। আপনাদের একটা মজার গল্প বলি।

একজন মোটাসোটা লোক, মহিলাও হতে পারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সবাইকে বলতেন, মোটা হওয়া থেকে বাঁচুন। ছোটবেলায় আমরা দেখতাম গ্রামের লোকেদের খাওয়া জুটত না, না খেয়ে খেয়ে সবাই রোগা-প্যাটকা; সেখানে আজকে বলছে সবাই মোটা হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, একজন মোটালোক ডায়াটিসানের কাছে গেছে। ডায়াটিসান লিখে দিল কি কি খেতে হবে, বলে দিল তিন মাস পর আসুন। তিন মাস পরে এসে দেখছে আরও তার ওজন বেড়ে গেছে। 'কি করে ওজন বেড়ে গেল আপনার?' তারপর জানা গেল, তাঁকে যে ডায়াট দেওয়া হয়েছে সেটাকে তিনি ওষুধ হিসাবে খাচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু বাকি যে খাবারগুলো রোজ খেতেন, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, মিষ্টি সেগুলোর পরিমাণ না কমিয়ে পুরো মাত্রায় খেয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে আবার ডায়াটে যেটা প্রেসক্রাইব করা আছে সেটাও খাচ্ছেন। আমাদের

বেশির ভাগ ভক্ত আজকে ঠিক এই রকম। সংসারে তাঁরা যেমন ডুবে আছেন, সে তো আছেন; তার সাথে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা –ঠাকুর তুমিই আমার সব, আমার মন যেন তোমাতে থাকে এগুলো ঠিক আছে, তার সাথে হে ঠাকুর, আমার এটা যেন হয়ে যায়, কৃপা কর; এই বলে দু ফোঁটা চোখের জল ফেললাম। এভাবে কি কিছু হয়!

আমি রাজা জনকের মতো, আসলে রাজা হওয়ার ইচ্ছা, জনক রাজার তপস্যার দিকে একটুও নজর নেই। জীবনে কঠোর সাধনা যদি না থাকে, তাহলে সংসারেও কিছু হবে না, সন্ন্যাস জীবনেও কিছু হবে না। বড়দের কাছে আমি অনেকবার শুনেছি –যাঁরা সন্ন্যাস জীবনে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে জীবনের কোন একটা সময়, তিন মাস হোক, ছয় মাস হোক কি এক বছর হোক; সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে এক মনে ঠাকুরের তপস্যা করতে হয়। বেলুড় মঠে আমাদের যে এত সন্ন্যাসীরা আছেন, তাঁদের কেউ যদি বলেন, আমি ছয় মাসের জন্য নর্মদার তীরে বা হরিদ্বার বা উত্তরকাশীতে একান্তে বাস করতে চাইছি, কর্তারা তাঁকে ছেড়ে দেন –যাও তপস্যা কর গিয়ে। কিছু দিন এই তপস্যাটা করতে হয়। তাতে কি আপনার সিদ্ধি হয়ে যাবে? না, সিদ্ধি হবে না। সংসারে যে দুধে জলে মিশে আছেন, এতে দুধ আর জলটা একটু আলাদা হয়ে যায়। ছয় মাসের জন্যও যদি সংসার ছেড়ে থাকা যায়, এটাই একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে যায়।

সন্ন্যাসীকেও প্রথমের দিকে চুটিয়ে কাজ করতে হয়; কাজ না করলে মন উড়ো উড়ো হয়ে যায়। কাজ করে করে রামকৃষ্ণ মিশনে, এই সঙ্ঘের সাথে মন যখন জুড়ে গেল, এবার সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণে। গৃহস্থদেরও তাই; সংসারের কর্ম করতে করতে সংসারের যিনি কর্তা, তাঁর দিকে মন নিয়ে যাওয়া। বাইবেলে মার্থা ও মেরীর খুব সুন্দর গল্প আছে। মার্থা ও মেরী দুই বোনের বাড়িতে যীশু গেছেন। মার্থা অতিথিদের সেবা করার জন্য সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছেন আর মেরী যীশুর কাছে বসে যীশুর কথা শুনে যাচ্ছেন। মার্থা এসে অনুযোগের সুরে যীশুকে বলছেন, 'ওকে বলুন আমাকে একটু সাহায্য করতে'। যীশু বলছেন, 'মেরী যেটা করছে ঠিকই করছে'। তাই বলে কি সংসারীরা কোন কাজকর্ম করবে না। অবশ্যই কাজকর্ম করতে হয় –কর্মকাণ্ড আদি কাণ্ড, কাজ সবাইকে করতে হয়। মন যখন একটু স্থির হয়ে গেল, মন সত্ত্বগুণে ভরে গেল; তখন ঈশ্বরের দিকে একটু মন দিতে হয়, তারপর একটানা মন ঈশ্বরে ফেলে রাখতে হয়। এরপর সংসার করলেও দুধে জলে মিশবে না। এটাই এখানে ঠাকুর বলছেন, সংক্ষেপে আমি ব্যাখ্যা করে বললাম। ওই গল্পটা মনে রাখবেন – মোটা লোক ডায়াট করতে গেছে, ডায়াটের লিস্ট দেওয়া হয়েছে, রোজ যা খাচ্ছিল সেগুলোই খাচ্ছে আর তার সাথে ডায়াটের খাবারগুলোও খাচ্ছে। এই জিনিসটা করবেন না।

ঠাকুর বলছেন –**তবে সংসারীর কি উপায় নাই? –হ্যাঁ অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জনে সাধন করতে হয়। তবে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়; তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই**।

তবে মনে রাখবেন, ঠাকুর যেমন বলছেন, কিছু না পারলে একদিন কর, কি দু দিন, কি তিন দিন কর –এভাবে একদিন কি দু-দিন নির্জনে থেকে ভক্তিলাভ বা জ্ঞানলাভ হয় না। তিন মাস, ছয় মাস নির্জনে সাধন না করলে ওই জিনিস হবে না। আপনারা হয়ত বলতে পারেন, তিন মাস, ছয় মাস আমাকে কোথায় থাকতে দেবে? থাকার ব্যাপারটা আপনাকেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। লোকেরা ঘুরতে গিয়ে মাসের পর মাস ঘোরেন; কোথাও একটা ব্যবস্থা করতে পারছেন বলেই এতদিন ঘুরছেন। আমার বিশ্বাস যে, আপনি যদি আমাদের কোন সেন্টারকে লেখেন যে, আমি কিছু দিন তপস্যা করতে চাইছি, ওনারা খুব খুশি হবেন।

বিভিন্ন কারণে দিল্লী আশ্রম আমার খুব ভাল লাগে। এমনিতে দিল্লী শহর খুব হৈ হুল্লোড়ের শহর, কিন্তু আমার কাছে দিল্লী আশ্রম খুব শান্ত মনে হয়। অনেক বছর আগে ওখানকার অধ্যক্ষকে একবার আমি বললাম, আমার খুব ইচ্ছে, এক মাস এখানে এসে থাকব। শুনে উনি এত খুশি হয়ে

গেলেন, আমাকে বললেন, 'ভাই এই প্রথম আমি দিল্লী আশ্রমের নামে কারুর মুখে এই কথা শুনলাম। তুমি শুধু বল কবে তুমি আসবে। আমি আসা যাওয়ার খরচ পর্যন্ত তোমাকে পাঠিয়ে দেব'। যদিও শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হয়নি। দিল্লী আশ্রমে এক মাস থেকে একান্ত বাস করাটা একটা বিরাট ব্যাপার। সাধারণত দিল্লীতে লোকে কাজেকর্মে যায়। আবার যাঁরা হিমালয়ের দিকে বা কাশ্মীর গেলে দিল্লী হয়েই যান, তখন একদিন-দুদিন দিল্লী আশ্রমে কাটিয়ে যান।

আমাদের আশ্রম ছাড়াও অন্যান্য অনেক আখড়া আছে, ইন্টারনেটে সার্চ করে আপনি ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখুন। তপস্যা সবাইকে করতে হবে। তিন-চারদিনের জন্য তীর্থে গেলাম, এভাবে তপস্যা হয় না। আর একান্তই যদি ব্যবস্থা না করতে পারেন, তাহলে নিজের বাড়িতেই এক মাস কি দু মাস এইভাবে থাকুন –কম কথা বলব, কাজে বেশি জড়াবো না, এই এক মাস আমি তপস্যা করব। তপস্যা ছাড়া হয় না। তা নাহলে খাবারের উপর ডায়াটের খাবার খাওয়ার মত হয়ে যায়।

যখন নির্জনে সাধন করবে, সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে। তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। প্রথমে সাত দিন অন্তত করে দেখুন – ফোনটা বন্ধ রাখবেন, তার আগে সবাইকে মেসেজ করে দিন, সাতদিন আমাকে পাওয়া যাবে না। এতেও অনেক জোর পেয়ে যাবেন। এই সাতদিন নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ, মন্দিরে বসে জপধ্যান, দুই বেলা মঙ্গল আরতি ও সন্ধ্যা আরতিতে অংশ নেওয়া আর মৌন; একটা দুটো জরুরী কথা বলা, তার বেশি না। এটাই আমাদের তপস্যা।

নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার কেউ নাই; ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব। ভাবার কিছু নেই, এটাই সত্য। একদিক থেকে আপনজন ঠিকই।

রিচার্ড ডকিন্স খুব নামকরা জীববিজ্ঞানী, 'The Selfish Gene' নামে খুব নামকরা বইএর লেখক। কোথাও একটা জিন্ বা রক্তের যে সম্পর্ক, সেটা থেকে যায়। এমনিতে বলে ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা হয়; সবই মানছি, কিন্তু শেষমেশ আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তান, এনারাই সত্যিকারের আপন হন; এর বাইরে হয় না। জেনেটিক্যালি আমরা সবাই একে অপরের সাথে জুড়ে রয়েছি। আপনাকে যে যতই ভালবাসুক, আপনজন আপনজন। সেখান থেকেও বেরিয়ে আসার কথা বলছেন।

কেন? আপনার যখন শরীর খারাপ করে, গায়ে যদি ব্যাথা হয়, আপনার আপনজন আপনার সব ব্যাথাতে এসে দাঁড়াবে। আমার এত বড় চোখের অপারেশন হল, র‍্যাটিনা ডিটাচমেন্ট, অত্যন্ত বাজে রোগ। আমাদের এখানকার হেড, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু আধ ঘন্টা ধরে যে লেজার চালাচ্ছে, আধ ঘন্টা মানে বিরাট সময়; ছানি অপারেশানে পাঁচ থেকে সাত মিনিট সময় লাগে, আর তারপরে যে কষ্ট। মাসের পর মাস, আমাকেই ভুগতে হচ্ছে। সেখানে আমার যাঁরা পরিচিত, ঘনিষ্ঠরা কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। আমার কষ্ট আমাকেই সহ্য করতে হবে। রাত্রিবেলা বালিশে মাথা রেখে যখন ঘুমিয়ে পড়ছেন, তখন ওই ঘুমটা আপনার একার। যিনিই আপনার সঙ্গে থাকুন, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, শেষমেশ সবাই ঘুমিয়ে পড়বে কিন্তু আপনি আর আপনার ঘুম এক। আপনার ঘুম আপনার, আপনার ক্ষুধা আপনার, আপনার কষ্ট আপনার। কিন্তু এই সময়গুলিতে একজন শুধু আপনার সাথে থাকেন; আপনার অন্তর্যামী আপনার সাথে থাকেন। আপনার খিদেতেও থাকেন, আপনার ঘুমেও থাকেন, আপনার সুখেও থাকেন, আপনার কষ্টেও থাকেন।

সবার আসল আপনজন তাঁর 'আমি', তাঁর আত্মা, তিনিই আপনার ইষ্ট। এটাকে বোধ করা; তবেই আধ্যাত্মিক পথে এগোন যায়, তা নাহলে হয় না। আমাদের বাকি সম্পর্কগুলো বড় ঠুনকো, কাঁচের মত, একটু টোকা মারলেই ভেঙ্গে যায়। অজান্তায় যদি সেখানে পা পড়ে, রক্ত বেরিয়ে আসবে। ঠাকুর তাই বলছেন –**আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা কর**।

যদি বল কতদিন সংসার ছেড়ে নির্জনে থাকবো? তা একদিন যদি এইরকম করে থাক, সেও ভাল। কি আর করবেন, কিছুই যখন হচ্ছে না, একদিনই করুন। একদিন নিজের বাড়িতেই করুন। অথবা নিজের খুব নিকট সম্বন্ধীকে বলুন, একদিন তোমার বাড়িতে এসে সারা দিন থাকব, শাক-ভাত খাব, আমার কিছু লাগবে না; শুধু ঈশ্বরে মন দেওয়ার জন্য, সেও নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিংবা কোন সেন্টারে লিখুন, শুধু সাধন-ভজনের জন্য তিন দিনের জন্য আশ্রমে আসতে চাইছি, সাধন-ভজন ছাড়া আমার অন্য কোন সাধ নেই। হয়ত রাজী হয়েও যেতে পারেন, তবে বিভিন্ন সেন্টারে বিভিন্ন নিয়ম আছে। মোদ্দা কথা কঠোর তপস্যা যদি না হয়, জ্ঞান-ভক্তি হবে না।

তিনদিন থাকলে আরও ভাল; বা বারোদিন, একমাস, তিনমাস, একবৎসর –যে যেমন পারে। আমার নিজের ধারণা, এক বৎসরের কমে একান্তে সাধনা হয় না। কারণ মন বসাতেই প্রথম ছয়মাস চলে যাবে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে মন যখন বসে গেল তখন সেটাকে ধরে রাখার জন্য আরও ছয়মাস সময় দিতে হবে। হরিদ্বার, কঙ্খল, উত্তরকাশীতে এই রকম অনেক আশ্রম আছে, আপনাকে তাঁরা থাকতে দেবেন। আপনি শুধু বলে দিন, আমি শুধু সাধন-ভজনের জন্য আসছি। ফোন সুইচ-অফ্, আপনি আপনার কাজ শুরু করে দিন।

জ্ঞান-ভক্তিলাভ করে সংসার করলে আর বেশি ভয় নাই। এখানে যে আপনার ঈশ্বরদর্শন হয়ে যাবে তা হবে না। কিন্তু একটা sense of detachment এসে যাবে, আর এই বিশ্বাসটা আসবে – ঠাকুরই আমার হাত ধরে আছেন। এর কাছে এত এত লেকচার শোনা, এত বই পড়া, দৌড়ে দৌড়ে ভক্ত সম্মেলনে যাওয়া; কিছুই না। আমি মহারাজদের কাছে শুনেছি, ভক্ত সম্মেলনে খাওয়া-দাওয়ার পর ভক্তরা দৌড়ে দৌড়ে এসে বলেন, মহারাজ, এবার খাওয়া-দাওয়ার আইটেম কি সুন্দরই না ছিল। এখানে এসেও সেই খাবারদাবারের বিচার!

হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আঠা লাগে না। চোর চোর যদি খেল বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও, সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাক, মাটি থেকে তোলবার সময় সেই সোনাই থাকবে।

ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন। কোন ভাবে শুধু একবার এই নিষ্ঠাকে যদি নিয়ে আসা যায়, আর কোন ভয় থাকে না। আপনি বলবেন ঠাকুরের প্রতি আপনার নিষ্ঠা আছে। মানছি, আপনার নিষ্ঠা আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, পুরো হিন্দি বলয়ে, বিহার, ইউপি, এমপি, ছত্রিশগড়, রাজস্থান ঘুরে আসুন সবাই জানে, রামজী ভগবান হ্যায়। রামজী ভগবান হ্যায় তাতে আপনার কি হয়ে গেল? রামজী ভগবান হ্যায় এই সত্যকে মনে করে আপনার জীবনে কি কিছু পরিবর্তন হয়েছে? সংসারকে কতটা অসার বলে আপনার মনে হয়েছে? কর্তব্যবোধ কতটুকু জেগেছে? কতজন জোর দিয়ে আপনাকে বলতে পারছেন – আপনার উপর নির্ভর করা যায়? বেশির ভাগ মানুষ নির্ভরযোগ্য নয়।

ঠাকুর এই উদাহরণ বহুবার দিয়েছেন –**মনটি দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার-জলে রাখ, তাহলে দুধেজলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়**। মাখন তোলা মানে – আমাদের দেহ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিশে, ইন্দ্রিয় মনের সঙ্গে মিশে, মন বুদ্ধির সঙ্গে মিশে, বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার যে ভাব, সেই চৈতন্যের ভাব মিলেমিশে এমন হয়ে রয়েছে যে, আসল যিনি আমার প্রকৃত স্বরূপ সেই বোধটাই চলে গেছে। ফলে দেহে সামান্য একটু কষ্ট হলে আমরা চিৎকার করে উঠি, ইন্দ্রিয় তার বিষয়কে না পেলে আমরা চিৎকার করে উঠি; মন আরও সূক্ষ্ম, মনের কোন কষ্ট হলে আমাদের যে কি অবস্থা হয় কল্পনাই করা যায় না।

যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়।

একবার যখন আপনার বিশ্বাস হয়ে গেল, এই বিশ্বাস কোন ইমোশানে না, এখানে কোন ভাবাবেগ নেই; তখন কি হবে –ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখছেন। আমি তোমার মুরগি, তোমার মুরগি তুমি সামনে দিয়ে কাটো, পিছন দিয়ে কাটো আমার কিছু করার নেই। যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, ঠাকুরই তার মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন; যে আমাকে ভালবাসছে, ঠাকুরই তার মাধ্যমে আমাকে ভালবাসছে, যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন তিনিই তাঁর মাধ্যমে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, এই বোধ তখন ধীরে ধীরে জাগতে শুরু হবে। বিশেষ করে যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, ঠাকুর তার মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। তিনি তো এসে আমাকে চড় মারবেন না। এই বোধ নিয়ে আসাটাই হল মাখন তোলা।

সে মাখন কখনও সংসার-জলে মিশে যাবে না –সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। আর সংসার-জলে মিশে যাবে না, কখনই না। আসলে আপনি হলেন দুধের সার মাখন, কিন্তু এখন জলের সাথে মিলেমিশে এক হয়ে আছেন। দুধেজলে মিশে থাকা অবস্থা থেকে কিভাবে মাখনটুকু তুলে নিতে হবে? তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আগুনের উপর দুধকে জাল দিতে হবে, জলটাকে বাষ্প করে দিতে হবে, সেই দুধকে নির্জনে দই পাততে হবে, দই জমে যাওয়ার পর তাকে মন্থন করতে হবে, তবে গিয়ে মাখন উঠবে। নির্জনবাস হল দই পাতা। নির্জনবাসে ওই যে ঈশ্বরচিন্তন হচ্ছে, এটা হল দইকে মন্থন করা, এরপর উঠে আসবে মাখন। অন্য সময় আমরা যে জপধ্যান করছি, তখন আমরা ওই দুধেজলে মিশে থাকা অবস্থায় মন্থন করছি, তাতে কতটুকু আর মাখন বেরোবে। তাতেও মাখন বেরোয়, একেবারেই যে বেরোবে না, তা না, কিন্তু সেই রকমই বেরোবে। এই হল সংসারে থেকে সিদ্ধিলাভ করার উপায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামীর নির্জনে সাধন

ঠাকুর সিঁদুরিয়াপটীর ব্রাহ্মসমাজে এসেছেন, ব্রাহ্মভক্তদের গুটি কয়েক কথা বললেন। সেখানে শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামীও আছেন। মাস্টারমশাই বলছেন –**শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে অনেকদিন নির্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল।** মাঝে মাঝে আমি ভাবি, কোথায় কামারপুকুর আর কোথায় রামেশ্বরম, ঠাকুরের বাবা পায়ে হেঁটে তীর্থ করতে সেই রামেশ্বরম চলে গেলেন। আপনারা যদি আপনাদের পরিবারের ইতিহাস জানেন, তবে দেখবেন যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁদের ঠাকুরদারা অনেকেই তীর্থে গিয়ে থাকবেন। তখনকার দিনে যেমন ব্যবস্থা ছিল, রেলগাড়ি তেমন ছিল না; কখন পায়ে হেঁটে, কখন নৌকা করে, কখন গরুগাড়ি করে যেতেন। এখন সব রকম সুবিধা হয়ে গেছে, যাওয়া, খাওয়া, থাকার কোনটারই অভাব নেই; কিন্তু তাও আমরা তীর্থে যেতে চাই না। যদিও কেউ যান, ওই ট্যুরিস্টের মত।

আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আপনারা যে কজন শুনছেন, আপনারা একটা লিস্ট তৈরী করুন –শক্তিপীঠ, জ্যোতির্লিঙ্গ, গঙ্গাতীরে কি কি তীর্থ, আচার্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত চারধাম; কেদারবদ্রীকে অনেকে চারধামের এক ধাম বলেন, কিন্তু ওটা চারধাম না। ঠিক করে নিন, বছরে একবার এই লিস্টের মধ্যে একটি তীর্থ আমি করব। তীর্থ করা মানে একা, বাড়ির সবাইকে নিয়ে যাচ্ছি তা না। বাড়ির সবার সাথে যাবেন অন্য সময়ে, সেটা পর্যটন। এক এক তীর্থে এক-এক রকম নিয়ম, তীর্থের নিয়মগুলি জেনে নিন এবং সেই তীর্থে গিয়ে সেই নিয়মগুলি পালন করুন। একটা নিয়ম আছে, তীর্থ গিয়ে মাথার চুল অর্পণ করা, পারলে পুরুষরা সেটাও করবেন; মজা করে বললাম। কিন্তু তীর্থের যেখানে যেমন বিধি নিয়ম আছে সেগুলো পালন করবেন, এগুলো করতে হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞে এগুলো দেবযজ্ঞের মধ্যে পড়ে।

গতকাল আমার এক ভাল বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছিল। খুব সুন্দর কথা তিনি বললেন। ‘জীবনের দিকে যখন তাকাই, তখন দেখি; যে যত রিচুয়ালিস্টিক কর্মকাণ্ডী, এনাদের জীবনে অশান্তি তত কম’। এটা খুব নামকরা কথা। আপনারা গ্রামে-গঞ্জে যে দূর্গাপূজা হয়, বা পারিবারিক যে পূজা অর্চনাদি হয়,

দেখবেন একটা পূজা শেষ হয়ে গেল, পরের পূজার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিলেন। বয়স্করা যাঁরা আছেন, বিশেষ করে মহিলারা, সারা বছর ধরে সেগুলোকে জোগাড় করতে থাকেন। আপনারাও এখন থেকে প্রস্তুতি নিন, অর্থ সঞ্চয় করতে থাকুন তারপর খোঁজ নিন, গঙ্গাতীরে কি কি তীর্থ আছে, নর্মদাতীরে, সমুদ্র পারে কি কি তীর্থ আছে। বছরে একবার একা একা যাবেন। কোথাও তিনরাত্রি বাস করবেন, আর যতটা পারবেন জপ করবেন। জীবন আপনার পাল্টে যাবে।

আজকের কথামৃতের বিষয়টাও তাই –বাসা পাকড়ানো নিয়ে। নিজের বাসাটা আগে পাকড়ান। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তিনি কত বড় একজন সাধক, কত বড় পণ্ডিত, তিনিও তীর্থে যাচ্ছেন। তীর্থে গেলে, ধর্মকর্ম করলে মন থেকে সমস্ত অঙ্কটবঙ্কট কেটে যাবে। আমাদের এখানেও আজকে দেখছি বিরাট বড় একটা ধর্ম সম্মেলন হচ্ছে। কি কি হয় আমার জানা নেই। ওই দুটো গান, দশ মিনিটের ধ্যান, চারটে লেকচার, তার আবার একই বক্তা আর একই বিষয়, একই শ্রোতা। শুনে শুনে একটা হিপনোটিক স্পেলে চলে যায়। কারণ যে জিনিসটা আমরা জানি, সেই জিনিসটাই শুনতে ভাল লাগে, দিল্লী আদিতে মানুষ যেমন রামলীলা শুনতে যায়। এসব না করে ঘর থেকে বেরোন। ঠাকুর যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন, ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যেখানে যেখানে তীর্থস্থান হয়েছে, এইসব ঘুরতে ঘুরতে সারা জীবন কেটে যাবে। এক বছর এখানে, সামনের বছর সেখানে। মাথায় আপনার ঘুরতে থাকবে, আগামী বছর আমাকে এই তীর্থে যেতে হবে। তবে একা যেতে হবে, পরিবার নিয়ে না। দরকার হলে সমভাবের কোন সঙ্গী নিতে পারেন।

ধর্মকর্ম যত করবেন অশান্তি তত কমবে। যারা রাজনীতি করছে, তারা করুক; আপনি ওই ধরণের নন। স্বামীজীর মত বেদান্তী আর কোথায় পাবেন, সারা বিশ্বে তিনি বেদান্তের প্রচার করে গেলেন। সারা বিশ্বে বেদান্তের প্রচার করে আসার পর স্বামীজীর মা বলছেন, ‘বাবা একবার কালীঘাটে গিয়ে মায়ের থানে গড়াগড়ি দিতে হবে’। স্বামীজী করলেন, নিজের জন্য না, মায়ের শান্তির জন্য। আপনি যখন কিছু দিন নির্জনবাসের জন্য বাইরে যাবেন তখন আপনারও শান্তি আর আপনি বাইরে চলে আসার জন্য বাড়ির লোকেরও শান্তি। তবে এগুলো একটু করতে হয়। বলছেন, সেখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনেকদিন নির্জনবাস ও সাধুসঙ্গ হয়েছিল। আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, নির্জনবাসই হয় না, আবার সাধুসঙ্গ; সাধু কোথায় পাবো? আপনি কেন সাধু খুঁজতে যাবেন, আপনিই সাধু হন। আপনি সাধু হয়ে চারজনকে সাধুসঙ্গ দিন।

মাস্টারমশাই এত সুন্দর এই জিনিসগুলিকে দিয়ে গেছেন –নির্জনবাস, সাধুসঙ্গ। ঘুরতে বেড়াতে না, এই ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই করছি, সেই করছি; এগুলো করতে বলছেন না। কষ্ট করে যান, কষ্ট করে থাকবেন, কষ্ট করে খাওয়া-দাওয়া করবেন। নির্জনবাস আর দিনে খুব কম করে সাত আট ঘন্টা খুব করে জপধ্যান করবেন। তপস্যা করে তীর্থকে জাগ্রত করবেন। নিজের উপর একটু দায়ীত্ব নিন, কত দিন আর অপরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে চালাবেন।

মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বলছেন –**এক্ষণে তিনি গৈরিকবসন পরিধান করিয়া আছেন। অবস্থা ভারি সুন্দর, যেন সর্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন**। ঠাকুর **বিজয়কে দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন –বিজয়, তুমি কি বাসা পাকড়েছ?**

খুব সুন্দর একটা বিষয় –বাসা পাকড়েছ। ঠাকুরের খুব নামকরা গল্প এখানে আসছে –দুজন সাধু ঘুরতে ঘুরতে শহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ করে শহরের বাজার, দোকান, বাড়ি দেখছে। অনেক আগে প্রথমবার আমি কোন কাজে যখন বোম্বে গিয়েছিলাম, তখন আমিও সেখানে গিয়ে হাঁ করে বোম্বের বাড়ি, রাস্তাঘাট সব দেখছিলাম। বোম্বে যাওয়ার আগে কত কি শুনেছিলাম। যাঁরা বোম্বে শহরে থাকে তারা আর হাঁ করে দেখবে না। এখানেও দুজন সাধু ভ্রমণ করতে করতে একটি শহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ করে শহরের বাজার, দোকান, বাড়ি দেখে বেড়াচ্ছিল; এমন সময় অপরটির সঙ্গে

দেখা হল। তখন সে বলছে, 'তুমি হাঁ করে শহর দেখছ, কিন্তু তোমার তল্পিতল্পা কোথায়'? 'আমি আগে বাসা পাকড়ে তল্পিতল্পা রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এখন শহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি'। ঠাকুর বলছেন, **তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বাসা পাকড়েছ? (মাস্টার ইত্যাদির প্রতি), দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এবার খুলে গেছে**।

এই হল নির্জনবাসের ফল। আপনার ভিতরে যে আধ্যাত্মিক ভাব চাপা আছে, উদ্দেশ্য হল এটাকে খোলা। আপনি হিমালয় গেলেন, নর্মদা গেলেন, তারপর রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী ঘুরতে গেলেন; কিন্তু ফোয়ারা যদি না খোলে তাহলে সব ঘোরাঘুরি, নির্জনবাস বৃথা। একদিনে ফোয়ারা খুলবে না। কিন্তু এখানে বিষয়টা হল –বাসা পাকড়ানো। ব্যক্তিগত ভাবে আমার খুব প্রিয় বিষয়। অনেক বছর আগে, আমি তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম। সেই সময় আমি একটা কথা শুনেছিলাম, কথাটা পূর্ববঙ্গে ব্যবহার হয়। একদিন একজন মহারাজ আর-একজন মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, দুজনেই পূর্ববঙ্গের ছিলেন; 'বাবু বাসো কেমন'? অর্থ হল কেমন আছ? ঘটনাটা প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার, একবারই শুনেছি, কিন্তু আজও ভুলিনি। সাধারণ কথা, কেমন আছ? পূর্ববঙ্গের ভাষায় এটাকেই বলছেন, বাসো কেমন? অথচ পুরো জীবনদর্শন ওর মধ্যে ঢুকে আছে।

এই হল উচ্চ সংস্কৃতির একটা নমুনা। কিভাবে আমরা বুঝব একটা সংস্কৃতি উচ্চ? তার ভাষার যে সাধারণ সাধারণ জিনিস, যেমন ইংরাজীতে আমরা বলি গুড মর্নিং। গুড মর্নিং হল বিষয়ীদের একটা কামনা, আমিও করি গুড মর্নিং। আপনার দিন যেন ভাল যায়, এই হয়, সেই হয়। আবার রাত্রে গুড নাইট, রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বেন, সেখানেও কামনা আপনি ভাল স্বপ্ন দেখবেন, বিষয়াসক্ত মন এর বাইরে যেতে পারে না। এখানে বলছেন, 'বাসো কেমন', প্রথম শুনে আমার এত ভাল লেগেছিল; কেমন ভাবে তুমি অবস্থান করছ; তোমার যে অবস্থান সেটা কেমন। আজকের দিনে আমাদের জন্য এটা খুব জরুরী। কারণ আজকের দিনে কম বয়স থেকে আমাদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়।

অন্ধ্র প্রদেশে আমার কয়েকজন পরিচিত আছেন, তাঁরা আজকে একটা ছোট্ট দল তৈরী করে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর আদর্শে নিজেদের যুক্ত করে দিয়েছেন। জীবনে তাঁরা খুব সাফল্য লাভ করেছেন। এনাদের মধ্যে একজন আইএএস আছেন, একজন ব্যাঙ্কের বড় অফিসার হয়েছেন, আবার তাঁরা নানান রকমের স্কুল কলেজ আদি চালান। ওনাদের একজন ভদ্রলোক, তিনিও ব্যাঙ্কের বড় অফিসার; আজকে সকাল সকাল আমাকে ম্যাসেজ করলেন –স্বামীজী খুব বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি, আমরা এখানে বাচ্চাদের মধ্যে কাজ করি, এদের বাবাদেরও আমি পড়িয়েছি, অত্যন্ত ভাল মানুষ। দশ বছরের বাচ্চা এসে বলছে –আমি ভালবাসায় পড়ে গেছি, মনে বড় কষ্ট, কি করব বলুন? আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম, দশ বছরের বাচ্চা ছেলে-মেয়ে এখনই প্রেম করতে শুরু করে দিয়েছে। ভদ্রলোক বলছেন, স্বামীজী বলছেন, ব্রহ্মচর্যে যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে কিছু করতে পারবে না, এদের আমরা কি করে স্বামীজীর আদর্শ দেব, আমরা কি করব বলুন?

আমি বললাম, দেখুন জীবনে বড় হওয়ার আদর্শ যদি দেন, একটু সেখান থেকে মন যদি সরে যায়, দশ বছর থেকে মনে যদি সব আবর্জনা ঢুকে যায়, কে কি করবে। চারিদিকে কত কি যে হচ্ছে, খবরে যে টুকটাক যেটুকু নজরে আসে, অবাক হয়ে যেতে হয়। এখানে আসার আগে পড়লাম, সতের বছরের একটি ছেলে, তার নাকি কোন এক গার্ল ফ্রেণ্ডের সাথে ফোনে কথা বলছিল, ঝগড়া হল, দেখতে দেখতে গলায় দড়ি দিয়ে দিল। কি সমাজ তৈরী হচ্ছে ভাবা যায় না। আমরা দৌড়াচ্ছি, কোথায় দৌড়াচ্ছি, কেন দৌড়াচ্ছি, কিছু জানা নেই। এখন একটা নূতন শব্দ এসেছে, কোন একটা চাকরি পেল, বলবে আই গট মাই কল ইন। ভগবানের কোন কাজ নেই, আপনার জন্য সব ঠিক করে রেখেছেন, আই গট মাই কল ইন। ছবি আঁকতে শুরু করল, গান করতে শুরু করল, বলবে, আই গট এ পারপাজ ইন মাই লাইফ।

আরে ভাই তোমার জীবনের একটাই পারপাজ, ওয়ান সিঙ্গল পারপাজ –হয় ধর্ম সাধন, নয় মোক্ষ সাধন; অর্থ আর কাম এর অনেক নিচে। জীবনে আমাদের সবার উদ্দেশ্য, হয় ধর্ম সাধন, নয় মোক্ষ সাধন। মোক্ষ সাধন করবেন সন্ন্যাসী, বাকিরা করবে ধর্ম সাধন। কিন্তু বাকিরা কিসের করবে ধর্ম সাধন! সব নিরাশাতে ভরা জীবন, একটা স্থবির অবস্থায় চলে গেছে, পুরো জড়ের জীবন। স্বামীজী বলতেন –সত্ত্বগুণের মুখোশ পড়ে পুরো দেশটা তমোগুণে ডুবে গেছে। স্বামীজী দেশের এই অবস্থা হবে কখন চাননি। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনি যা করার করুন। ধর্ম জীবনকে কখনই ছাড়া যাবে না, তা নাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ধর্ম জীবন যদি করা হয়, কর্মকাণ্ড যদি করা হয়, তাহলে আর হতাশার ভাব আসবে না, ডিপ্রেশান আসবে না।

আপনারা বলছেন, দশ বছর বয়স থেকে প্রেমে পড়ছে? স্বামীজী আগেই বলে গেছেন, পাঁচ বছর বয়স থেকে মানুষ প্রেমের কবিতা লিখবে। কোথাও একটা কিছু হয়ে গেলে আপনার যেন মনে হল, একটা বিরাট বিশ্রাম পেলাম। একটা সামান্য চাকরি হল, কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে করছে, আমার কিছু একটা হল। না কিছুই হয় না। ঠিক ঠিক বিশ্রাম, এই যে 'বাসো কেমন', এটা একমাত্র হয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনে, না হলে ধর্ম জীবনে হয়। কারণ ধর্ম হল ভগবানের ডায়ানমিক রূপ। ঈশ্বর দর্শন –এটা হল ঈশ্বরের অনন্ত রূপ, যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পাপ নেই, পূণ্য নেই।

ধর্ম হল ভগবানের active রূপ। ধর্ম জীবন যখন আপনি যাপন করছেন, তখন কর্মের মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরকে ধরে আছেন। যখন ঈশ্বরের সাধনা করছেন, তখন মন, প্রাণকে এক করে স্থির প্রত্যয়ে ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন। এই দুটো ছাড়া তৃতীয় কিছু হয় না। তৃতীয় যা কিছু হয়, সেটা হয়ে গেলে পশুর জীবন। আপনাদের ঠাকুর্মা-ঠাকুর্দার খোঁজ নিন, তাঁদের সব কিছুই ছিল, আহার, নিদ্রা, মৈথুন সবই ছিল কিন্তু তার মধ্যেও ধর্মটাকে ধরে রেখে ছিলেন। সকাল থেকে উঠে ঠাকুরের ফুল তুলছেন, মালা গাঁথছেন, পূজা করছেন, গীতা কি চণ্ডী পাঠ করছেন, বিভিন্ন পার্বণে ব্রত পালন করছেন। আমাদের সেন্টারগুলিতে একটা ভক্ত সম্মেলন করে দিলেন, বললেন, আজকে আমাদের সারাদিন গীতা চান্টিং হবে। তাতেই ভক্তরা আপ্লুত। আরে ভাই, গীতা চান্টিং আপনার নিত্য করার কথা। কার্ল মার্ক্স বলছেন, ধর্ম হল সমাজের আফিং। ওই চারশ-পাঁচশ লোক বসে গীতা পাঠ করছে, একটা আফিংএর মত হয়ে যায়। একসাথে অনেকে মিলে গীতা চান্টিংএর সময় মনে হয় যে আমি গীতা পাঠ করতে পারছি, কিন্তু একা হলেই আর করতে পারছি না। দশজন মিলে ধ্যান করার সময় ধ্যান করতে পারছি, একা হলেই আর ধ্যান করতে পারছি না। কারণ ভিতরে আপনার কোন গ্রোথ হয়নি।

দীক্ষা নিলেন, ধর্ম জীবনে প্রবেশ করলেন, এটাকে বীজাকারেই ছেড়ে দেবেন? চারা থেকে একটু গাছ করার চেষ্টা করুন। বিশ্রাম, বাস, স্থিরতা একমাত্র ঈশ্বরেই হয়। আমি একটা উদাহরণ অনেকবার দিয়েছি, উদাহরণটা আমি এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, খুব সুন্দর। ফিজিক্সের একটা মজার নিয়ম আছে, আগেকার দিনে পেণ্ডুলাম দেওয়া ঘড়ি পাওয়া যেত, ঘড়ির পেণ্ডুলামের যেটা বিশ্রামের জায়গা, সেটা হল পেণ্ডুলাম যখন সোজা থাকে। অথচ পেণ্ডুলাম যখন দোলে তখন ওই জায়গাতে তার গতি সবচেয়ে বেশি হয়, যার জন্য সাঁ করে পেণ্ডুলাম অন্য দিকে চলে যায়। আর যেখানে গিয়ে পেণ্ডুলাম থেমে যায়, ওখানে মনে হচ্ছে ওটা ওর বিশ্রামের জায়গায়, আসলে ওই জায়গাটা হল most unstable, অস্থির। ওই জায়গাটা তার অস্থির অবস্থাটা সবচেয়ে বেশি। আর যে জায়গাতে সবচেয়ে অস্থির বেশি, আসলে ওটাই সেই স্থান যেখানে তার স্থির ভাব সবচেয়ে বেশি; আশ্চর্য।

এই হল জীবন, যেখানে মনে হচ্ছে এখানে আমি বিশ্রাম পাচ্ছি; বেশির ভাগ মানুষ কামিনী-কাঞ্চনে বিশ্রাম পায়, কিন্তু ওই জায়গাতেই জীবনের অস্থিরতা সবচেয়ে বেশি। ভগবানের নামে আমাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে –আরে ভাই, বুড়ো বয়সে ভগবানের নাম করা যাবে। অথচ আমাদের আসল বিশ্রাম একমাত্র সেখানে, ভগবানে। নিজের মধ্যে যখন বাস করছেন, পুরো নিজের মধ্যে যখন ঢুকে গেলেন, তখন আসলে আপনি বাসা পাকড়ালেন। বাসো কেমন? দারুন; কেন? নিজের মধ্যে বাস

করছি। যখন নিজেতে বাস করছি –ঠিক ঠিক বাসা পাকড়েছি। এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে; ধন, সম্পদ, বন্ধু-বান্ধব, এগুলোতে যখন থাকছি, গোলমাল আছে। মন যখন বহির্মুখী থাকে, মন যদি চঞ্চল থাকে, তাহলে ভাল হচ্ছে ধর্মকর্ম করে মনটাকে ওখানে লাগিয়ে রাখা।

উত্তরকাশীতে যখন ছিলাম, তখন একজন সাধুবাবা যেখানে যেখানে প্রবচন হত দৌড়ে দৌড়ে সেখানে প্রবচন শুনতে যেতেন। আমি একদিন বলেই ফেললাম, 'আপ্ তো বহুৎ অধ্যয়ন করতে হ্যায়'। শুনে উনি বললেন –'পঠন-পাঠন করঙ্গে তো ভটকন্ সে বাঁচ জায়েঙ্গে'। আগেকার দিনে ভারতে যে সমাজ ছিল, সেই সমাজে সবাই তার নিজের স্থান জানতেন। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, নারী, পুরুষ, শিশু সবাই নিজের স্থান জানতেন। ফলে সেখান থেকে ধর্ম জীবন তৈরী হয়ে যেত। এখন সমাজ পাল্টে গেছে, টেকনলজি আমাদের সব কিছুকে পাল্টে দিয়েছে। এক বিরাট জঙ্গল, এমন ভূমিকম্প আর বন্যা এসে গেল যে, ভূমিকম্পে সমস্ত গাছ উপড়ে পড়ে গেল আর বন্যায় সমস্ত গাছ জলে ভেসে গেল। যে গাছগুলি জানত আমি মাটিকে ধরে আছি, এক জায়গায় স্থির, কত পাখিরা আশ্রয় নিত। আজ তারা নিজেরাই ভেসে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কেউ জানে না।

আমরা ছোটবেলা দেখতাম বয়স্করা তীর্থে যেতেন, এনারা তীর্থ ছাড়া কোথাও যেতেন না। আর এই আশায় যেতেন যে তীর্থেই আমি মারা যাব। আর এখন বাইরে কোথাও যখন যাই, তখন দেখি এয়ারপোর্টে বুড়োবুড়িকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছে। ওই কোথাও তাঁদের কোন নাতি বা নাতনিকে দেখতে যাচ্ছে, মনে শান্তি নেই। এই বয়সে কোথায় একটু ধর্মকথা শুনবে তা না, চলল নাতি-নাতনির মুখ দেখতে। কিন্তু এটাও ঠিক, ভিতরে এত অশান্তি কি করে এরা শুনবে ধর্মের কথা।

ঠাকুর অবতার, অবতারের সব কিছুই যদি লীলা রূপে দেখেন, তাহলে তিনি আমাদের কি কাজে লাগবেন। কিন্তু মা-বাবা যেমন নিজের সন্তানকে সন্তানের মত করে শেখায়; শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের ঠাকুর ঠিক সেইভাবে শিক্ষা দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। ঠাকুরের জীবনকে আমরা পরিষ্কার তিনটে ভাগে বিভাজন করতে পারি। প্রথম, কলকাতায় চাকরি করতে আসা পর্যন্ত যে অল্প টুকটাক পড়াশোনা করেছেন, যেটুকু প্রস্তুতি নিয়েছিলেন; পুরোহিতের কাজ কিভাবে করা যায়, সেই বিদ্যাটা শিখে কলকাতায় এলেন। এই জায়গাতে এসে আমরা যদি তাঁকে বিরাট বড় করে দিই, এখানেই মানুষ হয়ে যাবেন, তারপর দৌড়াদৌড়ি করবেন। দ্বিতীয়, দক্ষিণেশ্বরে এসে পুরো মা কালীর দিকে ঢুকে গেলেন। তৃতীয়, নির্বিকল্প সমাধি এবং তারপরে বাকি জীবনটা।

আমাদের নিজেদের জীবন ঠিক এই রকম। কাজকর্ম, চাকরি সবই থাকবে, তা নাহলে খাবার জুটবে কিভাবে। পরে ঠাকুরও বলছেন, সংসারে যারা আছে তাদের দায়ীত্ব আছে। শুধু তাই না, গৃহস্থ যে দুটো টাকা উপার্জন করছেন, তাতেই পুরো সমাজ চলছে, সরকার চলছে, সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের দানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, তাঁদের আমি বলি, আরও বড় হন; কিন্তু ধর্মকে কখন ছাড়বেন না। আপনি আয় করেন, ট্যাক্স দেন, তাতে সরকার চলে। আপনি যে দান করেন তাতে ধর্ম চলে। তীর্থ, সাধু-সন্ন্যাসী সবাই আপনার দানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি আপনি আয় না করেন, কি করে দান করবেন, দান না পেলে এদের চলবে কি করে! ধর্মই তাহলে পুরো নাশ হয়ে যাবে। ফলে সাধু সন্ন্যাসীকে চাষবাশ করতে হবে, কাজ করতে হবে। ঠাকুরের মত মা কালীর দর্শন, অদ্বৈত জ্ঞান এখন হবে না; কিন্তু সকাল-বিকাল যদি গভীর ভাবে সাধনা করেন, আর সাধনা করার একটাই পথ ধ্যান। ধ্যান ছাড়া সাধনা হয় না। ধ্যান করার আগে আপনাকে অনেক বছর ধরে বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠান –পূজা, পাঠ, জপ এগুলো অনেকদিন করতে করতে মনের একটা প্রস্তুতি হয়। সেখান থেকে যখন ধ্যানের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে নিলেন, তখন গিয়ে শাস্ত্রের কথাগুলো আপনার কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করবে। এরপর ঈশ্বরের ব্যাপারে আপনার একটা ধারণা হবে। তবে গিয়ে বিশ্বাস জন্মাবে। তারপর যদি আপনি শহরের রং দেখতে বের হন, আপনি আর শহরের চাকচিক্যে হারিয়ে যাবেন না।

ঈশ্বরজ্ঞান যদি হয়ে যায়, তাহলে তো কথাই নেই; কিন্তু সবারই তো ঈশ্বরজ্ঞান হবে না। তার আগে একটা দৃঢ় আস্থা আসা চাই। ভাবাবেগের আস্থা না, ভাবাবেগের আস্থা তো হাল্কা বাতাসেই উড়ে যাবে। অনেক বছর ধরে যদি আপনি পূজা অর্চনা করে থাকেন, ধর্ম জীবনযাপন যদি করে থাকেন, জপ করে থাকেন; আর সব থেকে জরুরী হল ধ্যান; তবে গিয়ে শাস্ত্রের কথাগুলো ধারণা হবে, বিশ্বাস হবে; জীবনটাই পাল্টে যাবে। জীবনদর্শন তখনই পরিষ্কার থাকবে, যখন দীর্ঘ দিন একটি চিন্তা-ভাবনা নিয়ে চলছেন। তা নাহলে হাভাতের মত হাওয়ায় একবার এদিকে যাবেন, একবার ওদিকে যাবেন। এতে আপনারই তো অশান্তি। ভিতরের বাসনাগুলি যদি না কমাতে পারেন, আপনারই অশান্তি হবে।

আমাদের বয়স তখন অনেক কম ছিল, সেই সময় অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসীরা খুব স্নেহ করে আমাদের বলতেন –দেখ, নিয়মিত তোমরা সাধন-ভজন করবে, সাথে সাথে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ করতেও শেখ; নাহলে বৃদ্ধাবস্থায় তোমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ করতে চাইবে। ওনারা আমাদের মঙ্গলের জন্যই এই ধরণের উপদেশ দিতেন। প্রথম থেকে ইন্দ্রিয়ের দমন করা না থাকলে বয়স কালে ভাল চেহারার কাউকে দেখলে একটু তার সাথে কথা বলার ইচ্ছে হবে, একটু তার সঙ্গ করার ইচ্ছে হবে; তারপর এই জায়গা, সেই জায়গা দেখার ইচ্ছে জাগবে। তার সাথে রসনা, ভালমন্দ খাওয়ার ইচ্ছা জাগবে। এইভাবে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইবে। আরও জঘন্য, তখন শরীরের আর ভোগ করার দম থাকবে না; খেলে হজম হবে না, ফলে শরীর ও মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। বৃদ্ধাবস্থায় কেউ যদি প্রেম করতে শুরু করে, ওটাকে ধরে রাখতে পারবে না। দুই-তিন সপ্তাহের জন্য তীর্থাদিতে গেলে, বাড়ি ফিরে এসে কোমরের ব্যাথা, শরীরের ক্লান্তি আদি নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। বৃদ্ধাবস্থায় মনের জোর যখন তলানিতে চলে আসে, তখনই শুরু হয় নানা রকমের অশান্তি। এই অশান্তি থেকে বাঁচার একটাই পথ, শরীর মন সতেজ থাকতে থাকতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনতে হয়।

এই গোটানোটা কোন ভয়ে পড়ে না, কোন অসহায় অবস্থায় পড়ে না, উদ্দেশ্য নিজের শক্তিটাকে সঞ্চয় করে রাখা। ছোটখাটো যা একটু ভোগের ইচ্ছা আছে, টুকটাক যা একটু তীর্থাদি করার তাড়াতাড়ি করে ওইটুকু ভোগ করে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। ছোটখাটো ভোগ করিয়ে নিয়ে মনকে মিটিয়ে দিতে হয়। ঠাকুর যেমন বলছেন –মন এর নাম রূপার গড়গড়াতে তামাক খাওয়া; হয়ে গেল। বাসা পাকড়ানোর ক্ষেত্রে এটাও একটা জরুরী অঙ্গ। আমার পরিচিত একজন আমাকে বললেন, seen one, seen all, একটাকে দেখে নিয়েছেন, সবটাই দেখা হয়ে গেল। হিমালয়ের এক জায়গা দেখে নিলেন, হয়ে গেল হিমালয় দেখা, পুরো হিমালয় ঘুরে ঘুরে দেখার আর কি দরকার। এই হল বাসা পাকড়ানো; আমরা যেটা বললাম, বাসো কেমন? বাসো কেমন কথার অর্থ ঠিক ঠিক আমার জানা নেই, কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি এই অর্থই হবে।

এতে কি লাভ? আপনার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সত্তা, আপনি যে শুদ্ধ আত্মা; এই জিনিসটাকে বোধ করলে আনন্দ, শক্তি, জ্ঞান ফোয়াড়ার মত, তুবড়ির মত বেরিয়ে আসবে। বহির্জগৎ থেকে যে সুখ পেতে চান, সেটাও সুখ; কিন্তু সীমিত, ক্ষণস্থায়ী, তার উপর আবার প্রচুর মূল্য চোকাতে হয়। জগতে কিছু নেই, যেটা আপনার কাছে বিনামূল্যে আসবে। যা কিছু জগৎ থেকে নেবেন তার জন্য আপনাকে প্রচুর দাম দিতে হবে। একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যান, প্রচুর দাম দিতে হবে। একটা বাড়ি বানাতে যান, প্রচুর দাম দিতে হবে। শুধু যে টাকা বেরিয়ে যাবে তা না, আপনার পুরো মনকেও ওর মধ্যে টেনে নামিয়ে এনে ওতেই আপনাকে বেঁধে রাখবে। একটা গাড়ি কেনার শখ হয়েছে? আপনিও কিনে ফেললেন, সাত কি আট লাখ টাকায় হয়ত হয়ে যাবে, কিন্তু তারপরে আপনাকে যে টানবে, আজ এই পার্টস খারাপ, কাল চাকা বসে যাবে, কিছু দিন পরে পরে সার্ভিসিং, মেইন্টেনেন্স, তারপর রোড ট্যাক্স, ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি কত কি লেগে থাকবে।

ঠাকুর বিজয়কে বলছেন –**দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজে লিখতে হয়, আর অনেক কর্ম করতে হয়। বিষয়কর্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা-চিন্তা জোটে**।

যাঁরা অনেকদিন ধরে এই ক্লাশগুলো শুনছেন, স্বাভাবিক ভাবে আপনারা এতদিনে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অনেক কিছু বুঝে গেছেন। বুঝে গেছেন ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে একটু নিজেকে নিয়ে বিচার করতে হয় –আপনি কি চান, আপনার কি কি ভাল লাগে? যদি আপনার ভাল লাগাটা সাংসারিক ব্যপার হয়, যেটাকে বিষয় বলা হয়, তখন ওটাকে মোর ঘুরিয়ে দিতে হয় –হে প্রভু তোমার প্রতি এটা নিবেদন করলাম। ধরুন আপনার খাওয়া-দাওয়া করতে ভাল লাগে, লাগতেই পারে। খুব করে রান্না করুন, যা যা খেতে চান দিনের পর দিন মনের খুশিতে রান্না করুন। তারপর সব রান্না ঠাকুরকে অর্পণ করে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করুন। আপনার গান-বাজনা ভাল লাগে, ঠাকুরের সামনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গান গেয়ে ঠাকুরকে শোনান। লোককে দেখানোর জন্য না, নিজের জন্য করুন।

আপনার কোন গুণ আছে, যেটা লোকজনদের সামনে দেখাতে পারলে আপনার খুব আনন্দ হয়। তাই করুন, সবার সামনে যান, *ওঁ সহনাববতু* মন্ত্র আদি দিয়ে শুরু করে মনে মনে বলুন, হে ঠাকুর, এই যে সবার সামনে আমি সম্মান পাওয়ার চেষ্টা করছি, এটাই তোমার প্রতি আমার পূজা। ঠিক এই ভাবে করে দেখুন এবং করুন, দেখবেন সাংসারিক ভাব কমে যাবে। যাঁরা ঘোর বিষয়ী তাঁরা এ-ভাবেই মনকে ঈশ্বারভিমুখী করেন। সেখান থেকে একবার যদি রাস্থা ধরে নিতে পারেন, এরপর গাড়ি নিজের মতই চলতে থাকবে। গাড়িকে প্রথমে যখন স্টার্ট দিতে হয়, তখন স্টার্ট করার সময় বেশি জোর দিতে হয়; একবার চলতে শুরু করে দিলে এরপর চলতেই থাকবে, আর জোর দেওয়ার কোন দরকারই হয় না।

এরপর ঠাকুর ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ থেকে অবধূতের গল্প বলছেন। রাজা অবধূতকে দেখে বলছেন, 'আপনার চেহারা তো জ্ঞানীর মত মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় না আপনি কখন কাজ করেছেন। কাজ না করলে তো জ্ঞান হয় না; আপনার কি করে জ্ঞান হল।' আমি অবাক হয়ে ভাবি, আমাদের কবিরা যাঁরা এগুলো রচনা করেছেন, তাঁদের কি বিচক্ষণ দৃষ্টি ছিল। কাজের উদ্দেশ্য একটাই, অনুভব; কাজের মাধ্যমে জ্ঞান হয়। কাজের অন্য কোন উদ্দেশ্য হয় না। মানুষ কর্মের মাধ্যমে বড় হয়। যারা কাজ করে না, ঠাকুরের ভাষায় কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর; এদের দ্বারা কিছু হবে না।

অবধূত তখন বলছেন, আমি অনেকের কাছ থেকে একটার পর একটা শিক্ষা পেয়েছি। কত উচ্চভাবের সাহিত্য আমাদের। অবাক লাগে মানুষ এগুলো থেকে কত সরে গেছে। চিল ছিল অবধূরের চব্বিশ গুরুর একজন অন্যতম গুরু। চিল একটা মাছ মুখে করে উড়ে যাচ্ছিল। তার পিছনে হাজারে হাজারে কাক তাড়া করেছে আর কা কা করে বিরাট গোলমাল করতে লাগল। চিল যেদিকে যায়, কাকগুলো সেদিকে তাড়া করে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে চিলের মুখ থেকে মাছটা পড়ে গেল। আর তখন সব কাক চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে চলে গেল। **চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বসল**।

আপনার ভিতর কিছু একটা আছে, টাকা-পয়সা হোক, কোন গুণ হোক, যেটার জন্য সমাজের কাকগুলো আপনার পিছনে তাড়া করে ঘুরে যাচ্ছে। যারা রাজনীতি করে, ক্ষমতায় থাকলে তাদের আগে পিছনে দশজন লোক ঘোরে। ক্ষমতা চলে গেলে কে তার পিছনে ঘুরতে যাবে! যার ভাল লাগে, কাকগুলো আমার পিছন পিছন ঘুরুক, আমার ভাল লাগে –তারা যা করছে করুক, মাছ মুখে নিয়ে ঘুরুক। কিন্তু আপনি কেন এটা করবেন? মাছটা ফেলে দিন। তখন আপনিও চিলের মত বসে ভাবতে লাগবেন –**ওই মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, আমি নিশ্চিন্ত হলুম**।

অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা করলেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে আর কর্মের দরুন ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনাত্যাগ হলেই কর্মক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।

বেদান্তে এটাই বলেন –অবিদ্যা, কাম, কর্ম। যাঁরাই বাসা পাকাড়াননি, তাঁরা নিজের স্বরূপে অবস্থান করছেন না। প্রত্যেক মানুষের দুটি অবস্থা থাকে –হয় বৃত্তিজ্ঞান, যেটাতে মানুষের সংসার বোধ হয় আর তা নাহলে স্বরূপ অবস্থান, যা কিনা সিদ্ধপুরুষের হয়। মনের মধ্যে অনবরত যে চিন্তা-ভাবনাগুলো উঠেছে, এটাকে বলে বৃত্তিজ্ঞান। এটাই আমাদের সংসার। বৃত্তিজ্ঞানের পিছনে রয়েছে বাসনা –এটাই অবিদ্যা। অবিদ্যার জন্য আমরা নিজেকে অপূর্ণ মনে করি, অপূর্ণতার জন্য আমরা কাজ করি। অবিদ্যা মানে নিজের স্বরূপকে না জানা; সেখান থেকে আসে অপূর্ণতার বোধ। আমি অপূর্ণ, এটা পেয়ে গেলে আমি পূর্ণ হয়ে যাব। যতক্ষণ অবিদ্যা আছে, ততক্ষণ কোন ভাবেই তার পূর্ণতার বোধ হবে না। ফলে কাজ করতে হবে। যত কাজ করবে তত অবিদ্যা বাড়বে; যত অবিদ্যা বাড়বে তত কামনা বাড়বে। যত কামনা বাড়বে তত কর্ম বাড়বে। মূলে সেই কথা –বাস পাকড়েছেন কিনা। বাসা যদি না পাকড়ে থাকেন, তাহলে এভাবেই দৌড়াতে থাকবেন। দৌড়াতে দৌড়াতে বৃদ্ধ হয়ে যাবেন; বৃদ্ধাবস্থায় হাহুতাশ – এটা করলে ভাল হত, এটা হল না, সেটা হল না, ওটা না করলে ভাল হত। এই করতে করতে একদিন পাগলা কুকুরের মত মারা গেলেন। মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হল, আবার ওখান থেকে এই একই খেলা শুরু হয়ে গেল। ঠাকুর বলে যাচ্ছেন।

তবে নিষ্কামকর্ম ভাল। নিষ্কামকর্ম, খুব নামকরা কথা, গীতাতেও নিষ্কামকর্মের কথা অনেকবার বলছেন। **তাতে অশান্তি হয় না**। কর্ম করলেই অশান্তি, কিন্তু নিষ্কামকর্ম করলে অশান্তি হয় না। টাকা-পয়সা থাকলে অশান্তি হবেই। ক্ষমতা যদি আসে, অশান্তি হবে। রাজনীতিতে যাঁরা আছেন, সব সময় তাঁদের অশান্তি লেগেই আছে। কিন্তু নিষ্কামকর্ম করা বড় কঠিন। এর আগে আমরা রাজা জনকের কথা বলেছিলাম। অনেকে বলেন, আমরা রাজা জনকের মত; কিন্তু অত সহজে রাজা জনকের মত হওয়া যায় না। মনে করছি, নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না। গীতাতে যে নিষ্কামকর্মের কথা বলা হয়ে, খুব কঠিন। তাহলে উপায় কি?

ঠাকুর বলছেন –**মনে করছি, নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে জানতে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কামকর্ম করতে পারে**। একমাত্র কেউ যদি প্রচুর সাধন-ভজন করে থাকেন, প্রচুর তপস্যা যদি করে থাকেন, তবেই তিনি নিষ্কামকর্ম করতে পারবেন। বিষয়টা একটু টেকনিক্যাল, কিন্তু খুব দরকারী। কারণ এটা দিয়েই গীতাকে বোঝা যায়, ঠাকুরকে বোঝা যায়। বলছেন, **ঈশ্বরদর্শনের পর নিষ্কামকর্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বরদর্শনের পর প্রায় কর্মত্যাগ হয়; দুই-একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে**।

এই লোকশিক্ষা প্রসঙ্গে গীতায় রাজা জনকের দৃষ্টান্ত এনে বলছেন, *কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ*; ঠাকুর এখানে নারদের উদাহরণ দিচ্ছেন। এই যে বলছেন, নিষ্কামকর্ম করা বড় কঠিন –এই কথার সাথে আমাদের সরাসরি যোগ আছে। ঠাকুরের এই কথাগুলি দার্শনিকদের কথা নয়। দার্শনিকদের কথা শুনতে খুব ভাল লাগে, এই একটু দার্শনিকদের কথা পড়লাম, এই যা। খবরের কাগজ যেমন পড়ছেন, খবরের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। কিছু কিছু খবরের সঙ্গে থাকে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় থাকে না। ওই একটু মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য, মনকে একটা খোরাক দেওয়ার জন্য। বেশির ভাগ যে দার্শনিক রচনাগুলো হয়, এই ধরণেরই হয়। কিন্তু ধর্মগ্রন্থ তা নয়, ঠাকুরের সব কথা সরাসরি আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই যে বলছেন, নিষ্কামকর্ম করা খুব কঠিন, কি ভাবে আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত একটু দেখুন। সচরাচর মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, আর এই যে আধ্যাত্মিক সত্য –মৃত্যুর পর কিছু আছে; এই জিনিসগুলিকে বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ যে জিনিসটাকে আমরা দেখিনি, অনুভব করিনি; ধরুন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও যখন ছিলেন বা আজকেও যদি এসে যান, কজন বিশ্বাস করবে? আমাদের বেদ উপনিষদের মত অত উচ্চমানের দর্শন থাকতে থাকতে চার্বাকদের দর্শন এসেছিল; তাদের দর্শনে

খুব নামকরা কথা আছে *ত্রয়ি বেদস্য কর্তারঃ ভ্রষ্ট দুষ্ট নিশাচরাঃ*; বেদ যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা হলেন ভ্রষ্ট, দুষ্ট, নিশাচর। অবশ্য এটা ঠিক যে, যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ হন, তাঁদের নিন্দা একটু বেশিই হয়। রামায়ণে আমরা দেখি, তাড়কা এসে ঋষিদের যজ্ঞ কিভাবে ভণ্ডুল করে দিতেন। ঋষি মুনিদের অনেক ধরণের বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হত। কারণ বেশির ভাগ মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই।

আপনার বাড়ির সবাই যদি ধর্মপ্রাণ হন, সবাই যদি ঠাকুরের কথাকে বিশ্বাস করেন, আপনি সত্যিই একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি। বুঝতে হবে আপনার শুভ সংস্কার আছে, আপনার বাড়ি লোকেদেরও শুভ সংস্কার আছে। আমাদের কাছে অনেক ভক্ত আসেন, স্বামী-স্ত্রী বাড়ির সবাই ঠাকুরের কথাকে বিশ্বাস করে চলেন। আবার এমনও দেখেছি, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব ভক্তিমান, কিন্তু তাঁদের সন্তান সারাদিন শাস্ত্রকে গালাগাল দেয় আর ব্যক্তিগত ভাবে আমার নামে গালাগাল দেয়। ওনারা দুঃখ করে বলেন, আমরা দুজনে এত ধর্মপ্রাণ কিন্তু কি করে আমাদের ছেলে এই রকম স্বভাবের হল, কি করে আমার মেয়ে এই রকম কাজ করতে পারে। মেয়ে যখন গালাগাল দেয়, এই কথা শুনে আমার খুব মজা লাগে। কারণ আমরা চিরদিন জানতাম মেয়েরা এমনিতেই একটু ধর্মপ্রাণ হয়। আজ সেই মেয়েই কলেজে পড়ছে, ডাক্তারী পড়ছে আর ধর্মকে গালাগাল দেয়, কিছু করার নেই। সত্যিকারের ঈশ্বরের কৃপা হলে তবেই স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ধর্মে মতি হয় এবং একসাথে ধর্মপালন করেন।

এখন যারা ধর্ম মানে না, ঈশ্বরকে মানে না, তারা যখন কাজ করবে স্বাভাবিক ভাবেই সকাম কর্ম করবে। কারণ তাদের কাছে একটাই জীবন। তাই যে করেই হোক, লুটেপুটে যত পার ভোগ করে নাও। এটাই আশ্চর্যের, একদিকে আপনি বলছেন, চোখ বুজলেই সব শেষ; আপনি বলছেন এই জীবনের পর আর কিছু নেই; তাহলে জীবনটাকে একটু ভাল কাজে লাগান। তা না, শুধু ভোগ চাই। ভোগ বলতে কি? কামিনী-কাঞ্চন আর নামযশ। ঘুরে বেড়ানো, গাড়ি, বাড়ি সব ওর মধ্যেই পড়ে। এই যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গী হয়, আপনার সব কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই সকাম কর্মই হবে, হতে বাধ্য। আপনি যখন সবার সাথে ঘুরতে যাবেন, সেখানে গিয়ে আপনি শুধু নিজের সুখ-সুবিধাটাই খুঁজবেন, নিজের সুখ-সুবিধা ঠিক মত পেয়ে গেলেই হল। আর ঘুরতে যাওয়ার জন্য যে টাকা আয় করতে হবে, সেটাও নিজের জন্যই করতে হবে। ধর্মভাব না জাগলে কক্ষণ পরের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার ইচ্ছাটা আসবে না। একটুও যে নিষ্কামকর্ম করবেন, কারুর প্রতি দয়া ভাব আসবে, সম্ভব না।

বিদেশে অনেকে মূল্যবোধ নিয়ে বলেন, তাঁদের হল value for value sake, আমি ভাল হতে চাই ভালর জন। সক্রেটিস নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তা হল না। একজন কেউ কদাচিৎ হয়ে যেতে পারেন, যিনি উচ্চ চিন্তাভাবনা নিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই জিনিস সবাই নিতে পারে না। ধর্মকে বাদ দিয়ে সৎ ভাব, সৎ চিন্তন নিয়ে থাকা অসম্ভব। এই জিনিসটাকে এতদিনে আমি খুব ভাল ভাবে বুঝে গেছি। যদিও এগুলোকে নিয়ে অনেকে আমার নিন্দা করেন, গালাগালও দেন। তাঁদের কথা কি আর শুনব, কেন শুনতে যাব। কারণ আমাদের যত ঋষিরা ছিলেন, সবাই আমাদের পূর্বজ, আমরা তাঁদের বংশজ। সহজ কথায়, আমাদের বাড়ির পরম্পরা কেন ছাড়ব। *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভায়াবহঃ*, নিজের বাড়ির পরম্পরা অনেক ভাল। আমার জন্মই এই ঋষি পরম্পরাতে, এই কারণেই আমি এই পরম্পরাতেই ফিট।

আচার্য শঙ্করের মতে, জন্মজনামন্তর ধরে যদি একটু একটু করে পূণ্য সঞ্চয় হয়, হাজার হাজার জন্ম ধরে ওই একটু পূণ্য ওই জন্মে জমল, একটু পূণ্য সেই জন্মে জমল। আপনি রাস্থা দিয়ে যাচ্ছিলেন, কোন সাধুর কথা আপনার কানে চলে এল, কিংবা একটা খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে একটা ভাল কিছু নজরে পড়ে গেল, কখন কোন ভিখারিকে দান করলেন, কদাচিৎ কোন মন্দিরে প্রণামী দিলেন; এইভাবে একটু একটু পূণ্য সঞ্চয় হতে হতে একটা জন্মে গিয়ে আপনার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাল। সাধুসঙ্গ না হলে ধর্ম লাভ সম্ভব না। বাড়িতে বাবা-মা বা জ্যেঠা, কাকারা ধর্মপ্রাণ হলে একটু সুবিধা হয়, বাড়ির অন্যান্যদের উপর তাঁদের জীবনধারা একটা ছাপ পড়ে। সাধু

যাঁরা, যাঁদের মনপ্রাণ সব ঈশ্বরে, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। একটু ধর্মভাব যখন জাগে, তখন একটু সাধনা করতে ইচ্ছে জাগে, এবং সাধনা করে। একটু মন্দিরে যাওয়া, জপধ্যান করা, একটু একটু করে শুরু হয়। সেখান থেকে একটু একটু করে ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মায়। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, অমুক ব্যক্ত মন্দিরে যায়, ধর্মকর্ম করে আবার চুরিও করে, মিথ্যা কথা বলে। শুধু এইটুকু দেখছেন, কিন্তু দেখুন ওইটুকু ধর্মাচরণ করে সে কত উপরে উঠে যাচ্ছে। আগে তো সে শুধু চুরিই করত, মিথ্যা কথা বলত, লম্পটগিরি করত, কিন্তু এখন সে বেলুড় মঠেও যায়। সে পথ ধরে নিয়েছে, ওর উত্থান শুরু হয়ে গেছে। যেখানে সে এতদিন শুধু আসুরিক বৃত্তি নিয়ে ছিল, যে এতদিন পুরোপুরি পতনের দিকে যাচ্ছিল, যে শুধু অসুর হয়েই পুরো জীবনটা কাটিয়ে দিতে, সেখান থেকে সে এখন বেরিয়ে আসা শুরু করেছে। এবার জোর লড়াই শুরু হয়ে গেছে শুভ আর অশুভ পথের মধ্যে। অশুভ পথ তাকে একদিকে টানছে, শুভ পথ একদিকে টানছে।

কিন্তু এই ধরণের লোকেরা যে কাজকর্ম করেন, তাদের সেই কাজকর্ম এখনও সকাম। আমরা নিজেদের দিয়েই যদি বিচার করি, বিশেষ করে যাঁরা জপধ্যান করছেন; পূজা করছেন, ভালই লাগছে; যে করেই হোক সকাল-বিকাল নমো নমো করে জপধ্যানটাও করছেন, দীক্ষা নিয়ে মন্ত্র জপ করছেন। কিন্তু যখন এনারা কাজ করেন, তখন সেই কাজ পুরো সকাম কর্ম। বাড়ির সবাই যেন ভাল থাকে, সুখভোগ, খাওয়া-দাওয়া যেন ভাল থাকে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কেন এমন হচ্ছে; একদিকে ধর্মভাব অন্য দিকে কাজকর্মগুলো যেন কেমন একটা ভোগীর মত। আপনার উপরে লোকেরা হাসবে, আপনিও বুঝতে পারবেন না, কি হচ্ছে। এবার যদি আপনি ধর্মে লেগে থাকেন, এই অর্থে এটা অত্যন্ত জরুরী কথা। আজকে আপনারা যাঁরা শুনছেন, আপনাদের তো আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আর যাঁরা শুনছেন না, তাঁদের মধ্যেও হাজার হাজার লোক আছেন যাঁরা মাঝে-সাজে মন্দিরে যান, মাঝে-সাঝে যাঁরা জপধ্যান করেন; লেগে যদি থাকেন তাহলে আপনাদের সবার একটা উত্থান হবে।

তার মানে দাঁড়ালো, ধর্মপ্রাণ মানুষদের অনেক প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণী হলেন, যিনি এই প্রথম ঢুকেছেন, জীবনে প্রথম একবার কি দুবার মন্দিরে যাওয়া শুরু করেছেন। বেলুড় মঠে প্রেমিক যুগলরা বিকালে ঘুরতে আসে, যে ভাব নিয়ে আসুক, বেলুড় মঠে তো আসছে, এতেও তাদের কিছু তো পূণ্য সঞ্চয় হল। চার জন্ম পর এই পূণ্যের সংস্কার এদের জীবনে প্রতিফলিত হবে। অনেক আগেকার কথা, একজন কম বয়সী সাধু একজন সিনিয়র সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই যে বেলুড় মঠে এত লোক ঘুরতে আসে, এতে এদের কি কিছু হবে'? সিনিয়র মহারাজ বললেন, 'অবশ্যই হবে, যে এসেছে তার হয়ত হবে না, কিন্তু হয়ত দেখা গেল তার সন্তানের উপর এই ছাপটা পড়ল'। যার জন্য আপনারা দেখতে পাবেন, আপনাদের মধ্যে হয়ত ধর্মভাব আছে, কিন্তু আপনাদের বাবা-মার মধ্যে নেই বা ছিল না। একজন ইয়ং ছেলে একদিন এসে আমাকে বলছেন, আপনাদের ক্লাশগুলো আমি পুরো মন দিয়ে শুনি, পঞ্চ মহাযজ্ঞও করছেন। ছেলেটির মাও শোনেন, কিন্তু বাবা পুরো ধর্ম বিরোধী। তার মানে ওর বাবা-মা হয়ত কোন দিন কোন মন্দিরে গিয়েছিল, সেই পূণ্যে ছেলেটি আজ ধর্ম পথে এসেছে। আমি যখন এই ঘটনাটা শুনেছিলাম, তখন আমি নূতন ব্রহ্মচারী, তখনই আমি সিনিয়র মহারাজের এই উত্তর শুনে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

কোন কর্ম থেকে কি হয়, আমরা কি করে জানব, জানার কোন উপায় নেই। হয়ত কোন জীবাত্মা বেলুড় মঠে ঘুর ঘুর করছিল, কোন জীবাত্মা হয়ত ওই গর্ভে ঢুকে গেছে। প্রথম হল, ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে; দ্বিতীয় আসা যাওয়াটা আর-একটু বাড়ল, তৃতীয় হল যারা ভিতরে ভিতরে লড়াই করে যাচ্ছে। আমি যত ভক্তদের দেখেছি, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ ভক্তরাই হলেন যাঁরা সত্যিকারের লড়াই করছেন। এখানে এসে দুটো জিনিস হয়। প্রথমটা হয়, ঈশ্বর সত্য, ঠাকুর আছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাসটা এসে যায়। দ্বিতীয়টা হল, আচার্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে খুব সুন্দর কথা বলছেন – একবার যাঁরা বুঝে নিয়ে এইভাবে ধর্মের পথ নিয়ে নেন, তাঁরাও মাঝে মাঝে ভুল কাজ করেন, তাঁদেরও

কামনা-বাসনা থাকে, তাঁদেরও ক্রোধ হয়, তাঁরাও হয়ত কামিনী-কাঞ্চনে ঢুকে যান। কিন্তু এগুলো হয়ে গেলে তাঁরা খেদ করেন। এখানে একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আপনারা যাঁরা শুনছেন, যাঁদের নিষ্ঠা এই পর্যায়ে চলে গেছে; হয়ত কোন মহিলা তাঁর প্রতি আকর্ষিত হলেন। উনিও মহিলার কাছে গেলেন, সঙ্গ করলেন। পরে কিন্তু তাঁর মনটা খুব খারাপ হবে, একটা অনুতাপ আসবে – কি দরকার ছিল, কেনই বা সঙ্গ দিতে গেলাম। তখন এটাও মনে হবে যে, আমার আগের আগের কেমন কর্ম জমে আছে, এখনও আমাকে দিয়ে এই ধরণের কাজ করাচ্ছে। এটাও একটা পরীক্ষা।

এই জিনিসটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন, আপনাদের কাজেও লাগবে। যে কোন জিনিস ভোগ করে নিজে বিচার করে দেখুন, জিনিসটা ভোগ করার পর আপনার কেমন লাগছে। ঠাকুর বলছেন, ভবনাথ পান, মাছ ত্যাগ করেছে তো কি হয়েছে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই আসল ত্যাগ। আমাদের একজন মহারাজ ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন, দক্ষিণ ভারতের শরীর। উনি একদিন এমনি কথায় কথায় বললেন, 'আমার এমন একটা কেক খেতে ইচ্ছে হয়েছে, যে কেক কোন দিন কেউ খায়নি।' এগুলো ছেলেমানুষী, বয়স কম হলে যা হয়। আমার এক বন্ধুকে বললাম। উনি আবার যেখানে কেক বানানো হয় সেখানে তাদের অনুরোধ করে একটা বিশেষ কেক বানালেন। সেই কেক মহারাজকে দিয়ে বললাম –এই নিন আপনার সেই কেক, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন। এই ধরণের ইচ্ছাগুলোর কোন দাম নেই। কেক খেলেন, 'দারুন দারুন', ব্যস্ ওখানেই সব মিটে গেল। উনি থোরাই বলবেন যে আমার খুব ভাল লেগেছিল, আবার একটা এই ধরণের কেক আনাবার ব্যবস্থা করুন, আবার খাই।

যাই হোক, আসল ভোগ হল কামিনী-কাঞ্চনের ভোগ বা নামযশের। ভোগের পর আপনার কেমন লাগছে, মনের মধ্যে কি বিচার আসছে; এটা দেখুন, আর এটাই পরীক্ষা। ভোগের পর যদি মনে হয় –আহা, আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল; কি ভালই না লাগল। তার মানে আপনি ভালভাবে আপনি ওর মধ্যে ডুবে আছেন। আবার আপনার মনে মনে ভোগের ইচ্ছা ছিল। সুযোগ পেয়ে ভোগটাও করলেন, কিন্তু ভোগ করার পর ভিতরে ভিতরে আপনি একটা অপরাধ বোধ করতে লাগলেন। তাহলে বুঝবেন, ধর্মজীবনে আপনার গাড়ি গতিতে চলছে –এটাই একমাত্র পরীক্ষা। অনেক আগে একটা বাচ্চাকে দেখেছিলাম। কালীপূজার রাতে আশেপাশে সবাই তারাবাজী জ্বালাচ্ছে, বাচ্চাটিরও ইচ্ছে হল সেও তারাবাজী হাতে নিয়ে জ্বালাবে। কেউ জ্বালাচ্ছে দেখেই বাচ্চা মেয়েটি তাকে বলছে, এই আমাকে দাও, আমাকে দাও। বাচ্চাটির বাবা তখন নিজে একটা তারাবাজী জ্বালিয়ে বাচ্চাটির হাতে যেমনি দিতে গেছে, হাতে নিয়ে মেয়েটি ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। অনেক আগে এই ঘটনাটা দেখেছিলাম, কিন্তু ওই দৃশ্যটা আমার মনে গভীরে রেখাপাত করেছিল।

গৃহস্থের ভোগে আর সাধকের ভোগে এই তফাৎ। গৃহস্থের ভোগ হল –বাঃ বাঃ, কেমন সুন্দর লাগছে, এই দেখ আমি হাতে নিয়ে কেমন ঘোরাচ্ছি। আর যিনি সাধক, সন্ন্যাসীরাও সাধকই হন, উনি দেখার পরেই বলবেন –এই জিনিসটা কি, দেখি দেখি কি জিনিস। এখানে আগ্রহ নেই, কিন্তু প্রচণ্ড কৌতুহল, জিনিসটা কি একবার জানতে ইচ্ছে করছে। যেমনি হাতে নিয়ে দেখে নিলেন, তারপরই জ্বলন্ত কয়লাকে হাত থেকে যেভাবে ফেলে দেয়, ঠিক সেই ভাবে জিনিসটা ছেড়ে দেবেন। আবার সে হয়ত চাইবে, একবার করে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু খেদ করবে, কেন আমি এরকম করছি, কেন আমি এরকম করতে গেলাম। একটু পরেই হয়ত মনটা আবার ওদিকে যাবে। কিছু করার নেই এখানে। ওখানে যদি আপনি জোর করে মনকে আটকাতে যান, মাথাটা আপনার খারাপ হয়ে যাবে। ওই করে করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, কাঁদতে হয়, খেদ করতে হয় –ঠাকুর আমি এই ভোগ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। এই জায়গা থেকে ঠিক ঠিক সাধনা শুরু হয়; ভোগ করার পর যাদের মনে খেদ হয়, ধুর না করলেই পারতাম। দেখে নিলাম, দেখা হয়ে গিল ঠিক আছে; আবার হয়ত মন যাবে। গেলেন, কি করবেন, একবার করলেন, দু-চারবার করলেন, ভোগটা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। যে কোন ভোগ একবার করার পর দ্বিতীয়বার যদি করেন, তাহলে বুঝবেন আগের আগের কর্ম আপনাকে ঠেলে

আপনাকে ভোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যদি একবার ভোগ করার পর ইচ্ছাটা যদি চলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, ওই ভোগটা আপনার জন্য ছিল না।

এই করে করে সাধনা যদি শুরু হয়ে যায়, তখন কয়েকটা জিনিস এসে যায় –এক, পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঈশ্বর সত্য। দুই, আমি যে ভোগগুলি করছি, আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার আমাকে ঠেলে দিয়ে এগুলো করাচ্ছে। যবে থেকে ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবে থেকে আমি, আপনি সৃষ্টির কাজে সহায়তা করে এসেছি। পোকামাকড় যখন ছিলেন তখনও সৃষ্টিতে নিজের যোগ রেখেছেন, ভেড়া-ছাগল যখন ছিলেন তখনও করেছেন। গরু-হাতি যখন ছিলেন তখনও করেছেন। আবার মানুষ যোনিতে এসে যতবার জন্ম নিয়েছেন তখনও একই জিনিস করেছেন। হঠাৎ একটা জন্মে এসে আপনি বলবেন, আমি ত্যাগী, আমি বৈরাগী, তা কি সম্ভব কখন? একদিনে সবাই নরেন, রাখাল হয়ে যাবে, তা কি সম্ভব? একদিনে রাজা জনক বা নারদমুনি হয়ে যাবেন? কখনই তা সম্ভব নয়। এই সংগ্রামটা জোরালো চলে –প্রথমে হল একটু রুচি আসে, দ্বিতীয় ধাপে ভোগ করতেও ভাল লাগছে, সাথে সাথে জপধ্যান করার ইচ্ছেও হচ্ছে। তৃতীয় ধাপে –একশ ভাগ ঈশ্বরে বিশ্বাস আসে। তখনও কিন্তু ভোগ পুরোপুরি ছাড়তে পারে না। কিন্তু ভোগ করার পরে মনে খেদ হয়, কেন ভোগ করতে গেলাম; এবার আপনার গাড়ি চলতে শুরু হল।

আগেকার দিন, অর্থাৎ আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বিশেষ করে গ্রাম দেশের রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ট্রেন আসার আগে ঘন্টি বাজাতো, ট্রেন ছাড়ার আগেও ঘন্টি বাজাতো। কেন? লোকেদের জানান দেওয়ার জন্য, এই ট্রেন আসছে, ট্রেন এবার ছাড়বে। এখন অবশ্য গার্ড হুউসেল বাজায়, ইদানিং ট্রেন এত লম্বা হয় যে, হুউসেল ঠিক ঠিক শোনা যায় না। এখনও হয়ত কোন কোন স্টেশনে ঘন্টি বাজায়। এই যে খেদ হয়, কেন করতে গেলাম; বুঝবেন এটাই হল আধ্যাত্মিক রেলগাড়ি আসার জন্য ঘন্টি বাজান, ট্রেন এবার প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে। একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, কারণ এটা আমার কথা না, আচার্য শঙ্কর এই কথা বলেছেন। আচার্য বলছেন, জ্ঞানী তিন প্রকার –প্রথম হল জ্ঞানী, যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছ, যাঁকে বিজ্ঞানী বলা হয়। দ্বিতীয় জ্ঞানী হলেন, যিনি তত্ত্বটা জেনে গেছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়নি। আর তৃতীয়, যিনি আধ্যাত্মিক পথ নিয়ে নিয়েছেন তিনিও জ্ঞানী।

গীতায় ভগবানও বলছেন, *জ্ঞানীনো নিত্য বৈরীণা*, যিনি জ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, তাঁর আবার শত্রু কে হবে? সেখানে আচার্য ব্যাখ্যা করছেন, যিনি ঈশ্বরের পথে এসে গেছেন, যিনি জ্ঞানের পথ নিয়ে নিয়েছেন, তিনিও জ্ঞানী। যেমন যে আজ ক্লাশ ওয়ানে পড়ছে সেও একজন ছাত্র, আবার যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ছে সেও ছাত্র। ভক্তিপথ যিনি নিয়ে নিয়েছেন তিনিও ভক্ত, আর মীরাবাঈও ভক্ত। জ্ঞানপথকে যিনি ধরে নিয়েছেন তিনিও জ্ঞানী আর যিনি বুঝে গেছেন ঈশ্বর কি, আত্মজ্ঞান কি, তিনিও জ্ঞানী। বোঝানর সময় আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়, গীতাতেই আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এখন এনারা নিষ্কামকর্ম করতে পারেন।

ঠাকুর এখানে এই যে বলছেন –সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কামকর্ম করতে পারে, এই কথা ঠাকুর এনাদের সম্বন্ধে বলছেন। এনারা তখন দেখেন, আমার কিছু দায়ীত্ব আছে, আমি এই দায়ীত্ব পালন করব, কিন্তু যে কাজটাই করবেন, সবটাই নিষ্কাম ভাবে করেন। আপনাদের মনে যদি হয়, কই আমি তো নিষ্কামকর্ম করতে পারছি না; এই কারণেই আপনি পারছেন না; আপনাকে এখনও অনেক সাধনা করতে হবে। এর পরীক্ষা হল –ভোগ করার পর আপনার কেমন লাগছে। ভোগ করার পর যদি আপনার ভাল লাগে, একটা সুখ বোধ হয়; তাহলে বুঝতে হবে, আপনার এখন সময় লাগবে। ভোগ করার পর যদি আপনার মনে হয়, কি দরকার ছিল ভোগ করার, কেন যে করতে গেলাম; তাহলে বুঝবেন আপনি এখন জ্ঞানের পথে পা রাখতে চলেছেন। আমাদের টুকটাক ভক্তদের সাথে যে কথা হয়, সেখানে অনেক সময় তাঁদের নিজেদের ভিতরের কথা আমাদের বলেন। তাঁদের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁদের মনেও এই কামনা, সেই বাসনা আছে, এগুলো থাকে; কিন্তু এনজয় করেন না।

এনজয় করা, ভালো লাগা, এটাই হল মূল। একটা কোন ভোগে এনজয় করা, রমণ করা, ওই ভোগে বাস করা –তার মানে এখনও আপনাকে সকাম কর্মই করতে হবে। এখানে ভালমন্দের কথা বলা হচ্ছে না, কর্মের কথা বলছি; সকাম কর্ম এখনও চলবে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে উপরে দিকে যখন উঠবেন, তখন ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস হবে, ঈশ্বর সত্য, তখন ভোগের ব্যাপারে একটা আত্মগ্লানি বোধ আসবে, এখান থেকে এবার নিষ্কামকর্মের দিকে চলে যাবেন।

যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে; তাঁদের সমস্ত কর্ম নিষ্কামকর্মরূপে হয়। কারণ তাঁদের আমি তুমি ভেদ থাকে না। গীতায় ভগবান রাজা জনকের কথা বলছেন, ঠাকুর দেবর্ষি নারদের কথা বলছেন, আমরা যেমন স্বামীজীকে নিয়ে বলছি; এনারা যা কিছু করেন সব মানবজাতির, সমস্ত প্রানীর মঙ্গলের জন্যই করেন। অবতারদের কর্মকে নিষ্কামকর্ম বলাও যাবে না, আচার্য বলছেন *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, অবতারের কর্মকে নিষ্কামকর্ম বলা যায় না, কারণ ওনারা যা কিছু করেন সব জীবের মঙ্গলের জন্যই করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু করেছেন বা ঠাকুর যা করেছেন, তা নিষ্কামের আরও উপরে। অবতারের শিষ্যরা যাঁরা হন, যাঁরা যুগপ্রবর্তক হন, তাঁরা নিষ্কামকর্ম করেন। দেবর্ষি নারদ, শঙ্করাচার্য এনারা লোকশিক্ষার জন্য কাজ করেন।

আপনি বলবেন, আমিও তো কাজ করি; কাজ করছেন ভাল, কিন্তু দেখুন আপনি যে কাজ করছেন, তার মধ্যে আপনার কি কোন স্বার্থ আছে? যদি থাকে, তার মানে ওই কাজ নিষ্কামকর্ম না। আর দ্বিতীয় ভোগের ব্যাপারে যেটা বলা হল, ওই জায়গাতে গিয়ে যখন ভোগ করে গ্লানি বোধ হতে শুরু হয়, তখন বুঝতে হবে আপনার পথ এখন পাল্টাতে শুরু করেছে। আপনার সন্তান থাকতে পারে, কিন্তু সন্তানের প্রতি আসক্তিটা এলেমেলো। নিষ্কামকর্ম কি, এই হল তার একটা বর্ণনা। প্রথম কথা বেশির ভাগ মানুষ নিষ্কামকর্ম বিশ্বাসই করে না। অনেক ভক্ত বা সাধক আছেন, যাঁরা মুখে বলছেন আমি নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু তাঁদের সমস্ত কর্মই সকামকর্ম। সাধনা যদি করতে থাকেন, তখন এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হয় –এই কাজ দিয়ে আমি ঠাকুরের পূজা করছি, কাজের ফল ভালমন্দ যাই হয়ে থাকুক, সব ফল ঠাকুরের প্রতি অর্পণ করলাম। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিষ্কামকর্ম করা যেতে পারে। ঠাকুর এখানে সাবধান করে দেওয়ার জন্য এই কথা বলছেজন।

ঠাকুর আবার চলে আসছেন অবধূতের গুরুর প্রসঙ্গে, যেখানে তিনি অবধূতের আর-এক গুরু মৌমাছিকে নিয়ে বলছেন। চেষ্টা করলে আমরা জীবনের সব কিছু থেকে শিক্ষা নিতে পারি, অবশ্য মন যদি সজাগ ও তৈরী থাকে। তৈরী যদি না থাকে আর চেষ্টা যদি না থাকে, আমাদের চোখের সামনে দিয়েই শিক্ষা নেওয়ার মত অনেক কিছু বেরিয়ে চলে যাবে, আমরা শিক্ষা নিতে পারব না। মন যদি ক্ষেতের মত তৈরী হয়ে যায়, সেই ক্ষেতে বীজ পড়লে ফসল হবে। মৌমাছিকে নিয়ে ঠাকুর বলতে চাইছেন –সঞ্চয় করে কোন লাভ নেই। **মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেকদিন ধরে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর-একজন এসে চাক ভেঙে নিয়ে যায়**। কি হল মধু সঞ্চয় করে? **মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে নাই**।

আমার পরিচিতদের মধ্যে যাদের টাকা আছে, তাদের আমি বলি, আপনার যদি ভোগেরও ইচ্ছা থাকে, শরীর থাকতে থাকতে যদি একটু দান করেন দুজন লোক এসে আপনার প্রশংসা করবে। মৃত্যুর আগে কাউকে উইল করে লিখে দিয়ে গেলেন, তাতে আপনার কি লাভ হল। আপনি যে উইল করলেন, কোথাও কাউকে একটু কিছু দান না করে আপনি টাকা স্ত্রী-সন্তানদের লিখে দিলেন; আপনি তো আবার সেই নিম্ন যোনিতেই যাবেন। কারণ টাকা-পয়সা, সম্পত্তির প্রতি আপনার যে আসক্তি সেটা তো থেকেই গেল। বেঁচে থাকতে থাকতে যদি দেন, লোকেরা খুব করে আপনার নাম করবেন।

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আমি বলে দিই, আমি গুপ্ত দানে বিশ্বাস করি না। শুধু যে লোকেরা আপনার নাম করবে তাই না, আপনার দান দেখে অন্যরাও দান করতে উৎসাহ পাবে। অত

যদি সখ থাকে তাহলে দু জায়গায় প্রকাশ্যে দান করবেন, আরও দুটো জায়গায় গুপ্ত দান করবেন। যাঁরা ভোগী, টাকা-পয়সার প্রতি যাঁদের প্রচণ্ড মোহ আছে তাঁরা দান করলে লোকেরা বলবে –দেখ দেখ দান করছে সেটাতেও নাম কিনছে। আপনারা শুধু নাম কেনাটাই দেখছেন, কিন্তু দেখুন, টাকা-পয়সার মোহটা তো ছাড়ল। মৃত্যুর পর আপনার টাকা যে দানে গেল, তাতে কার লাভ হল? মন্দির কিছু দান পেল, দুটো গরীব দান পেয়ে খুশি হয়ে গেল, তাতে আপনার কি হবে? আপনার আসক্তি যেমন ছিল তেমনটাই থেকে গেল। দান করে আপনার কোন লাভ হল না।

সাধুদের কথা বলছেন –**সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সঞ্চয় করতে নাই**। অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন –সাধু হল রাজার ব্যাটা, না চাইতেই তার মাসোয়ারা এসে যায়। এগুলো নিজস্ব বিশ্বাস, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধার ব্যাপার। আমাদের সন্ন্যাসী ভাইরা অনেকেই আমার এই ক্লাশগুলো শোনেন, আমি জানতাম না যে তাঁরা শোনেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলি, সাধুদেরও টাকা-পয়সার দরকার পড়ে। আজ যদি আমি তীর্থে যেতে চাই, আমাকে কে দেবে টাকা? বেলুড় মঠের নিজেরই টাকা নেই, কোথা থেকে দেবেন। কারণ বেলুড় মঠে ভক্তরা ও সাধারণ মানুষরা যে প্রণামী দেন, সেটা তাঁরা দেন জনসাধারণের সেবার জন্য, রিলিফের জন্য, বিনামূল্যে চিকিৎসাদির জন্য, বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজের জন্য। আমি মঠের অনেক সন্ন্যাসী ভাইদের জানি, এত উচ্চমানের সাধু যে কল্পনা করতে পারবেন না। বাইরের জগতে একটি কেউ তাঁর পরিচিত নেই। তাঁদেরও তো ইচ্ছে হয়, একবার চারধাম, খুব হলে শুধু কেদারবদ্রী ঘুরে আসে। আমাদের একজন সন্ন্যাসী, বিদেশে থেকেই পড়াশোনা করেছেন, বিরাট বড় সাধু, কিন্তু কারুর সাথে পরিচিতি নেই। আজ যদি তিনি সন্ন্যাসী না হতেন, এমনিতেই তাঁর কোটি টাকার মত স্যালারি হত। একজন অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, অথচ বাইরে তাঁর কোন নাম নেই। এই ধরণের সাধু আমাদের অনেক আছেন।

যাঁর কথা বলছিলাম, তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে বলছেন, 'মহারাজ, আমি ভাবছি তীর্থে যাব, একটু ব্যবস্থা করে দেবেন?' আমি বললাম, 'মহারাজ, আপনার মত সন্ন্যাসী মুখ ফুটে আমাকে ব্যবস্থা করে দিতে বলছেন, এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি শুধু বলুন আপনার কত কি লাগবে, আমি ঠিক তার দ্বিগুণ আপনাকে ব্যবস্থা করে দেব।' উনি খুব সাধারণ একটু দু-চার হাজার টাকার কথা বললেন। সাধুর কোথায় টাকা পাবেন। ঠাকুরই আবার একজন ভক্তকে বলছেন –জগতে সব সুখ বুঝি তোমরাই ভোগ করবে। সাধুরা যদি এখান থেকে কাশী যায়, তাঁরা পায়ে হেটে যাবে; সাধুরা যদি হরিদ্বার যায় ট্রেনের জেনারেল ক্লাশে যাবে আর আপনারাই শুধু প্লেনে করে বা এসি ফার্স্ট ক্লাশে যাবেন, যত সুখ আপনারাই ভোগ করবেন। কিন্তু সাধুরা গৃহস্থদের কাছে কখন চাইতে যাবেন না। আমাদের সাধুদের মধ্যে দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক তাই, চায়ও না, শুধু বলে দিলেন, মহারাজ একটু তীর্থে যাচ্ছি। যিনি দেবেন তিনি নিজে থেকেই ব্যবস্থা করে দেবেন। সাধুরা কারুর কাছে চাইতে যাবেন না। এখন কোন সাধুর যদি ইচ্ছে হয় অমরনাথ যাবেন, তিনি কি করবেন। এখানে বক্তব্য হল, সাধুরা কক্ষণ চান না, যা আছে আর যতটুকু পেলেন, ওই দিয়ে চালিয়ে দেন। কিন্তু কোন না কোন ভাবে তাঁর ঠিক সব জুটে যাবে। সাধু-সন্ন্যাসীদের যাঁদের ঠাকুরের প্রতি একটু বিশেষ নির্ভরতা তাঁরা এটা ভাল করে জানেন, এবং মানেন; কক্ষণ চাইবেন না।

এই কথা বলার পরেই ঠাকুর বলছেন –**এটি সংসারীর পক্ষে নয়**। আপনাদের জন্য এটা নয়, তবে আপনাদের মধ্যে যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত, তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে নেন; যতটুকু সম্বল আছে তার মধ্যেই সব কিছু মানিয়ে নিয়ে চলেন। **সংসারীর সংসার প্রতিপালন করতে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়**। সংসারীদের টাকা দিয়ে সন্ন্যাসীদের জীবন চলে, তাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে সরকার চলে। সংসারীরা যদি টাকা না রাখে সমাজই ভেঙে যাবে। **পন্ছী (পাখী) আউর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখির ছানা হলে সঞ্চয় করে –ছানার জন্য মুখে করে খাবার আনে**। একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন, সংসারে সংসারীদের কিভাবে থাকতে হবে।

দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটলি-পাটলা থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড়-বুচকি থাকে তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। ঠাকুর এখানে খুব শ্রেষ্ঠমানের সাধুদের কথা বলছেন। সাধুদেরও কিছু উপায় নেই, কিছু জিনিস তাঁকে সঙ্গে রাখতে হয়। **আমি বটতলায় ওইরকম সাধু দেখেছিলাম। দু-তিনজন বসে আছে, কেউ ডাল বাছছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই করছে, আর বড় মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গল্প করছে। বলছে, 'আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া –পুরি, জিলেবী, পেড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া'। (সকলের হাস্য)** ঠাকুরের হিন্দি একেবারে পরিষ্কার। হিন্দিটা খুব ভাল বলতেন। ঠাকুর এখানে খুব উচ্চ আদর্শ রাখছেন, কিন্তু সাধারণ মানের সাধুরা এই উচ্চ আদর্শ ধরে রাখতে পারেন না, তাঁরা আর কি করবেন। সাধুরা এই ধরণের সেবা কদাচিৎ পায়; সেইজন্য ঠাকুর অন্যত্র বলছেন –সব সুখ বুঝি তোমরাই শুধু ভোগ করবে।

বিজয় –আজ্ঞা হ্যাঁ। গয়ায় ওইরকম সাধু দেখেছি। গয়ায় লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) –ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কর্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়। আমরা যেখানে নিষ্কামকর্মের কথা শুরু করেছিলাম, সেখানে বলা হয়েছিল, নিষ্কামকর্মে দায়ীত্ব থাকবে না, ফলে দৌড়াদৌড়ি এসবও থাকবে না। **যাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে। –সব ছেড়ে তুমি বলো, 'মন, তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে'**। এই যে ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কর্মত্যাগ হয়ে যায়, এর উপর একটা ঘটনার কথা বলি। দুজন খুব নামকরা মহারাজ, দুজনেই মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট, একজন গত হয়েছেন, অন্যজন আছেন। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। একজন যে সেন্টারে ছিলেন, সেখানে যেন আগুন জ্বলছে, দুষ্ট লোক সব জায়গাতেই থাকে, বদমাইশি করে। অন্যজন প্রচুর জপধ্যান করেন, ঈশ্বরে মন দিয়ে রাখেন। সেই সময় দুজনের কেউই ট্রাস্টির সদস্যও ছিলেন না। তাঁকে বলছেন, 'আপনাকে যদি ওই সেন্টারে পোস্টিং দেওয়া হয়, তাহলে আপনি কি করবেন'? অন্যজন তখন বলছেন, 'প্রথম কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর কখনই আমাকে ওই ধরণের কাজে রাখবেন না। দ্বিতীয় কথা, কোন কারণে যদি আমাকে ওখানে যেতেই হয়, আমি আমার ঘরের দরজাটা বন্ধ করব আর আমার জপধ্যান চালিয়ে যাব। এরপর যত আগুন জ্বলার জ্বলুক, তাতে আমার কি, আমার কিছু আসবে না তাতে'। একেবারে বাস্তব ঘটনা।

ঠাকুর তাঁর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য বর্ষণ করে 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে', এই গান করে বিজয়কে বলছেন –**ভগবানের শরণাগত হয়ে এখন লজ্জা, ভয় –এ-সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে' –এ-সব ভাব ত্যাগ কর**।

২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩, (পৃঃ ৩০০) এই দিনের প্রসঙ্গ চলছে। বিজয় ও অন্যান ব্রাহ্মভক্তরা আছেন। এরপর সেখানে বিজয় ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্য করে ঠাকুর খুব নামকরা কথা বলছেন – **লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, গোপন ইচ্ছা –এ-সব পাশ। এ-সব গেলে জীবের মুক্তি হয়**।

অষ্টপাশ অর্থাৎ, যার মধ্যে জাতি অভিমান, কুল, শীল ইত্যাদি আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ষড়রিপুর কথা অনেকবার শুনে থাকবেন। এটাকে খুব সাধারণ ভাবে কল্পনা করা যেতে পারে –শুদ্ধ জল আছে, সেই শুদ্ধ জলে কোন রং জাতীয় কিছু একটা মিশিয়ে দেওয়া হল; ওই রঙের সাথে আরও একটা দুটো অন্য রঙ দিয়ে দেওয়া হল। স্বাভাবিক ভাবে সাদা জলের রঙ পাল্টে যাবে। শুদ্ধ জলের পরিবর্তে যদি স্ফটিক ভাবি, আর সেই স্ফটিকের সামনে কোন রঙিন বস্তু রেখে দিলেন, স্ফটিক তখন সেই বস্তুর রঙ ধরে নেবে। এবার আমরা যদি কল্পনা করি, স্ফটিকের চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা আছে। তাহলে স্ফটিক এখান নিজেকে এক রকম দেখবে, সামনের স্ফটিককে অন্য রকম দেখবে। জলের উপমাটা পুরোপুরি এই জন্যই ঠিক না, জলে রঙে দেওয়া হলে জলের স্বভাব সত্যিই পাল্টে যায়।

কিন্তু হিন্দু ধর্মে আমাদের যে স্বভাব, স্বভাব বলতে আমাদের যেটা বাস্তবিক স্বরূপ, সেটা কিন্তু একটুও পাল্টায় না। যা কিছু আছে এটা আবরণ। এই আবরণগুলিকে শাস্ত্রে অনেক ভাবে বলা হয়েছে, যেমন অবিদ্যা, কাম, কর্ম। আবার ষড়রিপুর ঝামেলা আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ লেগে আছে, তার সাথে আছে অষ্টপাশ –লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। তাহলে কি আমরা নির্লজ্জ হয়ে যাবো? না, নির্লজ্জ কখনই হবো না। এর মধ্যে প্রথম যেটা হয়; আপনাদের যে ধর্মসাধনা, সেখানে যেন এই জিনিসগুলি না থাকে। যাঁরা ধর্মসাধনা করছেন, তাঁদের জন্য এইটা খুব সিরিয়াস হয়ে যায়। আমাদের একজন মহারাজ কথায় কথায় একদিন বললেন, নিউজিল্যাণ্ডে একজন বাঙালী ভদ্রলোককে তিনি দেখেছেন, যিনি নিজেকে হিন্দু বলতে খুব লজ্জা বোধ করেন। নিউজিল্যাণ্ডে কেন, এখানেও অনেকেরই হিন্দু বলতে লজ্জা করে। দিল্লীতে দেখবেন, ওখানে মেয়ের সব কিছু করছে, কিন্তু যখন মন্দির যাওয়ার হয় তখন ঠিক একটা ট্রাডিশানাল ড্রেস পরে অবশ্যই যাবে। কিন্তু কলকাতাতে ব্রাহ্মসমাজাদির এত প্রভাব যে, এখনও অনেকে ধর্মের নামে লজ্জা বোধ হয় করে, মন্দিরে যেতে লজ্জা পায়। এরাই আবার শিবলিঙ্গের মধ্যে নাকি লিঙ্গ দেখে। এটা তো গেল লজ্জার ব্যাপার। তেমনি ধর্মের কোন কিছুকে ঘৃণা করতে নেই। বর্তমানের কিছু ইংরাজী পড়া লোকদের দেখবেন, এমন এমন জিনিসকে নিয়ে বলবেন যে, মূর্তিপূজাদির কথা ভাবলেই আমাদের লজ্জা পায়।

ভয় আর-একটা সাংঘাতিক জিনিস, যদি আপনি হিন্দু হয়ে থাকেন, এতে আপনার কিসের ভয়? কিছু দিন আগে পহেলগাঁওয়ে যে নৃশংস কাণ্ড হয়েছে, সেখানে কিছু মুসলমান আতঙ্কবাদী, তারা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েছে, তাই মুসলিম আতঙ্কবাদীই বলতে হবে। এখন আতঙ্কে ধর্ম হয় কিনা, ধর্মে আতঙ্ক হয় কিনা; এর মীমাংসা রাজনীতি নেতাদের জন্য থাক। সেখানে পরিষ্কার বলছে কলমা পরতে হবে। হিন্দুরা কলমা কি কেন জানবে, জানারই বা কি দরকার আছে। আমি যদি জানতাম, জানলেও আমি বলব না, তুমি যা খুশি করার কর। একদিনে এটা হবে না। একজন সাধারণ হিন্দুর কাছে আমরা এতটা আশা করতে পারিনা। কারণ তাদের কাছে নিজের আপনজন, নিজের প্রাণ, এগুলোর দাম আছে।

ঠাকুর সাধারণ লোকদের জন্য একটা কথাও বলছেন না। কথামৃত, গীতা, ভাগবত এই শাস্ত্রগুলো সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। একটু উচ্চমানের যদি না হন, ধর্ম চেতনা একটু যদি না জেগে থাকে, তাহলে এই শাস্ত্রগুলো কি বলতে চাইছে বুঝতে পারা যাবে না। সেইজন্য রামচরিতমানস রচনা করতে গিয়ে তুলসীদাস এতগুলো কাহিনী দিয়ে দিলেন, আর সেই কাহিনীর মাধ্যমে কিছু কিছু ধর্ম কথা এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিলেন, যাতে জনগণের মধ্যে ওই ধর্মীয় ভাবগুলো বসে যায়। কিন্তু রামচরিতমানসের যে ভাব সেই তুলনায় অধ্যাত্ম রামায়ণ অনেক উচ্চ ভাবের। অধ্যাত্ম রামায়ণ, কথামৃতের ওই উচ্চ ভাব, একবার যে ওই উচ্চ ভাবে জেগে উঠেছে, তার তো হাতির দাঁতের মত দুই প্রকার –কিছুটা নিজের খাবারের জন্য, কিছুটা বাইরে দেখাবার জন্য। কিন্তু আমার সাধনা আমার সাধনা, কিন্তু গর্বের সাথে বলব, আমি হিন্দু, আমি ধর্ম সাধক; এখানে লুকোচুরির কিছু নেই। এরপর যদি আমাকে মারতে চায় মারুক, কি আর করা যাবে।

আমাদের শাস্ত্রে দু রকমেরই কথা আছে –একদিকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে বলে, ওদেরকেও মারতে হবে। কিসের ভয়, হাজার বছর ধরে হিন্দুরা তো মার খেয়েই আসছে। যারা দুর্বল প্রকৃতির ছিল তারা অন্য ধর্মে চলে গেছে। ভারতের বেশির ভাগ মুসলমানরা যারা নিজেদের আজ মুসলমান বলে, এদের বেশির ভাগই হয় লোভে, নয় ভয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে। আপনাদের পূর্বপুরুষরা লোভে পরেও নিজের ধর্ম ছাড়েননি, ভয়েও ধর্ম ছাড়েননি। এরপরেও যদি নিজেকে হিন্দু বলতে আপনাদের লজ্জা হয়, কিছু বলার নেই। যাঁরা তোমার ধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে দিলেন, সেটার জন্য তোমার একটু চেতনা নেই, এত নিমকহারামি। আবার নির্লজ্জের মত বলা –আমি ধর্মটর্ম মানিনা।

ঠাকুর যে কথা এখানে বলছেন, এসব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই জিনিসগুলি ধর্মের প্রতি, ইন জেনারেল নয়। দ্বিতীয় কথা এমন কিছু করবে না, যেটা করতে তোমার লজ্জা বোধ হবে। এমন কোন জায়গায় যাবে না, বা করবে না, যেটা করলে তোমার ঘৃণা বোধ আসবে, ভয় করবে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে আসে। মূল বিষয়টা হল, আমাদের মন যত সঙ্কুচিত, এই ভাবগুলো তত বেশি আসবে। অল্প বয়সে আমাদের কেউ যদি বক্তৃতা দিতে বলত, স্টেজে উঠে আমাদের হাত-পা কাঁপতে শুরু করত, গলাটা শুকিয়ে আসত। কেন? দুর্বল বলে, তখন অত জ্ঞান আহরণ হয়নি। একটু বড় হয়ে গেলে তখন সবাই কেমন ফরর্ ফরর্ করে লেকচার দিতে শুরু করে দেবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের সাথে সাথে এগুলোর কোনটাই থাকে না। এই যে মানুষকে সীমিত করে দেয়; প্রথমে আমরা জল আর স্ফটিকের উদাহরণ দিলাম, এই হল আবরণ; মানুষকে ছোট করে দিচ্ছে। ঠাকুরের খুব নামকরা কথা –পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব। শুধু যে অষ্টপাশ তা না; বেদান্তের দৃষ্টিতে অবিদ্যা, কাম, কর্ম এগুলোও আমাকে আপনাকে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সরিয়ে রাখছে। অবিদ্যা আমাদের মধ্যে অপূর্ণতার বোধ নিয়ে আসে, নিজের মধ্যে কামনা জাগায়। আমাদের মধ্যে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি আসে, যেগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে, এগুলো সব আসে অবিদ্যা থেকে।

ঠাকুর বলছেন, **পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব** – এখানে যেটা খুব জরুরী কথা, যেটা আপনাদের জানার কথা, সেটা হল, জীব আর শিব এই দুটোর মধ্যে গুণগত কোন তফাৎ নেই। গুণগত তফাৎ বলতে বোঝায় –আমিও যা তুমিও তা। সমুদ্রে বরফের চাঁই ভেসে যাচ্ছে। সেই বরফের চাঁই থেকে এক টুকরো বরফ ভেঙে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। সে বরফের টুকোরো বড় বরফের চাঁইএর দিকে তাকাচ্ছে, আর তাকে বলছে, আমাদের এখান থেকেই জন্ম। জানো আমরা কোথা থেকে এসেছি? সেই ভগবান থেকেই এসেছি, আমি ভগবান। মাঝখান থেকে আর-একজন এলো –তুমি এই যে সমুদ্রে ভাসছ, তুমি যা সমুদ্রও তাই –তত্ত্বতঃ। তার মানে, তুমি যা, আইসবার্গও তাই। কি পাগলের প্রলাপ করছেন মশাই?

ইদানিং খোল করতাল বাজিয়ে যারা কৃষ্ণ নাম করছে আর অদ্বৈতকে উঠতে বসতে গালাগাল দেয়, আসলে এরা ধর্মকে বোঝেই না, কি আর করবে। Spritual immature যারা তারা এই রকমই কথা বলবে। সেমিনারে দর্শনের যখন আলোচনা হয়, সেখানে আমার একট মত, তোমার একটা মত – সেখানে অমিল থাকবে, তাই বলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেওয়া! বোঝা যায় ভিতরে একেবারে পুরো নর্দমা বইছে। ইউটিউবে রামানুজের উপর আমার একটা ব্যাখ্যা ছিল। পাঁচটা বই ঘাটাঘাটি করে আমি বলছি না, আর আমি রামানুজপন্থী না, কোন দিন হবও না। এক রামানুজ ভক্ত আমার নাম করে লিখছে, this man করে, 'এই লোকটা'। আমি হতবাক; তুমি নিজেকে বলছ, আমি রামানুজের শিষ্য, আর তোমার মুখে এই ভাষা! This man এই তোমার ভাষা। দ্বৈতবাদী মানেই অভদ্রতার শেষ কথা, আমি সবার কথা বলছি না।

অদ্বৈত কখন এই রকম করে না। যদি কেউ করে, তবে বুঝবেন সে অদ্বৈত বোঝে না। কিন্তু তাতেও, দ্বৈত বলুন, বিশিষ্টাদ্বৈত বলুন, এনারা কেউ তত্ত্ব গত ভেদ মানেন না। বরফের ছোট টুকরো, বরফের চাঁই, বরফের বিশাল আকৃতির পাহাড়, এই ভেদটাকে সত্য বলে মানবেন, কিন্তু তত্ত্বতঃ যে অভেদ মানবেন না। চৈতন্যের কণা আর চৈতন্যের সমুদ্রে যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ হতে পারে না; এদের কোন দিন বোঝান যাবে না। আসলে এদের মনটা পুরোপুরি এত পদার্থবাদী যে, এই জিনিস ধারণার মধ্যেই এদের আসবে না। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম তো অভেদটা মানবেই না। আমি যা আমার ঈশ্বরও তাই, জহুদি, ইসলাম, খ্রীষ্টান কোন দিন এই জিনিসটাকে মানবে না। অথচ বাইবেলে বলছেন, I and my Father in Heaven are one। তখন বলবে, উনি এক, কিন্তু আমরা আলাদা। যতক্ষণ কেউ হিন্দু ধর্মকে না অধ্যয়ন করছে, ততদিন সে নিজের ধর্মকেও বুঝতে পারবে না।

বাংলাদেশ থেকে একজন মুসলমান কোথায় পুরাণের কোন এক কাহিনী পড়ে আমাকে লিখছে –যে ধর্মে ব্রহ্মা নিজের মেয়েকে এই করে সেই করে; কোথা থেকে এই কাহিনীগুলো খুঁজে খুঁজে বার করে জানিও না, ওদের কাছ থেকে আমাকে পুরাণের কাহিনী শিখতে হচ্ছে। ব্রহ্মা সরস্বতীকে সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বর আর বাক্ এক। সৃষ্টি যখন হয় তখন সৃষ্টি আর বাক্ এক, সেটাকে বোঝানর জন্য বলছেন –ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্যকে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। এটাকেই পরে পরে যে কবিরা এলেন তাঁরা নিজেদের কল্পনায় নানান জিনিসের বর্ণনা করতে লেগে গেলেন। আর সেটাই নাকি হিন্দু ধর্মের মূল হয়ে গেছে। অশিক্ষিতদের হাতে ধর্ম পড়লে এই হয়, অপরের গলা কাটা ছাড়া কিছু বোঝে না। আসলে হিন্দু ধর্ম এখানে বলতে চাইছে, ঠাকুর বলতে চাইছেন –শিব আর জীবে তত্ত্বের দিক থেকে কোন ভেদ নেই। বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, হাওড়া, কলকাতা পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে যাচ্ছে। জায়গা সব আলাদা আলাদা কিন্তু গঙ্গার জল সব জায়গায় এক। বেলুড়ের গঙ্গার জল আর কলকাতার গঙ্গার গঙ্গাজলে কোন ভেদ নেই। যেমনি গঙ্গা থেকে পাত্রে জল ভরলেন জল আলাদা হয়ে গেল –ঘটির জল, গ্লাশের জল, বোতলের জল সব আলাদা আলাদা হয়ে গেল; কিন্তু গঙ্গার জল এক। জলের দিক থেকে এক, কিন্তু পাত্রের দিক থেকে আলাদা।

যেমনি পাশ এসে গেল, রিপুগুলো এসে গেল, এরা একটা পাত্র তৈরী করে। রিপু মানে কি, রিপু একটা বন্ধন। আপনার মধ্যে জগতের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, আমার ভিতরেও জগতের প্রতি একটা আলাদা বিশেষ আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণগুলো আমার পাত্র, মানে 'আমি' শব্দটা যখন আমরা ব্যবহার করছি, এই 'আমি'টাই হল পাত্র। এই পাত্রের মধ্যে যে চৈতন্য, সে এই 'আমি'টাকেই পরিভাষিত করে –অবিদ্যা, অবিদ্যা তো সমান; কাম, কর্ম, কামনা-বাসনা, অষ্টপাশ, ষড়রিপু, এটাই হচ্ছে পাত্র। আমাতে আপনাতে কোথায় তফাৎ? পাত্রে। আমি যখন কাউকে বলছি, লোকটা খুব বদলোক, কিসের বদলোক; আসলে কিছুই না, ওর যে পাত্র ওটা একটু অন্য রকম। কিন্তু প্রত্যেকটি পাত্র, অবতার যিনি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ; এনাদের পাত্রটা মিথ্যা। কিন্তু এখানে থাকার জন্য এনাকেও অবলম্বন একটা করতে হবে। বাকিদের পাত্র পরিভাষিত হচ্ছে ষড়রিপু, অষ্টপাশাদিতে। এগুলো কি? জগতের প্রতি আপনার আকর্ষণ। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি –

মায়ের নিজের সন্তানকে নিয়ে যখন কথা বলেন, তখন মা বলবে, আমার ছেলে মিষ্টি খুব ভালবাসে; আর-একজন মা বলবে, আমার ছেলে পিৎজা খুব পছন্দ করে, অন্য কেউ বলবে, আমার ছেলে গেমস্ খেলতে খুব ভালবাসে বা বলবে আমার মেয়ে বই পড়তে খুব ভালবাসে। বাচ্চারা যেমন জগৎকে বিভিন্ন ভাবে নিয়ে থাকে, আপনি ওদের খেলনার দোকানে নিয়ে যান, দেখবেন বাচ্চা মেয়ে এক ধরণের খেলনা পছন্দ করছে, ছেলেগুলো প্রথমেই বন্দুক, পিস্তলের দিকে দেখাবে। ছেলেদের কেউ শিখিয়ে দেয়নি, কিন্তু প্রথমেই তুলবে বন্দুক, পিস্তলগুলো। মেয়েরা পুতুল আদি তুলবে। তাদের জগতের প্রতি যেমন আকর্ষণ, সেটা দিয়ে পরিভাষিত হচ্ছে তার 'আমি'। ঠিক তেমনি পৃথিবীতে যত জন আছে, জগতের প্রতি তাদের যে বিভিন্ন রকমের আকর্ষণ, সেটা দিয়ে পরিভাষিত হয় তাদের 'আমি'।

কিন্তু মূল জিনিস শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ আত্মা কক্ষণ পাল্টাবে না। একজনের উপর যত পাশ বাঁধা থাকুক, যত রিপুতে বাঁধা থাকুক; সব পাশ মিথ্যা। যেমনি বলবে, আমি আত্মজ্ঞান চাই, সেকেণ্ডের মধ্যে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এব্রাহিমিক কোন ধর্ম কি বলবে, আপনার এক সেকেণ্ডে জ্ঞান হবে? আর বলতে পারবে, এই জীবনেই সেই জ্ঞান হবে? কোন দিন বলতে পারবে না। সারা জীবন তুমি ঠিকঠাক থাক, মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক থাক, মৃত্যুর পর কবরে পড়ে থাক। তারপর যেদিন শেষ বিচার হবে, তখন তুমি হয় নরকে যাবে, নয়তো স্বর্গে যাবে।

হিন্দু ধর্মে এসব কিছু নেই, শুধু আছে –*ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই সব হবে, এক সেকেণ্ডে হবে। সেইজন্য হিন্দু ধর্মের সাথে অন্য কোন ধর্মের কখনই তুলনা হবে না, সম্ভবই না। লোকেরা ভুলভাল বলে, বলে ঠাকুর সমন্বয় করে গেছেন; ঠাকুর কোন সমন্বয় করেননি, প্রশ্নই নেই।

বলতে চাইছেন, তোমার পথ, ঠিক আছে তুমি তোমার পথে থাক। এতে দোষের কিছু নেই; কারণ তোমার স্রষ্টা ভগবান তুমি যে রকম সেই রকমই তিনি তোমাকে মন দিয়েছেন। তিনি যদি তোমাকে আরও জ্ঞান দিতে চান, তাহলে তোমাকে হিন্দু ধর্মে সৃষ্টি করবেন। জামসেদপুরে আমাদের এক মহারাজ মুসলমানদের ভালর জন্য একটা স্কুল খুললেন। তারপর যা হয়, চেঁচামেচি .শুরু হয়ে গেল। মুসলমানরা ওনাকে দোষারোপ করে বলতে লাগল, আপনি ধর্মান্তরণ করার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করছেন। মহারাজও সেই রকম, তিনি খুব রেগে গিয়ে বললেন –তোমাদের সেই কপাল নেই যে তোমরা কোন দিন হিন্দু হবে। ধর্মান্তরণে হিন্দু হয় না, জন্ম থেকে হিন্দু হয়। ঈশ্বর যদি চান, তিনি এই শিক্ষাটা দেবেন –তুইও যা আমিও তাই, তারপর আবার কোন জন্মে আপনাকে হিন্দু বানাবেন। ঠাকুর মতুয়া বুদ্ধির কথা বলতে চাইছেন, 'আমি ঠিক' এটা বলো না। তিনি কাকে কোন পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কি পথ দিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা কি করে বলব। আমার মত লোকের পক্ষে বলার কোন প্রশ্নই নেই, ঠাকুরকে কোন রকমে ধরে পচা কাঠের মত আমি নিজে কোন রকমে ভেসে যাচ্ছি; আমাদের তো বলার কোন অধিকারই নেই। ঠাকুর ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলছেন না। আমাদেরকেই আবার লেকচার মেরে বলবে, কেন স্বামীজী চিকাগো ধর্ম সম্মেলনে এই কথা বলেছেন। কাউকে আপনি যখন কিছু বলবেন, পুরো জিনিসটা পড়ে জেনে নিয়ে তারপর বলুন। বলতে চাইছেন অন্য ধর্ম যেমন বলে, আমি সত্য, তুমি ভুল, ঠাকুর সেটা বলছেন না; বলতে চাইছেন তুমিও সত্য, তোমার মত সত্য। আর তোমার সাথে আমার কোন ঝগড়া নেই, এটার জন্য আমি তোমার গলা কাটতে যাচ্ছি না।

সেখান থেকে ঠাকুর বলছেন –**ভগবানের প্রেম –দুর্লভ জিনিস**। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের মঠ-মিশনের মহারাজরা ভক্তির উপর অনেক লেকচার দেন, ভক্তির উপর আমাদের প্রচুর বই আছে। আমারও নারদীয় ভক্তিসূত্র ও ভাগবতের উপর লেকচার ও অনুলিখন আছে; কিন্তু আমরা জানি, সন্ন্যাসী মানেই আমরা জ্ঞানপথের পথিক, আমরা উপনিষদের পথের পথিক। প্রকৃত ভক্তি বলতে বোঝায় প্রেম, ওই প্রেম জীবের পক্ষে হওয়া খুব মুশকিল। আমাদের প্রেম হল, জ্ঞানপথে গিয়ে যে প্রেম হয়, সেই প্রেম। এই জিনিসটাকেই গীতাতে ভগবান বলছেন –*জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্,* জ্ঞানী আমার আত্মা, জ্ঞানী আমার বিশেষ প্রেমিক। কিন্তু প্রেম, ঠাকুর যেটা এখানে বলছেন, যে যতই লেকচার দিন, খুব কঠিন জিনিস। ভগবানের প্রেমের কথা বলা হচ্ছে; প্রেম এত intense হয়, ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। মীরাবাঈএর কিছু কিছু কাহিনী অনেকেই শুনে থাকবেন, মীরার কিছু কিছু ভজনও শুনে থাকবেন, অতি সাধারণ মনে হবে, কিন্তু এত গভীর প্রেমের কথা যে এগুলো বোঝান যাবে না, সম্ভব না। ভাগবতে গোপীদের যে বর্ণনা আছে, বর্ণনা করছেন যেন অনেক নিচে নেমে এসেছেন। পরে পরে বিশেষ করে বাংলায়, রাধাকে নিয়ে কিছু কিছু যে গল্প তৈরী হয়েছে, ঠাকুরও অনেক জায়গায় সেই কাহিনী থেকে অনেক কিছু বলেছেন, সেখানে খুব হাল্কা একটু ছবি পাওয়া যায়। প্রেম জিনিসটা, যেটা ইষ্টের প্রতি; শুধু যে এটা অসম্ভব তাই না, শরীর-মনকে দুমড়ে-মুচড়ে বেরিয়ে যাবে। জিনিসটা কি রকম সেটাই এবার ঠাকুর বলছেন।

প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তি হয়। এই জিনিসগুলো আপনারা আমার থেকে ভাল বুঝবেন, এই ব্যাপারে আমার কোন আইডিয়া নেই। এইসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান খবরের কাগজের খবরে। আর খবরে আজকাল যে-সব খবর নজরে পড়ে, দেখে খুব একটা সুবিধার বলে মনে হয় না। প্রথম রাতেই গলা কেটে দিচ্ছে, অনেকে আবার বিয়ে হওয়ার আগেই পালিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর যখনকার কথা বলছেন, তখন নিষ্ঠা ছিল; এখনও নিশ্চয় আছে, ভাল লোক আছে বলেই তো সমাজটা এখনও টিকে আছে, তা নাহলে কবেই সব কিছু ভেসে যেত।

একটা কথা বলছি, শুনে আপনাদের হয়ত ভাল লাগবে না, কিন্তু সত্য। বাঁধন ছাড়া সমাজ চলে না, সমাজ মানেই বন্ধন। আজকে ভারতীয় সমাজের যে সামাজিক নিয়মগুলিকে লোকেরা গালাগাল দিচ্ছে, এগুলোই এক সময় ছিল সমাজের বন্ধন, যে বন্ধন সমাজে একটা স্থিতিশীলতা, শান্তি বজায়

রেখেছিল। তবে যে কোন সামাজিক নিয়ম চিরস্থায়ী হতে পারে না, সমাজের কোন নিয়ম চিরদিন ভাল থাকতে পারেনা। নিয়ম সময়ের সাথে সাথে পাল্টাতে হয়। পাল্টাতে গিয়ে দেখা যায় যে, সমাজে আরও বেশি গোলমাল শুরু হয়, অনেক ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয়। আমাদের যেমন জাতিপ্রথা ছিল, হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছিল। জাতিপ্রথা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল, বাধ্য হয়ে পাল্টে দিতে হল। জাতিপ্রথা তুলে দিয়ে কি ভাল কিছু এসে গেছে? কিছু দিন থাকুন, দেখুন কি হয়।

প্রথমের দিকে যে বিবাহ হত, একটা বাচ্চা মেয়ে সবে সে শিখতে শুরু করেছে, কিছু দিন পরে তার বিয়ে হবে, শ্বশুড় বাড়ি চলে যাবে; সেখানে গিয়ে তার শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, ননদ, দেওর সবার সাথে একটা ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী করতে হবে; প্রেমে ঠিক এই জিনিসটা হয়। স্বামীকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসছে, নিজের শরীর যেটা তার এত প্রিয়, সেই শরীর দিয়ে দিচ্ছে আর তার সাথে পরিবারের যাঁরা আছেন সবাইকে সে ভালবাসছে। আর তাই না, শাশুড়ি, ননদ মিলে তার উপর যে ধরণের অত্যাচার হয়, সাধারণ ভাবে আমরা যে কাহিনীগুলি শুনতে পাই, সব অত্যাচার সহ্য করে শুধু মাত্র তার স্বামীকে ভালবাসছে বলে। শুনতে হয়ত আপনাদের একেবারেই ভাল লাগবে না –জেনে নিন যেখানে শাশুড়ি বউমার ঝগড়া হয়, জানবেন সেখানে বউমার ভালবাসায় কোথাও একটা গোলমাল আছে। তবে ইদানিং বিয়ে অনেক বয়সে হয়, ফলে মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা সম্ভব না। আগেকার দিনে বারো কি চোদ্দ বছরে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, ওই বয়সে সে শাশুড়িকে নিজের মা বলেই মনে করত, তাঁরাও বউমাকে নিজের মেয়ের মত দেখতেন। এর মধ্যে দজ্জাল শাশুড়িও ছিল, ভালমন্দ সব কালেই থাকে, কিন্তু এখন তো প্রশ্নই নেই।

এখন যত বিয়ে হচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা এত strong individuality নিয়ে আসে যে, সে শাশুড়িকে গ্রাহ্যই করে না। বর্তমান কালে বেশির ভাগ মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গী হল –তুমি তোমার মত থাক, আমি আমার স্বামীকে নিয়ে থাকি। আর এখন বিয়ে কিসের, সবই তো পার্টনারশিপের ব্যাপার হয়ে গেছে। এরা বুঝবে ভক্তি! এরা বুঝবে ভগবানের প্রেম! এদের কাছে তাই পপুলার হল অদ্বৈত। চোখ বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে ধ্যান করছে, বাইরেও অন্ধকার, ভিতরেও অন্ধকার। এটাই এদের বেদান্ত –বাইরেও অন্ধকার ভিতরেও অন্ধকার। কিন্তু শুধু ভক্তি যেখানে, শুধু প্রেম যেখানে, সেখানে শুধু ইষ্টকে প্রেম করে না; ইষ্টের সঙ্গে যাবতীয় যা কিছু জড়িয়ে আছে, সবাইকে প্রেম করে।

আমরা এই ভাবে ভেবে দেখতে পারি –স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ সন্ন্যাসী ছিলেন, শ্রীশ্রীমাকে ভালবাসতেন। মায়ের যত সম্বন্ধীরা ছিল, তিনি জানতেন সবাই গোলমেলে, সবাই টাকা টাকা করে, তাদেরকেও তিনি ভালবাসতেন। সাধারণ অবস্থায় স্বামীজীর মত মানুষ মায়ের ভাইদের সাথে কথাও বলতেন না, তাও তিনি কথা বলছেন শুধু মায়ের জন্য –এটাই হল মায়ের প্রতি ভক্তি। জ্ঞানমার্গী সাধু এই জিনিস করবেন না। আর আমার কাছে এসে একটু ট্যাঁ ফোঁ করলে আমি সোজা বলে দেব, চলুন চলুন, এখানে এসব চলবে না। ঠাকুরের ভক্ত হলেই বলতে হবে, আসুন আসুন, বসুন, কেমন আছেন, আপনার নাতনি কেমন আছে –আমার কাছে এই ধরণের আপ্যায়ন চলবে না, আমি পারবই না; জ্ঞানমার্গী আমরা, আমরা কেটে বাদ দিতে জানি। সন্ন্যাসীরা কেটে বাদ দিতে জানে, কারণ তিনি বাপ-মায়ের মায়া ত্যাগ করে দিয়েছেন, সংসারের মায়া ত্যাগ করে দিয়েছেন, তিনি আপনার মায়ায় কি করে পড়বেন। নাম করছি না, আজকাল কিছু কিছু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন অদ্বৈতকে গালাগাল দেয়, আচার্য শঙ্করকে গালাগাল দেয়, পরিষ্কার বোঝা যায় আর যাই হয়ে থাকুক ভক্তি এদের হয়নি। কৃষ্ণকে যিনি ভক্তি করবেন, তিনি তো সবাইকে ভালবাসবেন; চৈতন্য মহাপ্রভু সবাইকে ভালবাসতেন। যিনি ঠিক ঠিক ভক্ত, তিনি সবাইকে ভালবাসবেন, শত্রুকেও। সত্যিকারের ভক্ত শত্রু মিত্রের তফাৎ দেখেন না।

কিন্তু এখানে ঠাকুর যেটা বলছেন, ভগবানের প্রেম দুর্লভ জিনিস, এটা প্রেমাভক্তির গভীরতা নিয়ে বলছেন। আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, নিশ্চয় আপনাদের অনেকের বয়স হয়েছে, জীবনে

কখন না কখন আপনি কাউকে নিশ্চয় ভালবেসেছেন। এটাও আমি ধরে নিচ্ছি, ঠাকুরের সময়ে পরকীয়া প্রেম বর্তমান কালের মত এত জলভাত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু স্বামীকে বা স্ত্রীকে নিশ্চয় ভালবাসতেন। যদি কাউকে সত্যিকারের ভালবেসে থাকেন, নিজের সন্তান হোক, স্বামী বা স্ত্রী হোক, স্কুল কলেজের কোন বন্ধু হোক; আপনারা বুঝতে পারবেন ভালবাসার তীব্রতা কি জিনিস। ওই ভালবাসার তীব্রতাকে যদি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সারাটা জীবনের জন্য করে দেন, তখন বুঝতে পারবেন ভক্তি জিনিসটা কেমন হয়। ওই প্রেমে কি বলছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, কোন হুঁশ নেই। প্রেমের তীব্রতা এমন হবে যে আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমিত্ব বলে কিছু থাকবে না, কিসের পাশ, কিসের রিপু, কোথায় সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। সেদিক থেকে জ্ঞানমার্গ অনেক কঠিন। জ্ঞানমার্গ হল, আপনার সামনে শত্রুরা দাঁড়িয়ে আছে, এক এক করে আপনি তাদের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছেন; ভক্তি হল, এমন জোর ঝড় উঠবে সব ঝোপঝাড় উপড়ে ফেলে দেবে।

ঠাকুর নিষ্ঠার কথা বলছেন, কি রকম নিষ্ঠা? **প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা; এই রকম নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে যদি হয় তবেই ভক্তি হয়। বলছেন, শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়**। খ্রীষ্টান পরম্পরাতে ভক্তি খুব জোরালো পরম্পরা ছিল। ইসলামেতেও বিশেষ করে সুফি সম্প্রাদায়ের পরম্পরাতে খুব জোরালো। এই রকম ভক্তি হওয়ার পরে, যেখানে পুরো ঈশ্বরেতে ডুবে গেলেন সেখানে আর বৈধী ভক্তি বলে আর কিছু থাকে না। বৈধী ভক্ত হল, যেখানে আমি সকাল-বিকাল বিধিপূর্বক জপ করছি, বিধিপূর্বক পূজা করছি, অর্চনা করছি। এগুলো হল অনুশীলন, এই অনুশীলন করতে করতে একটা নিষ্ঠা জন্মায়, নিষ্ঠা থেকে ভালবাসা জন্মায়। এই বিধিপূর্বক পূজা-অর্চনা করা ছাড়া আপনি থাকতে পারবেন না, বাঁচতে পারবেন না।

তারপর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়। তার মানে স্বামীর প্রতি যে নিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে, এই নিষ্ঠাটা হল প্রথম অবস্থা। এরপর হয় ভাব। ভাব কিছুটা বলতে পারেন তাক লেগে যাওয়া, গোপীদের যেটা হত। কোন দিকে আর হুঁশ নেই। **বায়ু স্থির হয়ে যায়**। বায়ু স্থির হয়ে যাওয়া মানে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, কথা বন্ধ হয়ে যাবে, শরীর নিঃস্পন্দ হয়ে যাবে।

আপনি কুম্ভক হয়। কুম্ভক দুই প্রকার –বাইরে নিঃশ্বাস আটকানো আর ভিতরে নিঃশ্বাস আটকানো। আমরা সবার জীবনেই দেখে থাকি –কোন ক্রিকেট ম্যাচ দেখছি, খুব উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি, বা কোন সিনেমায় এমন একটা কিছু উত্তেজনাময় দৃশ্য দেখছি, তখন নিজে থেকেই নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। ঠাকুর একটা অন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন –**যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাকশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়**। ঠাকুর কোন দিন গুলি চালাননি, কি করে জানলেন ভগবান জানেন। গুলি চালাবার সময় বাস্তবিক নিঃশ্বাস বন্ধ করে চালায়, তীর চালাবার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে চালায়। আমি দেখেছি, আমি যখন লেখালেখি করি তখন ভাল কিছু লেখার সময় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। স্পোর্টস আদিতে যাঁরা অংশ নেয়, তাঁরাও দৌড় শুরু করার আগে, বা জাম্প দেওয়ার আগে নিঃশ্বাসকে ধরে নেয়। কুম্ভক ছাড়া কোন বড় কাজ হয় না। জপধ্যানও কুম্ভক ছাড়া হয় না। এখানে আমাদের এটা বিষয় নয় বলে বেশি কিছু বলে লাভ নেই। কিন্তু আপনি যদি ধ্যান করেন, আপনার কুম্ভক হতে বাধ্য; কুম্ভক না হওয়া পর্যন্ত ধ্যান হবে না। থেকে থেকে নিঃশ্বাস আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা; চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস –তাও ভুল হয়ে যায়।

ধর্মের ইতিহাসে ঋষি-মুনিদের জীবনে এই জিনিসগুলোর কথা আমরা অনেক শুনেছি, ওনাদের নিয়ে বিভিন্ন রচনাগুলিতেও এই জিনিসগুলি আমরা দেখেছি। কিন্তু প্রেম বলতে রাধা, রাধার যে প্রেম, এই প্রেম সম্বন্ধে ধারণা করা আমাদের চিন্তা ও কল্পনার বাইরে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রাধার নাম

মহাভারতে নেই, ভাগবতে নেই, কোন প্রাচীন গ্রন্থে নেই। কে রাধার নাম আনলেন, কিভাবে আনলেন, বলা খুব মুশকিল; এখনও প্রচুর গবেষণা চলছে। আজ কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা, রাধাকৃষ্ণ ভারতের আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে বসে গেছেন। মহাবীর হনুমানের ভক্তিকে আমরা দাসভক্তির পরাকাষ্ঠা বলি, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও এই দাসভক্তির উপর কোন কথা আমরা সেভাবে পাই না। তাহলে কি এগুলো মিথ্যা? কেন মিথ্যা হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাগুলি যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি এর কোনটাই মিথ্যা না, এগুলো আমাদের কাছে কাব্য। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে ভাবজগৎ হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাগুলি যেমন কাব্যজগৎ, সাহিত্যের জগৎ। ভাবজগৎ হল, ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে ভাবটাকে নিয়ে ভক্ত বা সাধক তাঁর জীবনকে চালান। এই ভাবজগৎ থেকেই এলেন রাধা, রাধা মানেই প্রেম। বর্তমান কালে আমরা যখন প্রেমের উদাহরণ দিই, সেখানে তখন আসবেন শুধু রাধা। **এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতেছেন –সেদিন কবে বা হবে? হরি বলতে ধারা বেয়ে পড়বে**।

আমরা শুরু করেছিলাম –পাশবদ্ধ পাশমুক্ত এই কথা দিয়ে। একটুও যদি আঁশ থাকে, অর্থাৎ অষ্টপাশের কোন একটা পাশ যদি থাকে; সে কিন্তু প্রেম করতে পারবে না। প্রেম করার জন্য উপনিষদে যেমন বলছেন, *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, শুদ্ধ জলের সঙ্গে যখন শুদ্ধ জল মিশিয়ে দেওয়া হল তখন দুটো জল মিলে এক হয়ে যায়, ঠিক তেমনি প্রেমে জীব আর শিব মিলে এক হয়ে যায়। রাধা আর কৃষ্ণকে যে আমরা এক দেখি, এটাই আমাদের আদর্শ, জীব সমস্ত ধরণের পাশ থেকে মুক্ত হয়ে, শিবের সঙ্গে এক হয়ে যায়। পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ; এরপর মহাবায়ু উঠলে ভগবানদর্শন কিভাবে হয়, সেটাকে নিয়ে ঠাকুর আলোচনা করবেন, একই জিনিস চলছে। ঠাকুর এত কিছু বলেছেন যে, ধর্মজগতের ইতিহাসে যার কোন তুলনাই হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাব ও কুম্ভক –মহাবায়ু উঠিলে ভগবানদর্শন

২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩ সালের ওই দিনের বর্ণনা চলছে (পৃঃ ৩০১)। মাস্টারমশাই বলছেন – **এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে**। এই দিনে আগের পরিচ্ছেদগুলিতে অনেকগুলো কথা হয়ে গেছে, খুব সুন্দর কথা, যেগুলো আমরা এর আগে আলোচনা করলাম। মাস্টারমশাই বলছেন –**এমন সময় নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন**। তখনকার দিনে লোকজনদের সময় ছিল, মানুষের তখন আজকের মত এত diversion ছিল না, তাঁরাও তাই এই ধরণের সভা-সমিতির আলোচনায় উপস্থিত হতেন। এখন সবাই যে যার নিজের ফোনের মধ্যে ডুবে থাকে। বড় বড় মিটিংএও দেখি সবাই নিজের ফোন নিয়ে ব্যস্ত। **তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনীনাথ রায়**।

প্রথমে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব, তার মধ্যে বেশ কিছু বিষয় বুঝতে কঠিন মনে হবে, কিন্তু তারপরের বিষয়গুলো খুব সহজ হয়ে যায়। **ঠাকুর বলিতেছেন, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়**। এখানে ঠাকুর প্রাণবায়ুর কথা বলছেন। আমাদের শরীরের ভিতর পাঁচ ধরণের প্রাণের ক্রিয়া চলে – প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান; এই পাঁচ প্রকার প্রাণ আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকমের কাজ করে।

যাঁরা এই পঞ্চপ্রাণ নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা বলেন, আমাদের প্রাণবায়ুর ব্যালেন্স যখন বিগড়ে যায় তখন শরীরে নানা রকমের ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। আবার প্রাণবায়ুর চাঞ্চল্য হলে মনও চঞ্চল হয়। প্রাণবায়ুকে স্থির করার অনেকগুলো বিধি আছে। যাদের মাথা গরম, বুঝবেন প্রাণ তাদের এলেমেলো হয়ে আছে। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য মাথায় বিভিন্ন ধরণের তেল মাখার কথা বলা হয়। আপনারা নিশ্চয় শুনে থাকবেন, মাথায় ভৃঙ্গিরাজ তেল লাগালে নাকি মাথা ঠাণ্ডা হয়। শরীর খারাপের ক্ষেত্রেও বলা হয়, প্রাণবায়ু কোন কারণে এলেমেলো হয়ে গেছে। অনেকেই হয়ত আমাদের এই আলোচনার সাথে একমত হবেন না, তবে এটাই আমাদের পরম্পরা বিদ্যা। ধরুন আমাকে একটা পিঁপড়ে কামড়ালো। কয়েকদিন

আগেই আমার জামার ভিতর কি করে একটা মৌমাছি ঢুকে গিয়েছিল, এমন কামড়ালো যে সেখান থেকে জ্বরটর হয়ে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলবে, মৌমাছি বা পিঁপড়ের কামড়ে শরীরে যে বিষ ঢুকেছে, তার জন্য শরীরের যে নিজের সিস্টেম আছে, যেখানে অনেক কিছু আছে, যেমন বলে RBC, WBC, Anti-body, সব ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। আমরা বলি, শরীরের ওই জায়গাটা এলেমেলো হয়েছে বলে শরীর নিজের প্রাণশক্তিকে টেনে সারানোর জন্য ওখানে প্রাণিক এনার্জি পাঠাতে থাকে। আমরা যে ওষুধ খাই, এই ওষুধও প্রাণকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে, এটা হল চিকিৎসকদের মত। এখন তো প্রাণিক হিলিং আরও কত কিছু এসে গেছে। এই প্রাণশক্তি আমাদের মধ্যে বায়ুর মাধ্যমে, অর্থাৎ আমরা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, সেখান থেকে আসে। নিঃশ্বাস বেশিক্ষণ বন্ধ রাখা যায় না। যাঁরা যোগী, তাঁরা নিঃশ্বাস না নিয়েও প্রাণশক্তিকে ক্রিয়াশীল রাখতে পারেন।

প্রাণ হল সেই শক্তি, যে শক্তি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে চালিত করছে। আমরা সাধারণ ভাবে যে 'এনার্জি' শব্দ ব্যবহার করছি, শাস্ত্রে এটাকেই প্রাণ বলা হয়। ফলে কি হয়, ভিতরে বিভিন্ন রকমের বায়ু যে কাজ করছে, যোগীরা নিজের মত বায়ুকে পরিচালিত করতে পারেন, কখন তাঁদের বায়ু স্থির হয়ে যায়। এমনিতে সাধারণ অবস্থাতেও দেখে থাকবেন, কখন কোন শোক বা বেদনা যদি খুব তীব্র হয়, যেখানে আপনি কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না, কে যেন আপনাকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে। আসলে বায়ুর সমস্ত কাজ তখন কিছু স্থির হয়ে যায়। অথবা কোন গভীর কিছু করছেন, মন স্থির হয়ে যায়। ওই স্থির অবস্থায় যদি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেখতে পাবেন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকে। রেগে গেলে অন্য রকম হয়, রাগান্বিত অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলে, তার মানে প্রাণকে বেশি টানছে। খুব উচ্চমানের কাজ যাঁরা করেন, বিশেষ করে যাঁরা শিল্পী, তাঁরা যখন কোন সৃজনশীল কাজের মধ্যে পুরো ডুবে যান, তখনও তাঁদের বায়ু স্থির হয়ে যায়।

বায়ু স্থির দু-ভাবে হয় –নিঃশ্বাস ভিতরে নিয়ে নিঃশ্বাসকে বাইরে ফেলে দিয়ে দম বন্ধ করে দেওয়া। অনেক সময় কোন সিনেমার একটা খুব উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য দেখছেন, ক্রিকেট খেলার খুব টানটান উত্তেজনা অবস্থায় দম বন্ধ হয়ে যায়। দম বন্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য প্রাণশক্তি কেন্দ্রিত হয়। জপধ্যানের ক্ষেত্রে বলা হয়, জপধ্যান শুরু করার আগে একটু প্রাণায়াম করে নিতে। আপনারাও করতে পারেন। বেশি কিছু করতে হবে না, মেরুদণ্ড সোজা হয়ে বসবেন, চোখ বন্ধ করুন, দশ সেকেণ্ড ধরে ভিতরে নিঃশ্বাস নিতে থাকুন আবার দশ সেকেণ্ড ধরে বাইরে নিঃশ্বাসটা ফেলুন। পাঁচ থেকে দশবার যদি এইভাবে করেন, এতেই দেখবেন মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাবে; এর বেশি কিছু করতে হবে না। হঠযোগে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনেক রকম প্রক্রিয়া শেখানো হয়।

এক সময় আমি উত্তরকাশীতে ছিলাম, তখন সবে আমার সন্ন্যাস হয়েছিল। সেখানে সেই সময় একজন যোগী ছিলেন, তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। বিদ্যাটা আমার জানা আছে, কিন্তু কোন দিন অনুশীলন করেনি, প্রয়োজন বোধ করিনি। ঠাকুরও এখানে হঠযোগ, রাজযোগ নিয়ে বলছেন না। আগের পরিচ্ছেদে ঠাকুর ভাব নিয়ে বলেছেন। কোন কিছুকে যদি খুব ভালবাসছেন, সাধারণ ভালবাসা না, মা সন্তানের যে ভালবাসা, এর থেকে যখন আরও উপরে যায়, সেই ভালবাসার কথা বলছি। কাউকে আপনি অনেকদিন ধরে ভালবাসছেন, তিনি কোন সুলেখক হতে পারেন বা কোন ক্রিকেটস্টার বা সিনেমাস্টার হতে পারেন। কোন ভাবে আপনার একটা সুযোগ হয়ে গেল তাঁকে দেখার বা তাঁর সাথে কথা বলার। তখন দেখবেন, তাঁকে দেখে আপনি কেমন স্থির হয়ে গেছেন। ঈশ্বরে যদি ভক্তি হয়, ভাব যদি হয়; তার মানে ঈশ্বরের দিকে মন কেমন স্থির হয়ে যায়, বায়ু স্তব্ধ হয়ে যায়। কি রকম স্থির হয়ে যায়? ছোটবেলায় যদি আপনারা কোন দৌড় প্রতিযোগিতায় বা লং জাম্পে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তখন হয়ত দেখে থাকবেন, যেমনি লাইনে হুইসেল বাজার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন, সেই মুহূর্তে নিজেকে কেমন গুটিয়ে দম বন্ধ অবস্থা হয়ে যায়। হুইসেল বাজল আর সাঁ করে বেরিয়ে

গেলেন। যাঁরা গুলি চালান, তীর চালান সবারই একই রকম অবস্থা হয়। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে করতে দম বন্ধ হয়ে আসে।

জপধ্যান সাধারণ ভাবে গুরু যেমনটি বলে দিয়েছেন, সেইভাবেই করতে হয়। আমার ব্যাখ্যা করা কাজ তাই ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি, কিন্তু গুরু যেমন যেমন বলে দিয়েছেন সেইভাবেই করতে হবে। দেখবেন অনেকক্ষণ জপধ্যান করার পর, এই যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে এটাকে আপনার বোঝা বলে মনে হবে, জ্বালাতন মনে হবে। সেইজন্য দেখবেন, ধ্যান যখন করছেন, বেশ কিছুক্ষণ ধ্যান করছেন আর অনেকদিন ধরে ধ্যান করে যাচ্ছেন, তখন দেখবেন নিঃশ্বাস যখন বাইরে বেরিয়ে বহির্কুম্ভক হয়ে যাচ্ছে, তখন যেন ধ্যানটা আপনার বেশি ভাল হচ্ছে মনে হবে। তবে জোর করে এগুলো করতে যাবেন না, ঝামেলায় পড়ে যাবেন। কুম্ভক বা বায়ু স্থির স্বাভাবিক হয়, হঠযোগে এগুলোকেই জোর করে করতে বলে। কোন জোর লাগে না, স্বাভাবিক হয়, নিজেই বায়ু স্থির হয়ে যায়। আমিও দেখেছি, যখন কোন উচ্চমানের সিরিয়াস লেখা লিখছি, দম স্বাভাবিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ঠাকুর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদের উদাহরণটা এখানে দিচ্ছেন। **অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিলেন, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল –আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়**। বায়ু যখন স্থির হয় তখনও এই সংসার থাকবে, সব কিছু থাকবে, কোন কিছু চলে যাবে না। আপনি এই ভাবে কল্পনা করতে পারেন, আপনার ছেলে ট্রেনে করে বাইরে থেকে বাড়ি আসছে। আপনি হাওড়া স্টেশনে তাকে রিসিভ করতে গেছেন। প্ল্যাটফরমে কত লোক ট্রেন থেকে নেমে এগিয়ে আসছে, এত লোকজনের মধ্যে আপনার চোখ শুধু একজনকে খুঁজে যাচ্ছে। যেমনি অত লোকজনের মধ্যে ছেলেকে দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার দৃষ্টি তখন সোজা ওর উপর সেঁটে যাবে। তখনও লোকজনের ভিড় এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখন আর কোন দিকে আপনার দৃষ্টি যাচ্ছে না, শুধু ছেলের উপর। ধ্যান জিনিসটা ঠিক তাই, সব কিছু আছে কিন্তু একটা জিনিসে মনটা স্থির হয়ে গেছে, তখন এই বায়ুটা স্থির হয়ে যায়। আর যদি খুব উচ্চ অবস্থা থাকে, যেখানে ঠাকুর ভাবের কথা বলছেন, সেখানে বায়ু পুরোপুরি স্থির হয়ে যায়। ঠাকুর অর্জুনের লক্ষ্যভেদের উদাহরণ দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু যে কোন কাজে এই অবস্থা হয়।

ঈশ্বরদর্শনের একটি লক্ষণ, –ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্‌গর্‌ করে উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।

কুণ্ডলিনী জাগরণ যখন হয়, তখন শরীরের ভিতর যত বায়ু আছে, প্রাণ, অপান আদি সমস্ত বায়ু উঠে উপরে দিকে চলে আসে। এই ব্যাপারটা আমার জানা নেই, বইয়ে আছে। অন্যান্য জায়গার এর বর্ণনা পাওয়াও যায় না। আন্দাজ করে একটু বুঝতে পারি কি হয়। কারণ যাঁদের হয় তাঁরা বলবেন না, ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য বলেছেন। আর কেউ যদি না বলেন, তাতে যদি আপনি মনে করেন তাঁর হয়নি, সেটাও বলা যাবে না। কারুর যদি এই সমাধি হয়ে থাকে উনি কেন সবাইকে বলতে যাবেন; বড়লোক তাঁর কত টাকা আছে কেন সবাইকে বলতে যাবেন।

আমাকে একজন লিখছেন, তিনি কোথায় একটা শিখে এসেছেন যে, যোগদর্শনে সমাধি হয়। নূতন নূতন সব গুরু দাঁড়িয়ে গেছে। আমি তাকে বললাম, যোগদর্শনে সমাধি অনেক রকমের –বিতর্ক, বিচার, আনন্দ, অস্মিতা ইত্যাদি। ঠাকুর এখানে পরিষ্কার বলছেন, মহাবায়ু যখন গর্‌গর্‌ করে উঠে মাথার দিকে যায়, তখন যদি সমাধি হয়, তখন ঈশ্বরদর্শন হয়। আমার এই কথায় আর-একজন বলল, অমুক বাবাজী এই এই করে সমাধি লাভ করেছেন, ওসো এই এই করেছেন। আমি এদের নামও কোন দিন শুনিনি, আমি কি করে জানব সে কি করেছে, আর এসবের খোঁজ করাটাও আমার কাজ নয়। শৈশব থেকে হিন্দু সংস্কারে আমি বড় হয়েছি, দেখেছি, শুনেছি, বই সামনে আছে, তার ভাষ্য সামনে আছে; এরপর অমুক কি বলল, তমুক কি করল, এত কিছু আমার জানার কি দরকার। তার ভিতরে যে

আশা, ইচ্ছা, আকাঙ্খা, তার যে বেদনা, ব্যাথা, সব কিছু মিলিয়ে তাকে আজ এইভাবে প্ররোচিত করছে। যারা এই ধরণের কথা বলে বেশির ভাগেরই ভিতরে বেদনা, ব্যাথা আছে বলেই বলছে। আবার কোথায় শুনেছে সমাধিতে নাকি জ্ঞান হয় না। যাই হোক ঠাকুর আবার ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন।

(অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে) –যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে। একটা হাসির কথা বলি, এগুলোকে সিরিয়াসলি নেবেন না। অনেক আগকার কথা; একজন মহারাজ ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুডের উপর একটা কি বই লিখেছিলেন। তিনি বইটা নিয়ে তখনকার দিনের খুব নামকরা মহারাজ স্বামী অভয়ানন্দ, ভরত মহারাজকে গিয়ে বইটা দেখালেন। মহারাজের বলার একটা নিজস্ব স্টাইল ছিল, তিনি বইটা হাতে নিয়ে খুব সহজ ভাবে বলছেন –যার সঙ্গে কেউ টিকতে পারল না, সে কিনা লিখছে ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড নিয়ে বই। যে কোন দিন ধ্যান করল না, সে নাকি ধ্যান শেখাচ্ছেন। নিজে কোন দিন জপধ্যান করলেন না, তিনি ধ্যানের উপর বই লিখছেন। আমাদের এখানে এই ধরণের অনেক কিছু আমাদের face করতে হয়। ইন্টেলেকচুয়ালরা এসে বলবে ভগবান বলে কিছু নেই, এমন সব কথা বলবে যে আপনার মনে সংশয় এসে যাবে। একজন লিখল, মানুষ এখন চাঁদে চলে গেল, এখনও মনুস্মৃতি? আমি তাকে লিখলাম, মানুষ এখন চাঁদে চলে গেল, এখনও তুমি খাওয়া-দাওয়া করছ? ইন্টেলেকচুয়াল মানে কোন ইন্টেলিজেন্স এদের থাকে না। ইন্টেলেকচুয়াল মানে, যখন আপনি ইন্টেলিজেন্সকে বাদ দিয়ে দেবেন, তখন আপনি হলেন ইন্টেলেকচুয়াল।

অনেক সন্ন্যাসীদেরও দেখেছি, একটা দুটো বই পড়ে নিজের মত চিন্তা-ভাবনা করে কিছু একটা লিখে দিলেন। ঈশোপনিষদে আছে *মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্*, লোভ করো না, এটাকেই একজন মায়ের উপাসনার কথা লিখছেন। একজন বলছেন, গড ইজ এনার্জি, আর-একজন বলছেন, গড ইজ ইক্যুয়েশান। দুটো বই পড়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজের মত করে বলতে গিয়ে উল্টো করে দিচ্ছেন।

এখানে দুটো কথা বলা দরকার, আগে বলেছি ঠিকই, তাও আবার ব্যাখ্যা করি। যে কোন বিদ্যাকে অপরা বিদ্যা বলা হয়, এমনকি বেদ উপনিষদের যে জ্ঞান, এটাও অপরা বিদ্যার মধ্যে পড়ে। অপরা বিদ্যা সেটাই যে বিদ্যাকে মন দিয়ে গ্রহণ করে নেওয়া যায়। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বেদ, উপনিষদ সব অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হল, যে বিদ্যা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে। ঠাকুর এখানে যে কথাগুলো বলছেন, এটা পরা বিদ্যা। কথামৃত নিজে অপরা বিদ্যা, কিন্তু কথামৃত যেটা বলতে চাইছেন সেটা পরা বিদ্যা। বেদ নিজে অপরা বিদ্যা, কিন্তু বেদ যে জায়গায় আমাদের নিয়ে যেতে চাইছেন, সেটা পরা বিদ্যা। তফাৎ হল, অপরা বিদ্যা একজন শিখিয়ে দিতে পারা যায় এবং আপনিও শিখে নিতে পারেন। শিখে নেওয়ার পর বারবার ওখানে যেতে হয় না। কিন্তু যেটা পরাবিদ্যা, ওটার জন্য আপনার যে ব্যক্তিত্ব, তাকে তাঁর অনুরূপ করতে হয়।

সত্য কথা বলিবে –এটা অপরা বিদ্যা। বাচ্চা বয়সে শিখে নিলেন, হয়ে গেল, টিয়া পাখির মত আপনি এখন বলতে পারেন। কিন্তু যেদিন আপনি এটাকে পরা বিদ্যা রূপে নেবেন, ঠাকুর যেমন বলছেন, সত্য কথাতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; তখন আপনার পুরো যে সিস্টেম, শরীর, মনকে অস্ত্রের মত করে সত্যের সঙ্গে এক করে দিতে হবে, এই এক করাটা আপনার সাধনা দিয়ে হবে। যত আপনি এই সাধনা করবেন, তত আপনার শরীর মন অন্য রকম হয়ে যাবে; আর জ্ঞানের প্রতি এগোচ্ছি, এই ভাব এসে যাবে। যেমন যেমন আপনি জ্ঞানের প্রতি এগোবেন, তেমন তেমন সেই একই শিক্ষা আপনি পাবেন। যেমন ধরুন, আপনারা যাঁরা বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, সবারই সেই একই মন্ত্র। মন্ত্রের অর্থটাও আপনার জানা আছে, কারণ গুরু বলে দিয়েছেন। জপ করছেন, জপ করছেন, অনেকদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন, মন্ত্রের অর্থ আরও স্পষ্ট হতে থাকবে। করতে করতে একদিন যখন মন্ত্রের অর্থের সাথে আপনি নিজে এক হয়ে গেলেন; তখন আর মন্ত্র জপ করলেও যা, না করলেও কিছু হবে না। তখন পূজার কোশাকুশি, আসন, জপের মালা সব ত্যাগ হয়ে যাবে। কারণ ওই সত্যের সঙ্গে আপনি এখন এক হয়ে গেছেন।

সাধারণ ভাবে ঈশ্বরদর্শন বলতে মনে করি, ঈশ্বর এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন, আমি দেখলাম, দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। ঈশ্বরদর্শন তা নয়। ঈশ্বরদর্শনের হল, ঈশ্বরময় হয়ে যাওয়া। রসগোল্লা তৈরী করার আগে ছানা তৈরী করতে হয়, সেই ছানাকে আরও অনেক কিছু করার পর রসে ছেড়ে দেওয়া হয়, নামই সেইজন্য রসগোল্লা, সে তখন রসময় হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র জপ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে যাওয়া, এটাই মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য, এটাই ঈশ্বরদর্শন। এই ভাবেই মীরাবাঈ কৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। তুলসীদাস বলছেন –সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু। অথচ আমাদের কি ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি –জাদু খেলার মত ঠাকুর আমার সামনে এসে যাবেন, শ্রীকৃষ্ণ এসে বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন; আর মনে করছি ঈশ্বরদর্শনে এই ধরণেরই কিছু হয়। একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। ঠাকুর যে মা কালীর দর্শনে পেলেন, সেখানে তাঁর পুরো শরীর মন কালীময় হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান একমাত্র তখনই হয়।

শুনলাম খবর কাগজে নাকি একটা খবর বের হয়েছিল, কোন এক মুর্খ নাকি ঠাকুরকে নকল করে সাধনা করছিল। মা কালীর দর্শন হচ্ছিল না বলে, ঠাকুরের মত খড়্গটা হাতে তুলে নিয়ে ভাবল এবার হয়ত মা কালীর দর্শন হবে; তাও যখন হচ্ছিল না, তখন নিজের গলাটা কেটে দিল। গলাটা কেটে দিয়ে কি হল? মরে গেল। হঠাৎ যদি আপনার মাথায় ভূত চাপে –ঠাকুরের দর্শন যদি না হয়, তাহলে এই দেখ আমার হাতে ছুরি আমি আমার বুকে বসিয়ে দেব। কি হবে তাতে, আপনার শরীরে ছুরি বসে রক্তক্ষরণ হয়ে আপনি মারা যাবেন। উদ্দেশ্য দর্শন নয়, উদ্দেশ্য হল যিনি ইষ্ট, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। শিবের ভক্ত শিবময় হয়ে যাবে, কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণময় হয়ে যাবে, রামের ভক্ত রামময় হয়ে যাবে, ঠাকুরের ভক্ত রামকৃষ্ণময় হয়ে যাবে। যেখানেই আপনাকে টোকা মারবে, সেখান থেকে একই আওয়াজ আসবে, ইষ্টের আওয়াজ। পণ্ডিত যাঁরা, যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা শুধু শাস্ত্রের শব্দগুলোকে নিয়েছেন। শব্দের সাথে কিছু বিচার, চিন্তা-ভাবনা এসে যায়। যাঁরা শব্দ নিয়ে খেলা করেন, চিন্তা-ভাবনা নিয়ে খেলা করেন; এনারাই কেউ পরে দুটো বই লিখে দেবেন, কিংবা দুটো লেকচার দিয়ে দেবেন। এতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণময় হলেন কি? ফলে একটা জায়গায় গিয়ে গোলমাল হতে বাধ্য। অনন্তের বর্ণনা করার সময় তাঁর গোলমাল হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় কথা হল, আপনি এমন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, যার ব্যাপারে আপনার জ্ঞান খুবই সীমিত। তার মানে দাঁড়ায়, আপনার জ্ঞান যে একেবারে শূন্য তাও না, আর পূর্ণ জ্ঞান তো একেবারেই না; ফলে এলেমেলো হতে বাধ্য, কিছু করার নেই। এখন আপনি যাঁর প্রবচন শুনছেন, আপনি কি করে বুঝবেন যে, এনার কি শুধু পাণ্ডিত্যই আছে, নাকি কিছু উপলব্ধি আছে? সহজ উপায় হল, কাউকে শুনতে নেই। কাউকে না শুনে সরাসরি শাস্ত্রে যান। আমি এখানে ইউনিভার্সিটিতে আছি, এখানে জুনিয়র মহারাজরা আছেন, এখন আমাকে প্রাচীন সাধুদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ঠাকুর গান করতেন –মন্ত্রটন্ত্র জানিনে মা, ঠিক তেমনি আমি বলি –বইটই পড়িনি মা, লেকচার কারুর শুনিনি মা। আপনারা হয়ত অবাক হবেন, এই যে আমাদের এত নামকরা মহারাজরা আছেন, জীবনে আমি কারুর কোন লেখা বই পড়িনি, লেকচার শোনার তো কোন প্রশ্নই নেই। যতটা ডিউটির খাতিরে বা বাধ্যতামূলক ছিল, তার বাইরে কারুর কোন লেকচার শুনিনি। আপনি তাহলে বলতে পারেন, আপনার লেকচার আমরা কেন শুনব? আমি কোথায় লেকচার দিচ্ছি, আমি ঠাকুরের কথা পাঠ করে দিচ্ছি। কেন শুনতে যাব? সামনে শাস্ত্র আছে, ব্যাখ্যা সামনে রয়েছে; যেখানে একটু সন্দেহ হল, বড়দের জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি। ওই জায়গাতে আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে, কাকে জিজ্ঞেস করা যায়। ভাগ্যিস আমি খোলা মনের ছিলাম, দশজনকে জিজ্ঞেস করতাম, ওতেই বুঝে যেতাম। পাঁচজনের কাছে যখন ঘুরঘুর করবেন, তখন নিজেই বুঝে যাবেন কার কাছে শিখতে হবে।

এই যে ঠাকুর বলছেন, যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে। আসলে ভগবানের কথা বলতে নেই, যতটুকু আছে তার বাইরে যেতে নেই, যাবেন না।

গীতা পড়লেন, আচার্য শঙ্করের গীতাভাষ্য পড়লেন, বুঝলেন; যেমন বলেছেন ঠিক সেটাকে নিয়ে চিন্তন করুন, যেটুকু বুঝলেন সেটাকে নিজের ভাষায় এক পাতা কি দু পাতা লিখুন, অনুবাদ না। ফলে কি হয়, একটু এদিক সেদিক যেতে না যেতে আবার আপনাকে উনি আটকে ধরে রাখবেন। পুরোপুরি নিজের মত যদি ব্যাখ্যা করতে যান, এলেমেলো হয়ে যাবে, হতে বাধ্য। কথামৃতেও একই হবে, এলেমেলো হয়ে যাবে। তাও ঠাকুর আমাদের কাছে আমাদের ভাষায় এত পরিষ্কার করে, এত বিস্তারে বলেছেন, কিন্তু নিজের মত ব্যাখ্যা করতে গেলে এলেমেলো হবেই।

এখানে যে আলোচনাটা হচ্ছে, এর একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। ব্রাহ্মসমাজে বড় বড় সব নামকরা লোক ছিলেন, এনারা যে হিন্দু ধর্মের কি সাংঘাতিক ক্ষতি করেছেন কল্পনা করা যায় না। উপনিষদ থেকে মন্ত্র নিয়ে পাঠ করছেন, কিন্তু কোথাও হিন্দু বলতে এনাদের লজ্জা করছে। ফলে সবাই নিজের মত সব ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। খ্রীশ্চানদের চার্চগুলিতে ওদের প্রথা অনুসারে ওরা বাইবেলের কোন একটা অংশ নিয়ে বক্তা তাঁর নিজের মতে করে লেকচার দেন। এই নিয়ে আবার অনেক মজার মজার ঘটনাও আছে। ক্যাসানোভা নামে একজন ছিলেন, খুব গোলমেলে লোক, উনি লেকচার দিতেন। একটা কোন চার্চে লেকচার দেওয়ার আগে প্রস্তুতি নেননি, আর এমন খারাপ লেকচার দিলেন যে, তারপর থেকে লেকচার দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। ব্রাহ্মসমাজ খ্রীশ্চানদের ওই পরম্পরাটাকে নিলেন। উপনিষদের কোন একটা কথাকে নিয়ে লেকচার দেওয়া, তাও লেকচারটা নিজের মতের অনুযায়ী দিচ্ছেন।

আপনি বলতে পারেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সভাগুলিতেও তো একটা বিষয়ের উপর লেকচার দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মিশনে করা হয়, কিন্তু তফাৎ আছে। এখানে ঠাকুর অবতার, স্বামীজী যুগাচার্য; এনাদের কথাগুলো আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের এখানে গণ্ডী দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমার ভাষণে কোন বক্তব্য যেন এর বাইরে না যায়। ব্রাহ্মদের সময় এটা ছিল না। উপনিষদের দুটি কথা, গীতার দুটি কথা নিজের মত বলে চলে যাচ্ছেন। আর তাই না, পরম্পরাগত যে হিন্দু ধর্ম, সেটাকে এনারে কথায় কথায় আক্রমণ করছেন। বর্তমানকালে যেটা আজ দেখছেন, যারা আজ নিজেদের লিবারাল, যুক্তিবাদী বলছে, ধর্মের দিক থেকে এরা সবাই এদেরই প্রোডাক্ট। সেই রকম একজন পণ্ডিতের কথাই এবার ঠাকুর বলছেন।

সামাধ্যায়ী বলে এক পণ্ডিত বলেছিল, 'ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো'। এই উদাহরণটা খুব সুন্দর, বক্তা এখানে ভক্তির কথা জানেন, প্রেমাভক্তি কি জানেন আর তার সাথে ব্রাহ্ম পরম্পরায় ঈশ্বরকে নিরাকার জানেন। সেটাকে আবার একজন বলছেন 'নীরাকার', জলের আকার। এখন একদিকে ঈশ্বর আছেন তিনি নিরাকার, তাই স্বাভাবিক ভাবে তিনি নির্গুণ; নিরাকার মানেই নির্গুণ। তাই বলছেন –তোমার নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো। সমগ্র হিন্দি বেল্টে যাঁরা প্রবচন দিচ্ছেন, সবাই এই সামাধ্যায়ীর মত। লোকেদের এটাই ভাল লাগছে, কিছু করার নেই।

ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন –**বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কি না নীরস বলে!** স্বামীজী আমাদের পরম্পরাগত সাহিত্য বেশি পড়েননি, ইংরাজী রচনা বেশি পড়েছিলেন। ঠাকুরের মহাসমাধির পরে তিনি এগুলো পড়তে শুরু করলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বই সংগ্রহ করে পড়ছেন। প্রথমের দিকে আচার্য শঙ্করের কথার কিছু বিরোধী কথা স্বামীজী লিখেছেন ঠিকই, কারণ তখনও তিনি পুরোটা জানতেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্ত ছবি পরিষ্কার হল। তাঁর শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দজী গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে শুরু করলেন। একটা জায়গায় শিষ্যের কিছু সংশয় হল, স্বামীজীকে জানালেন। সেখানে স্বামীজী পরিষ্কার বলছেন –আমরা শঙ্করাচার্যের মতের, ওনার যে মত, সেটাই নিতে হবে। আর সেখানে একজন লিখছেন –শঙ্করাচার্য ভুল, ঠাকুর ঠিক ছিলেন। উনি কথামৃত পড়েননি মনে হয় –ঈশ্বর নীরস, তাঁকে সরস করতে হবে। আমাদের এখানে স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ আছেন, এদের কথা শুনে এত বিরক্ত হয়ে যান যে কি বলব। সেইজন্য উনি এখানে এত কোর্স শুরু করালেন, যাতে লোকেরা আমাদের শাস্ত্রের কথাগুলো ভাল করে জানতে পারে।

বেদ যাঁকে *রসো বৈ সঃ* বলছে আর তাঁকে কিনা বলছেন নীরস। বেদে যাঁকে আনন্দস্বরূপ বলা হয়েছে, সচ্চিদানন্দ বলা হয়েছে; তাঁকে কিনা বলছেন নীরস, আর তাই তাঁকে নাকি প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, **আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা**। বাস্তব জ্ঞান ছেড়েই দিন, নিজের যে theoretical understanding, সেটাও নেই।

একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে'। এ-কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। (সকলের হাস্য)

একটা মজার ঘটনা। সন্ন্যাস হওয়ার দু-তিন বছর পর আমার এক জায়গায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। সেখানে একজন নামকরা মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। আমি পুরো প্রস্তুতি নিয়ে, এই কোটেশান সেই কোটেশান মুখস্ত করছি। প্রথম ভাষণ দিতে যাচ্ছি, নার্ভাস ছিলাম। মহারাজকে আমি বললামও, মহারাজ এই প্রথম স্পিচ দিতে যাচ্ছি, কেমন নার্ভাসনেস লাগছে। উনি সবাইকে 'তুই' করে বলতেন, আমাকে বলছেন –মামার গোয়ালে ঘোড়া আছে শুধু এইটা বলিস না, তাতেই হবে। কথাটা শুনে আমার জোর হাসি পেয়ে গেল। নিজের মত ভুলভাল ইন্টাপ্রিটেশান করে, মামার গোয়ালে ঘোড়া আছে, এটা না বললেই হল। পণ্ডিতদের এই সমস্যা, সবাই গোয়ালে ঘোড়া রেখে দেবে।

কেউ ঐশ্বর্যের –বিভব, মান, পদ –এই সবের অহংকার করে, এ-সবই দুই দিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে –ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।

আর টাকার অহংকার করতে নাই। যদি বল আমি ধনী, –তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। এই করে করে ঠাকুর জোনাকির আলো, তারার আলো, চাঁদের আলোর কথা তুলনা করে বলছেন, সবাই ভাবছে আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। **দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হল, সূর্য উঠছেন। সবার আলো মলিন হয়ে গেল, কিছু পরে তাদের আর দেখাই গেল না**।

সন্ন্যাসীদের ত্যাগের ঐশ্বর্য। শুধু যে ঘরবাড়ি ত্যাগ করেন তা না, নিজের দেহের প্রতি যে আসক্তি সেটাকেও ত্যাগ করতে হয়। আমাদের সন্ন্যাসের সময় বিরজা হোম হয়, বিরাট হোম। সেখানে প্রত্যেকটা জিনিসকে, যাতে আসক্তি হতে পারে, এমন কি চুল, দাড়ি, সমস্ত কিছুকে এক এক করে হোমাগ্নিতে স্বাহা স্বাহা করে আহুতি দেওয়া হয়। আত্মা ছাড়া কোন কিছুর প্রতি আসক্তি হবে না, একমাত্র আসক্তি আত্মার প্রতি, আত্মা আমাদের স্বরূপ। আসলে আত্মার প্রতি যে আসক্তির কথা বলা হচ্ছে, এটা সেই আসক্তি না। আসক্তি তার প্রতি হয়, যেটা আপনি নন। আমার থেকে পৃথক অন্য কোন জিনিস হবে তবেই না আসক্তি হবে। আপনি তো আত্মা, আত্মাতে আসক্তি কি করে হবে। ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছা, ইচ্ছা কি করে হবে, ঈশ্বর আপনার স্বরূপ, ওটা ইচ্ছা কেন হবে। ঐশ্বর্য বোধ সবারই থাকে, প্রত্যেক মানুষের থাকে। টাকা-পয়সা হোক, পদমর্যাদা হোক, যেটাই হোক, আসক্তি থাকবে। সন্ন্যাসীর ত্যাগের ঐশ্বর্য, সন্ন্যাসী যত ত্যাগ করতে পারবেন তত তাঁর ঐশ্বর্য। মনের ত্যাগ না, বহির্ত্যাগও। ত্যাগ ভিতরেও থাকবে বাইরেও থাকবে। লোকে যেন ত্যাগ পরিষ্কার দেখতে পায়।

ঠাকুর শেষে বলছেন –**ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তাহলে ধনের অহংকার হয় না**। সাধারণ মানুষের একটু টাকা-পয়সা হলেই অহংকার হয়। বর্তমানে ইয়ং ছেলেমেয়েদের হাতে এত টাকা আসছে যে, ধরাকে সরা মনে করে।

সিঁদুরিয়াপটিতে মণিলালের বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হয়েছিল। ঠাকুরকে খুব সম্মান করে আপ্যায়ন করা হয়েছে, ঠাকুর ও সমবেত ভক্তদের পরিতোষ সহকারে মণিলাল খাওয়ালেন। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, সবাই বাড়ি প্রত্যাগমন করলেন, কিন্তু কারু কোন কষ্ট হয়নি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হচ্ছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
কেশবের বাটীর সম্মুখে –“পশ্যতি ত পন্থানম্”
(কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, উমানাথ, কেশবের মা, রাখাল মাস্টার)

ঠাকুরের মুখের অমৃত কথা নিয়ে যে কথামৃত, এটা যে কত উচ্চমানের গ্রন্থ, আমরা কল্পনাও করতে পারব না। আজকে আমরা যে জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, ওখানে দেখবেন আরও কত জোরালো ভাবে তিনি শেখাবেন। দিনটা ছিল ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ ৩০২)। কেশব সেন এই মর্ত্যধাম ত্যাগের শেষের দিকে চলে এসেছেন। তিনি তাঁর কমলকুটিরে (Lily Cottage) আছেন। কেশব ঠাকুরকে কত ভালবাসতেন, ঠাকুরও কেশবকে কত ভালবাসতেন, ঠাকুর ও কেশবের মধ্যে অতি বিশেষ একটা সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কিভাবে তৈরী হল, কেন এই সম্পর্ক গড়ে উঠল, সে এক বিরাট ইতিহাস। ইতিহাসের পণ্ডিতরা, যাঁরা এই ধরণের লেখালেখি করেন, তাঁদের অনেকেই এগুলোকে নিয়ে কিছু লেখালেখি করেছেন, ভবিষ্যতে আরও করবেন।

প্রথম যেবার ঠাকুর কেশব সেনকে দেখেছিলেন, কেশবকে দেখে তখনই বলেছিলেন, এরই ফাঁতনা নড়েছে। ছিপের বড়শিতে টোপ দিয়ে মাছ ধরা হয়, সেই টোপে মাছ মুখ দিয়েছে, ঠাকুর কি করে এত সুন্দর উপমা দিচ্ছেন ভাবা যায় না। অতগুলো লোকের মধ্যে কেশবকে দেখে ঠাকুর ঠিক বুঝতে পেরেছেন আধ্যাত্মিক স্তরে কেশব কোন স্তরে আছেন। কাজের মাধ্যমে বোঝা যায় সে কেমন কাজ করে, কাজের সময় তার মন কত নিয়ন্ত্রিত, ধ্যানের সময়েও দেখে বোঝা যায়। মন যত গভীরে যায়, তার শরীর তত স্থির, বায়ু তত স্থির, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তত সমান। এগুলো দিয়ে বোঝা যায় তার কেমন ধ্যান হচ্ছে, বোঝা যে খুব কঠিন বা অসম্ভব তা নয়। এখন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ঠাকুরের মহাসমাধি হতে আর মাত্র তিন বছর।

কমল কুটির সর্কুলার রোডের পশ্চিম ধারে। কেশব সেন পীড়িত, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি থেকে ঠাকুর তাঁকে দেখতে আসবেন। মাস্টারমশাই বেলা দুটো থেকে রাস্তার ধারে ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করছেন। রাস্তার লোকজন যাতায়াত করছে, তিনি দেখছেন। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় ঠাকুরের গাড়ি এসে হাজির হল, সঙ্গে লাটু ও আর দু-একটি ভক্ত। কেশবের বাড়ির লোকেরা এসে ঠাকুরকে সঙ্গে করে উপরে নিয়ে গেলন। বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে বারান্দায় একটি তক্তপোশ পাতা ছিল। সেটার উপর ঠাকুরকে বসানো হল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ –ঈশ্বরাবেশে মার সঙ্গে কথা

কেশব সেনের বাটীতে এসে ঠাকুর কেশবকে দেখার জন্য অধৈর্য হয়ে গেছেন। উত্তরোত্তর ঠাকুর শিশুর মত ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন কেশবকে দেখার জন্য, ঠাকুর তখন কোন শিশু নন, সাতচল্লিশ কি আটচল্লিশ বয়স হবে। তিনি মা কালীর সাধনা করে মায়ের দর্শন পেয়েছেন, নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, মুহুর্মহু সমাধিতে চলে যান, অবতার; তিনিই এখন বাচ্চাদের মত ব্যস্ত হচ্ছেন কেশবকে দেখার জন্য। এই একটি সাধারণ ছবিটাকে যদি বুঝতে পারেন, তাহলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন অবতারের ব্যবহার কেমন হয়।

ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, তিনি একটা বিশেষ ভাব নিয়ে আসেন। শ্রীরামচন্দ্রের এক রকম ভাব, শ্রীকৃষ্ণের অন্য এক রকম ভাব, কপিল মুনির আর-এক রকমের ভাব, ঠাকুরের আর এক রকমের ভাব। ঠাকুরের ভাব কি রকম –এক বালকের মত স্বভাব, বালসুলভ ভাব। আমি আমাদের অনেক বড় সাধুদের দেখেছি, তাঁরাও এই রকম কোন কোন একটা ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে যেতেন। অনেক আগেকার কথা, স্বামী বিরজানন্দ বেশির ভাগ সময় ধ্যানে ডুবে থাকতেন। পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী

মহারাজ ওনার সেবক ছিলেন, ওনার কাছেই একটা ঘটনা শুনেছিলাম। বেলুড় মঠে একদিন স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ বাথরুমে কমটে বসে আছেন। অনেকক্ষণ বসে আছেন। সেবকরা এসে বললেন, মহারাজ ভক্তদের প্রণামের সময় হয়েছে। উনি আচ্ছা আচ্ছা করে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর আবার তাঁকে বলা হল, মহারাজ ভক্তরা প্রণামের জন্য লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। কাকে বলবেন, যাঁকে বলছেন, উনি বাথরুমে ওই কমটে পুরো ধ্যানমগ্ন। সেবক এসে বলে যাচ্ছেন, মহারাজ ভক্তরা আপনাকে প্রণাম করবে, এবার উঠুন। উনি সেবককে খুব নরম করে আবদারের সুরে বলছেন –ভক্তদের এখানে নিয়ে আসা যায় না? এসব ঘটনা বিশ্বাস হয় না। আমরা যখন ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম, মহারাজ তখন এই ঘটনাটা আমাদের বলেছিলেন।

আর একটি ঘটনা। বেলুড় মঠে যেখানে মঠ অফিসে আছে, সেখানে একদিন স্বামীজীর উপর একটা ডকুমেন্টরি ফিল্ম দেখানো হবে। কেউ একজন ফিল্মটা বানিয়ে ছিলেন। সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখানো হবে। স্বামী বিরজানন্দজীকে নিয়ে আসা হয়েছে। চেয়ারে বসা থেকেই বারে বারে সেবককে জিজ্ঞেস করছেন, স্বামীজী এলেন? কিছুক্ষণ ডকুমেন্টরি চলল। চলতে চলতে কোন কারণে কারেন্ট চলে গেল। অনেকক্ষণ সারানোর চেষ্টা চালানো হল যাতে কারেন্ট চলে আসে। ঠিক করা গেল না, ডকুমেন্টারিও আর দেখানো গেল না। শো বন্ধ হয়ে গেল। সবাই যে যার ঘরের দিকে ফিরে যেতে থাকলেন। মহারাজকেও সেবক মহারাজ ধরে ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যেতে যেতে রাস্তায় সেবক মহারাজকে বারবার জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন –স্বামীজী এলেন, স্বামীজী এলেন? মহারাজের পুরো মনটা স্বামীজীর ভাবে ডুবে আছে। এসব ঘটনা আমরা শুনেছি মাত্র, কল্পনাও করতে পারিনা।

ঠাকুরের মন এখন ডুবে আছে কেশব সেনে। থেকে থাকে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। মনটা ওখানে ডুবে আছে কিনা। বাচ্চাদের মত অবস্থা, যেটা ধরে নেবেন সেটাকেই ধরে থাকবেন। ঠাকুরও যেন আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব্দের শিষ্যদের প্রতি) –হ্যাঁগা! তাঁর আসবার কি দরকার? আমিই ভেতরে যাই না কেন?

প্রসন্ন (বিনীতভাবে) –আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন।

ঠাকুর –যাও; তোমরাই অমন করছ! আমিই ভিতরে যাই।

প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন।

প্রসন্ন –তাঁর অবস্থা আর-একরকম হয়ে গেছে। আপনারই মতো মার সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে হাসেন-কাঁদেন।

আমাদের জানা নেই কেশবচন্দ্র সেনের এতটা হয়েছিল কিনা। তবে হয় কি, পরে পরে এই কথাগুলোই বাতাস পেয়ে আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বলবে। আমরা যে স্বামী বিরজানন্দের কথা বললাম, সেইভাবে যদি বলেন কেশবচন্দ্রও ছিলেন, হতে পারে। তবে এটুকু বলা যায়, ঠাকুর যেভাবে মা কালীকে সর্বক্ষণ রূপে স্বরূপে দেখছেন, সেটা সম্ভব না।

কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন, হাসেন-কাঁদেন –এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ। কোথায় কেশবের পীড়ার খবর শুনে তাঁকে দেখতে এসেছেন, কেশবের সঙ্গে দেখা করবেন, কথা বলবেন। মাঝখান থেকে কেশব মার সঙ্গে কথা কন শুনে তিনি নিজেই সমাধিস্থ হয়ে গেলন। এর কয়েক মিনিট পরেই আমরা দেখব, ঠাকুর ঈশ্বরতত্ত্ব কি সুন্দর ভাবে কত বিস্তারে বলছেন, বিশ্বাস করা যায় না। আমি এই সঙ্ঘের লোক, সঙ্ঘকে নখদর্পণে জানি। কোনটা কিভাবে এসেছে, কোথায় কোন জিনিসটা অতিরঞ্জিত হচ্ছে, কোথায় কমানো হচ্ছে, বাড়ানো হচ্ছে, সবটাই জানা আছে। কথামৃত হতবাক করে দেয়।

ঠাকুর সমাধিস্থ। শীতকাল, গায়ে সবুজ রঙের বনাতের গরম জামা; জামার উপর একখানি বরাত। উন্নত দেহ, দৃষ্টি স্থির। একেবারে মগ্ন! অনেকক্ষণ এই অবস্থায়। সমাধিভঙ্গ আর হইতেছে না। একদিকে ভালই হল, সমাধিতে ছিলেন বলে কেশবচন্দ্রকে দেখার ব্যস্ততাটা থেমে গেল, মনটা অন্য দিকে চলে গেল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ। পার্শ্বের বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

ঘরে অনেকগুলি আসবাব –কৌচ, কেদারা, আলনা, গ্যাসের আলো। ঠাকুরকে একটা কৌচের উপর বসানো হইল।

কৌচের উপর বসিয়াই ঠাকুর আবার বাহ্যশূন্য, ভাবাবিষ্ট। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেন। যাঁরা শুধু জপ করেন তাঁদের কথা বলতে পারব না, তবে যাঁরা গভীরে গিয়ে একটু ধ্যান করেন, তাঁদের মন যেদিন যেদিন একটু গভীরে যাবে, সেদিন দেখবেন বারবার মনে হবে একটু চুপচাপ থাকি, একটু নিরিবিলি থাকি। জপ করলেও এটা হয়, তবে ধ্যানে বেশি হয়; কেমন যেন নেশার ঘোরের মত মন হবে। এই কথা আমি শুধু তাঁদেরকেই বলছি যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন। যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা নেননি তাঁদের কথা আমি বলছি না। যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা যেখান থেকে হোক নিয়েছেন, প্রতিদিন দিনে দশ মিনিট কি পনের মিনিট গুরু যেমন বলে দিয়েছেন জপ করবেন।

কৌচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নেশার ঘোরে কি বলিতেছেন, "আগে এ-সব দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার"? রজোগুণে মানুষের এই জিনিসগুলির প্রয়োজন বোধ হয়। রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে জাগতিক বস্তু থেকে দৃষ্টিটা সরে আসে।

(রাখাল দৃষ্টে) –"রাখাল, তুই এসেছিস"?

বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার কি দেখিতেছেন। বলছেন,

ঠাকুর অন্তর্জগতে বিচরণ করছেন, –**"এই যে মা এসেছো! আবার বারাণসী কাপড় পরে কি দেখাও! মা হ্যাঙ্গামা করো না। বসো গো বসো"**।

আমার মনে হয় সেই দিন আর বেশি দেরী নেই, লোকেরা ঠাকুরের কথা আরও বেশি জানবে, বলবে –এগুলো সব ভাঁওতা; বিশ্বাস করতে চাইবে না। আধ্যাত্মিক ভাব যদি খুব গভীর না থাকে, ঠাকুরের এই ধরণের অবস্থার কথা ধারণা তো হবেই না, বিশ্বাসও হবে না। মনুস্মৃতির ক্লাশে কমেন্টে একজন লিখছে –মানুষ এখন চাঁদে চলে গেছে, আপনার এখনও এইসব জিনিসে পড়ে আছেন? কথামৃতের এই বর্ণনাগুলি যদি পড়ে, কি হবে ভগবান জানেন। মানুষ চাঁদে যাবে, মানুষ মঙ্গল গ্রহে যাবে; ঠাকুর আবার এসে তাই নূতন করে বলে দিয়ে গেলেন –হে মানব তুমি অমৃতের সন্তান, ভুলে যেও না সত্যটা কি। তুমি চাঁদে যাও, মঙ্গলে যাও, বুধ, শুক্র যেখানে খুশি যাও; আগামীকাল ভিন্ গ্রহ থেকে যদি কোন প্রাণী আসে; তাঁদের সাথে যদি তোমার বাক্য বিনিময় হয়, কর; অন্য গ্রহের বাসিন্দাদের সাথে যদি বাস করতে হয় তাও কর, কিন্তু তোমার ক্ষমতা, তোমার ঐতিহ্য ভুলে যেও না। কারণ ভিন্‌গ্রহের বাসীদের কথা ছেড়ে দিন, দেবতারাও এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে নিতে পারে না। কারণ বর্তমান কালে দেবতা বলতে আমরা বুঝি, যাঁরা অনেক যজ্ঞযাগ করে, অনেক শুভ কর্মাদি করে তাঁদের পূণ্যের জোরে আজ তাঁরা দেবতার পদে আসীন হয়েছেন। তার মানে কোথাও তাঁদের দেহের প্রতি একটা প্রীতি বোধ থেকে গেছে, সেইজন্য আজ তাঁরা দেবতা হয়ে জন্ম নিয়েছেন।

যে জিনিসটাকে নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করছি, যে জিনিসটার এখন বর্ণনা করা হচ্ছে, সেটা হল –দেহের পার, মনের পারের অবস্থা; মা কালীর সাথে ঠাকুরের যে কথা –এটা একেবারে শুদ্ধ মনের অবস্থাতেই হয়। যাঁরা নিয়মিত এই ক্লাশগুলো শুনছেন, অনেকদিন ধরে শুনছেন; আশা করি আপনারা এই জিনিসগুলিকে ভাল ভাবে ধারণা করতে পারছেন।

ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলিতেছে। ঘর আলোকময়। ব্রাহ্মভক্তেরা চতুর্দিকে আছেন। লাটু, রাখাল, মাস্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা-আপনি বলিতেছেন।

শুরু হয়ে গেল দেহ আর আত্মা বিষয়ক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। এই প্রসঙ্গটা পড়তে গেলে আমার জোর হাসি পেয়ে যায়। একজন অসুস্থ লোককে আপনি দেখতে গেছেন, তাঁকে আপনি ভালবাসেন। তাঁর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আপনার তেমন পরিচয় নেই। সবাই বুঝে গেছেন, তিনি কিছু দিনের মধ্যে ইহলীলা ত্যাগ করবেন। আর সেখানে এসে আপনি চলে গেলেন সমাধিতে; আর সমাধি থেকে একটু নীচে নেমে এসে শুরু করে দিলেন, দেহ, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, শক্তির কথা। যেটা ভক্ষণ করবেন, ঢেকুর সেটারই বেরিয়ে আসবে। এতেই বোঝা যায়, ঠাকুরের ভিতরটা কিসে টৈটুম্বুর হয়ে আছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন ঠাকুরকে দেখতে। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি? বঙ্কিমচন্দ্র মজা করে বলছেন –আহার, নিদ্রা, মৈথুন। কিন্তু এই কথা কেন তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো? কারণ তাঁর ভিতর এই জিনিসগুলিই ঘোরাঘুরি করছে। অজানা হোক, জানা হোক, বাচ্চা হোক, থিয়েটারওয়ালা হোক আর একজনের বাড়িতে গেছেন যে বাড়ির কর্তা মারা যেতে বসেছেন, শুরু করে দিলেন দেহ, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্মকে নিয়ে কথা; আর বাড়ির লোকেরা হা করে শুনছেন।

দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি, পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহবুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।

অতি সাধারণ কথা, কথামৃত নিয়মিত যাঁরা পড়েন তাঁরা এই কথা হাজারবার পড়েছেন। আর যাঁরা শুনছেন, তাঁরা গীতাও একটু আধটু নিশ্চয় পড়েছেন; গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখে থাকবেন, যেখানে ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিতে শুরু করেছেন –*দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।* বা *অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়* ইত্যাদি এই শ্লোকগুলিতে ভগবান দেহ ও আত্মাকে নিয়েই বলছেন।

দেহ আর আত্মার সম্পর্ক বোঝার দুটি উপায়। একটা হল, যেটা জোর করে চাপানো হয়। যত প্রকরণ গ্রন্থগুলি আছে, বেদান্তসার, পঞ্চদশী, দৃক্‌দৃশ্য বিবেক ইত্যাদি সব প্রকরণ গ্রন্থে দেখাচ্ছেন কিভাবে আত্মার উপর সব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম, তখন আমাদের বেদান্তসার পড়তে হয়েছিল। মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করেও বুঝতে পারতাম না কি বলতে চাইছেন। পরে মূল শাস্ত্র পড়ে এক মিনিটে বুঝে গেলাম কি বলতে চাইছে। দেহ ও আত্মার কি সম্পর্ক, কত দূর যায়, কিভাবে আসে; দেখার দুটি পথ –উপর থেকে নিচে, নিচের থেকে উপরে। আমার লেখা 'The World of Religion' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন, ওখানে প্রথমেই এই জিনিসটার বর্ণনা করা আছে। পূজনীয় স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ, আমাদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, উনি বইটা পড়ে খুব ভাবুক হয়ে বললেন, Never read anything like this। ওখানে এটাকে খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে –দুটি প্রকার।

উপনিষদ আদি, এমনকি যোগশাস্ত্রও আপনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই ওনারা শুরু করেন। সেখান থেকে ধাপে ধাপে আপনাকে নিয়ে যাবে; নিয়ে গিয়ে শেষের বর্ণনা করবেন –প্রত্যেক মানুষের 'আমি'র বোধ আছে। এই 'আমি'টা কে? স্বাভাবিক, দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আত্মা সমস্ত কিছু মিলিয়ে ক্রিয়মান একজন, কোন একটা বস্তু, বা আইডিয়া, যেটাই বলুন; এটাই 'আমি'। আমাদের

শেখানোর জন্য এনারা একটাই বলবেন –হয় ধ্যান করো, নয় বিচার করো। ধ্যান করলে আপনি যোগপথ নিতে পারেন, বিচার করলে আপনি উপনিষদের পথ নিতে পারেন। ভক্তি যখন আমরা করি, তখনও কখনো সেখান যোগ পথ হয়, কখনো বিচার পথও হয়, এর বাইরে আর কিছু হয় না। যোগ পথ –হয় ঈশ্বরে লীন হয়ে যাচ্ছেন, আর না হলে –ঈশ্বরই সব হয়েছেন, এই ভাব নিয়ে এগোচ্ছেন; এটাই বিচার পথ। সহজীকরণ করেই আমি বলছি।

ঋষিরা আমাদের একটি খুব সহজ চাবি দিয়ে দিয়েছেন, যে চাবি দিয়ে আত্মসাক্ষাৎকারের ভাণ্ডার খোল হবে। কি সেই চাবি? বাচ্চা বয়সে তুমি এক রকম দেখতে ছিলে, তোমার জ্ঞানবুদ্ধি এক রকম ছিল, তখন তুমি বলতে 'আমি'। আজ তুমি বড় হয়েছ, আজকেও তুমি বলছ 'আমি'। তোমার দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, মন পাল্টাচ্ছে, বুদ্ধি পাল্টাচ্ছে; কিন্তু 'আমি'টা স্থির থাকছে। কোন এমন একটা জিনিস আছে যেটা স্থির থাকছে, যার উপর দেহ, মন, বুদ্ধি খেলা করছে। অত্যন্ত সহজ যুক্তি, এর থেকে সাইন্টিফিক্ যুক্তি হতে পারে না। স্থায়ী কি স্থির কি, এটার দিকে দৃষ্টি দাও; ওই স্থায়ী ও স্থিরের দিকে চল। এরপর শুধু তর্ক দিয়ে তোমাদের কিছু হবে না, হয় তোমাকে শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে, নয় ধ্যানের সাহায্য নিতে হবে। ধ্যান আলাদা আলাদা ভাবে হয়। যোগ পথে শুধু মনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে বলা হয়, সেখানেও জ্ঞান-ভক্তি হতে পারে। আর-একটা হল, নেতি নেতি করে এগিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যা কিছু পরিবর্তনশীল, অনিত্য যা কিছু আছে সেটাকে ছেড়ে দেওয়া।

সাধারণ ভাবে আমরা যেটা করি, যেটা খুব প্রচলিত, তা হল –সগুণ ঈশ্বরকে ভেবে নিজের মন-প্রাণ ওই সগুণ ঈশ্বরে কেন্দ্রিত করা। বেলুড় মঠ থেকে যাঁরা দীক্ষা নেন তাঁদের সবাইকে এই শিক্ষাটাই দেওয়া হয় –হৃদয় এক বিশেষ স্থান, যেখানে সগুণ সাকার ঈশ্বর, তোমার ইষ্ট বিরাজমান, তাঁর ধ্যান করা। হৃদয়ে ইষ্টের ধ্যানেও সেই একই জিনিস হচ্ছে। যোগপথে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন, জ্ঞান পথে অনিত্য জিনিসগুলিকে ফেলে দেওয়ার কথা বলছেন –এখানেও এই দুটোই হচ্ছে। কিভাবে? একটা জিনিসকে নিয়ে, একটা ভাবকে নিয়ে মনটাকে সেখানে জুড়ে দেওয়া। এটা অতি সহজ একটা উপায়, যার জন্য পরবর্তি কালে যোগদর্শন মার খেয়ে গেল, জ্ঞানপথও মার খেয়ে গেল। তাঁর কারণ ওই দুটো পথ জনগণের সামনে সেইভাবে জিনিসটাকে তুলে দিতে পারলেন না, আর ওনারা নিজেরাও ওই লেভেলে নিজেদের ধরে রাখতে পারলেন না। হৃদয়ে ইষ্টের ধ্যান করতে করতে সেখান থেকে আপনি যখন ধীরে ধীরে এগোতে থাকবেন, তখন আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, আপনার দেহবোধ কমে যাচ্ছে এবং মন ঈশ্বরময় হয়ে আসছে; সাধনার সময় ঠাকুরের যেভাবে হয়েছিল।

শুরুতে আমরা বলেছিলাম, দেহ, মন, বুদ্ধি মিলিয়ে যে 'আমি' ভাবটা তৈরী হয়, সেই 'আমি' ভাবটা এবার দেখুন কেমন পাল্ট গেল। প্রথমে এটাই ছিল কাঁচা সুপারির মত, ছাল আর ফল মিলে এক, যাকে আলাদা করা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে এই 'আমি'র উপর যে চিন্তন, এটাকে কেন্দ্র করে যখন এগোতে শুরু করবেন, তখন ধীরে এই 'আমি' ফলের মত পুষ্ট হয়ে পক্ক হয়ে যাবে। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়েই বলছেন *উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোরমুক্ষীয় মামৃতাৎ*। যে কোন ফল কাঁচা অবস্থায় গাছ থেকে পেড়ে নিলে নষ্ট হয়ে যাবে; গাছ থেকে পতনের পূর্বে ফলটা পূর্ণতা যেন পায়। এই 'আমি'টা যখন ধীরে ধীরে পুষ্ট হবে, পাকা হবে, তখন ধীরে ধীরে আপনি বুঝতে পারবেন, এটাই দেহের ধর্ম, দেহ এভাবেই চলে; মনের এই রকমই স্বভাব; কিন্তু দেহ, মন, বুদ্ধি এগুলো থেকে আমি সম্পূর্ণ আলাদা। আমার ইষ্ট, যাঁর উপর আমার মন-প্রাণকে কেন্দ্রিত করছি, তিনিই সত্য, বাকি সব বিকার। দেহ অন্নের বিকার; এই রকম অন্ন খেলে দেহ এক রকম হবে, অন্য রকম অন্ন খেলে দেহ আর-এক রকম হয়ে যাবে। অন্ন আবার পৃথিবীর বিকার। পৃথিবী প্রকৃতির বিকার। আবার মনটাও প্রকৃতির একটা বিকার।

আমাদের কত কষ্ট, কষ্টের শেষ নেই, সব কষ্ট শুধুমাত্র এই কারণে, আমাদের আমিত্বটা দেহ মনের সাথে এমন ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, আমি যে দেহ নই, মন নই; এগুলো থেকে যে

আমি আলাদা, কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না। মাটির ঢিপিতে জল ঢাললে জল ওর মধ্যে হারিয়ে যাবে। আর-একটু জল দিলাম, কাদা হয়ে গেল। আরও জল দিলাম, আরও কাদা হয়ে গেল। কিন্তু সেই কাদাকে কায়দা করে খুব চটকে কাদার তাল করে কুমোরের চাকে দিয়ে একটা ঘট তৈরী করে রাখা হল। এবার ওই ঘটে জল ঢালুন, যেমন জল তেমন জল। আশ্চর্যের, সেই একই মাটি, পুরো পাল্টে গেল। দেহ আর আত্মার এই সম্পর্ক।

দেহ একটা মাধ্যম, যার মাধ্যমে আত্মা উপভোগ করে। বাল্যাবস্থাকে উপভোগ করে, যুবা অবস্থাকে উপভোগ করে। তারপর বৃদ্ধাবস্থায় গিয়ে দেখে, এই দেহে তো আর কিছু নেই, একে দিয়ে আর ভোগ করা যাবে না। জীবাত্মা তখন ওই দেহ থেকে বেরিয়ে আবার একটা নূতন দেহ নিল, আবার নূতন করে নূতন নূতন খেলা শুরু করে দিল। বাচ্চা যেমন নূতন নূতন খেলনা পছন্দ করে, আত্মাও ঠিক সেই রকম নিত্য নূতন খেলা পছন্দ করে। আপনি বলবেন, দাঁড়ান দাঁড়ান, মশাই এত দিন ধরে শুনে আসছি আত্মার কোন ইচ্ছা নেই, আত্মা কিছু করেন না, এখন আপনি অন্য কথা কেন বলছেন?

এই জায়গাতে এসে ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে যায়। দেহাত্মাকে বোঝা অত মুশকিল হয় না। উপনিষদে বর্ণিত শুদ্ধ আত্মাকে বুঝতেও খুব একটা মুশকিল হয় না। সমস্যা হল, আত্মা আর দেহের যে জায়গাতে মিলন হয়, ওই জায়গাটাকে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা অতি মুশকিল। ঠাকুর এখানে সুপারির উদাহরণ দিয়েছেন, খুব সুন্দর উদাহরণ। পাকা সুপারি, কাঁচা সুপারি; এই জায়গাটা মিক্সিং। এটা কেন হয়, কিভাবে হয়, এর কোন উত্তর নেই। আপনি যখন ধ্যান করছেন, যোগ পথে ধ্যান করলে এক রকম, জ্ঞান পথে ধ্যান করলে অন্য রকম, ভক্তি পথে ধ্যান করলে আর-এক রকম বা অন্যান্য কোন পথে ধ্যান করলে অন্য রকম। আপনি দেখবেন, আপনার মন দেহ থেকে সরে যাচ্ছে; আহার, নিদ্রা, মৈথুন থেকে মনে সরে আসছে, সংসারের পাঁচটা কাজ থেকে মন সরে আসছে আর ধীরে ধীরে আপনার মনে হতে লাগল, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। কম বয়সে যদি ঈশ্বরের দিকে যেতে চান, তাহলে সব কাজকে ঈশ্বরের কাজ মনে করে, সব কাজ ঈশ্বরের সেবা করছি এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। এই করে করে সব শেষে কি দেখবেন? তিনিই শুধু আছেন, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন। আর তাঁর কৃপাতে নির্বিকল্প সমাধিতে যদি আপনার অদ্বৈত জ্ঞান হয়, তখন দেখবেন এই সংসারটা হল নাম আর রূপের খেলা, আপনি ছাড়া আর কিছু নেই।

কিন্তু ওই সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে। দেহটা কোথা থেকে এলো? এই জায়গাতে এসে, আমরা যে উপর থেকে নিচে, নিচ থেকে উপরে বলছিলাম; এত দূর যাওয়ার পর এবার নিচের দিকে আসা শুরু হয়ে যায়। আমরা যদি ঠাকুরের সাধনাকে মানদণ্ড রূপে সৃষ্টির বিচার শুরু করি, তখন দেখছি সংসার আছে, আমি আছি; বিচার করে করে আপনি পৌঁছে গেলেন সেখানে যেখানে দেখছেন একমাত্র মা'ই আছেন। সেখান থেকে নির্বিকল্প সমাধিতে 'আমি' পুছে গেল, মা হারিয়ে গেলেন, জগৎ হারিয়ে গেল; থেকে গেলে শুদ্ধ চৈতন্য। সবার ক্ষেত্রে এটাই হয়। তাহলে ওই শুদ্ধ চৈতন্য থেকে সৃষ্টি কিভাবে হয়? কেন হয়, কিভাবে হয়, কারুর কাছে এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা নেই।

সাংখ্য দর্শন প্রথম যেটা বলছেন, সেটাকে বেদান্ত নেয়, বেদান্ত নেয় তাই গীতাও নেই। সেখানে বলছেন, ভগবান যখন সৃষ্টি করতে চাইলেন; তার মানে নির্বিকল্প সমাধিতে আপনি যেটা দেখছেন, নির্গুণ নিরাকার যিনি তিনি সগুণ সাকার হয়ে যান। তাঁর ইচ্ছা হল তিনি সৃষ্টি করবেন। তিনি কি করে ইচ্ছে করলেন, আমরা জানি না। আমরা আমাদের কল্পনার স্তর থেকে শুধু কল্পনা করে ভাবতে পারি, ইচ্ছা না হলে তো সৃষ্টি হবে না। তা নাহলে বলতে হবে, সবটাই মিথ্যা, কোথাও কিছু নেই; এটা তো পাগলের প্রলাপের মত শোনাবে। কারণ বেদান্ত কোথাও বলছে না যে, সংসার নেই। লোকেদের এটা একটা ভুল ধারণা যে, বেদান্ত নাকি বলছে সংসার মিথ্যা, সৃষ্টি মিথ্যা। তিনি যখন ইচ্ছা করলেন; এই ইচ্ছা আমার আপনার ইচ্ছা না, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

যেমনি তিনি ইচ্ছা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা দুটি রূপ ধারণ করে নেয় –চৈতন্য শক্তি ও প্রকৃতি শক্তি। যাবতীয় যা কিছু পদার্থ, এটা হল প্রকৃতির সাম্রাজ্য; চৈতন্য শক্তি হল শুদ্ধ চৈতন্য। কিন্তু তিনি ভেবেছেন সৃষ্টি হোক। এই যে ইচ্ছা, এখন এভাবে আমরা যদি কল্পনা করতে পারি; কল্পনা আমাদের করে নিতে হবে, কারণ এটা যদি বাস্তব হয় অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। একটা হাড়ি আছে, তাতে হাজারটা ছিদ্র করে একটা বাল্বের উপর ঢাকনার মত লাগিয়ে দেওয়া হয়, এবার ওই বাল্বের আলোর যে বিচ্ছুরণ হবে ওটা হাজারটা কিরণ রূপে আসবে। আসলে কি বাল্বের হাজারটা কিরণ আছে?

আকবর আর বীরবলের একটা চুটকি আছে। একবার বাদশা বীরবলের উপর রাগ করে বীরবলকে সভা থেকে বার করে দিয়েছেন। বীরবল সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর রাজদরবারে যান না। বীরবল সবার থেকে নিজেকে আড়াল করে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কেউ জানে না। আকবরকে এখন বীরবলকে খুঁজে বার করতে হবে, বীরবল কোথায় আছে। মাঝখান থেকে আকবর ঘোষণা করে দিলেন, কেউ যদি দেখাতে পারে আলো আর ছায়া এক সঙ্গে আছে, তাহলে তাকে ইনাম দেওয়া হয়। বীরবল যার বাড়িতে লুকিয়ে ছিল, সেও বাদশার এই ঘোষণা শুনেছে। বীরবল তাকে বলে দিল কিভাবে আলো আর ছায়া একসাথে চলে। বীরবল তাকে শিখিয়ে দিল –দড়ির যে খাটিয়া হয়, ওই খাটিয়া মাথায় করে নিয়ে চলে যাও। খাটিয়ায় কি হয়, ওর উপর আলোও পড়ছে আর ছায়াও পড়ছে, দুটো এক সঙ্গে পড়ে। লোকটি খাটিয়া মাথায় নিয়ে বাদশার কাছে এসে দেখাচ্ছে, এই দেখুন আলো আর ছায়া এক সঙ্গে আছে। বাদশা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন, নিশ্চয়ই বীরবল এর বাড়িতে লুকিয়ে আছে। সূর্য সেই এক, খাটিয়ার দড়ির ছ্যাঁদা দিয়ে শত শত আলো মাটিতে পড়ছে, আর তার ছায়াও পড়ছে। আলো আর ছায়া এক সঙ্গে চলেছে।

প্রকৃতি বা মায়ার যে আবরণ; এই মায়াটা কি? এই যে ভগবান ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, এটাই মায়া। মায়া কিন্তু মিথ্যা না, এটাই একটা ঈশ্বরীয় শক্তি। এসে গেলে চৈতন্য আর পদার্থের খেলা। এইবার এসে গেল সমষ্টি মন, যে এই সমস্ত জগৎ, সমস্ত কিছু তৈরী করে। আমরা বীরবলের যে উদাহরণটা দিলাম, এই উদাহরণ খুব নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাজ কিন্তু চলে যাবে। এই যে লোকটা খাটিয়াকে নিয়ে চলছে, সেখানে আলো ছায়া এক সঙ্গে চলছে। ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, তখন চৈতন্য আর পদার্থ এক সঙ্গে চলছে। এই চৈতন্য যিনি এক অখণ্ড, অদ্বৈত; তাঁকে এখন বিভাজিত বলে মনে হচ্ছে। শুধু মনে হচ্ছে না, এই যে প্রকৃতির খেলা, এই খেলা তো খাটিয়ার দড়ির মত না। প্রকৃতি হল সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যেটা সৃষ্টি হয়ে আর যেটা সৃষ্টি হয়নি, তার সমস্ত কিছুর শক্তির পুঞ্জ। সমুদ্র আর ঢেউয়ের খেলা। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তিনি খেলা শুরু করে দিলেন। বাচ্চা যেমন অন্য বাচ্চাকে বলে, দেখি তো তোমার কি কি খেলনা আছে। সেই বাচ্চা বলবে, আগে তোমার খেলনাগুলো আমাকে দেখাও।

যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি এখন দেখছেন প্রকৃতির খেলা। কিভাবে? –*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা*। আর দেখছেন সুখ-দুঃখের খেলা, জন্ম-মৃত্যুর খেলা, হাসি-কান্নার খেলা; এটাই বাস্তব। যখন একঘেয়েমি এসে যায়, তখন বলে, আর এসব দেখতে ভাল লাগছে না; তখন মুক্তির জন্য ছটফট করতে শুরু করে। এর আগে পর্যন্ত এই দেহ থেকে সেই দেহ ঘুরতে থাকে। আপনি হয়ত বলতে পারেন, আপনার এই থিয়োরি আমি কেন মানব? যে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে এই জ্ঞান পেয়েছেন, তাঁরাই এই কথা বলে গিয়েছেন। ঋষিদের কথা, তাঁদের ঐতিহ্যের কথা যদি জানা থাকে তাহলে এসব কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। মানা, না মানা আপনার খুশি।

আপনার আসল স্বরূপ হল আপনি শুদ্ধ চৈতন্য, দেহকে আশ্রয় করে চাইছেন খেলা দেখতে – যুক্তিবাদী রূপে, নাস্তিক রূপে, হিন্দু বিরোধী রূপে; দেখুন, দেখতে থাকুন, কোন আপত্তি নেই, কেউ বারণ করছে না। কোটি কোটি জন্ম ধরে খেলা দেখতে থাকুন। আপনি এখন আহার, নিদ্রা, মৈথুনের খেলা করতে চাইছেন, করুন, কেউ বাধা দিতে আসবে না। ঠাকুর কি-সব কি-সব উদাহরণ দিচ্ছেন,

মৈথুন নিয়ে খেলা করতে চাইছেন, যান, চড়ুই পাখি হয়ে খুব করে আনন্দ করুন। মাংস খেতে খুব ভালবাসেন, খুব ভালো; বাঘ, সিংহ, নেকড়ের যোনিতে জন্ম নিন, শুধু মাংসই খেতে থাকুন। এক সময় প্রচণ্ড একঘেয়েমি এসে মনকে অবসাদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, তখন বলবেন এ-সব আর ভালো লাগছে না। এখন আমি দুধ, ঘি, শাক সব্জী খেয়ে থাকব। যান, এবার বৈষ্ণব হয়ে জন্মান। ওই খেতে খেতে মন যখন ভরে যাবে, আর এগুলো ভাল লাগছেন; আমি বাতাস খেয়ে থাকব। এবার আপনি দেবতা হয়ে বাতাস খেয়ে থাকুন।

এই রকম কোটি কোটি জন্ম বিভিন্ন রকম খেলা খেলতে খেলতে এক সময় আপনি বলবেন, আমার আর কোন কিছুই লাগবে না। কিন্তু প্রকৃতি তো আপনাকে সহজে ছেড়ে দেবে না। এতদিন প্রকৃতিকে আপনি কত ধরণের খেলাতে ব্যবহার করেছেন, এখন আপনার ভাল লাগছে না বললেই কি প্রকৃতি ছেড়ে দেবে? দেবে না। ইদানিং একটা নূতন শব্দ এসেছে, মা আমাকে ইউজ করেছে। প্রকৃতি বলবে, তুমি আমাকে এতদিন ইউজ করেছ, আর এখন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে বলছ! থাকো না, এই দেখ আমার আর-একটা নূতন রকম খেলা দেখাচ্ছি। সে বলবে, আমার আর কোন খেলা লাগবে না, আমি আর এই ইন্দ্রিয়ের জগতে, প্রকৃতির রাজ্যে থাকতে চাই না। আর কয়েকটা জন্ম থেকে যাও না, ভাল লাগবে। না, আমি আর থাকব না।

শুরু হয়ে গেল এবার তপস্যার খেলা। ওটাও প্রকৃতির রাজ্য; সাধনা, এটাও প্রকৃতির রাজ্য। এক এক করে সমস্ত দেখা হয়ে গেল; সমষ্টি মন দেখা হয়ে গেল। প্রকৃতির স্বরূপ অনেক দেখা হয়ে গেছে। এরপর আমার ক্ষমতা দেখ, আমি সৃষ্টি করে দিতে পারি, এই ক্ষমতাও এসে গেল। তখন গিয়ে প্রকৃতিকে টাটা বাই করে দেয়। আত্মা এবার নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

তাহলে আত্মা নিজের স্বরূপের বাইরে কখন ছিল? কখনই ছিল না, শুধু মনে মনে কল্পনা করে যাচ্ছিল। কি রকম মনে করা? স্বপ্নে যেমন আমরা মনে করি। এটাই ঠাকুর এখানে বলছেন –কাঁচা সুপারি আর পাকা সুপারি। কাঁচা সুপারি মানে আপনি যখন দেহের সাথে মনের সাথে, বুদ্ধির সাথে নিজেকে এক করে রেখেছেন। পাকা সুপারি, আপনি এখন দেহ, মন, বুদ্ধি থেকে আলাদা –যেটা এতক্ষণ বলা হল। বলছেন, কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা খুব কঠিন। জ্ঞান হয়ে গেলে পরিষ্কার বোঝা যায় –আত্মা আলাদা দেহ আলাদ। আত্মা যখন নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে নেন, আর দেহ থেকে দেহে অর্থাৎ প্রকৃতির একটা লীলা থেকে আর-একটা লীলায় যায়, এটাকে বলছেন, জীবাত্মা। এখানেই তিন রকমের আত্মা হয়ে যায় –শুদ্ধাত্মা, জীবাত্মা ও দেহাত্মা। দেহাত্মা হল যেমন আমরা, নিজেকে মনে করছি আমি অমুক স্বামী, আমি অমুক বাবু, আমি এই, আমি সেই; আমি লেকচার শুনছি, আমি লেকচার দিচ্ছি –সব দেহাত্মা। যখন বলছি, অমুক গত হয়েছেন; তার মানে জীবাত্মা চলে গেলেন। আর সাধনা করে, ধ্যান করে আপনি যখন আত্মজ্ঞান পেয়ে গেলেন, তখন হয়ে গেলেন শুদ্ধাত্মা। 'আমি' দেহ থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাতে পৌঁছে গেল।

ঠাকুর এইসব কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে কেশব সেন এসে গেছেন। **কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্বদিকের দ্বার দিয়ে আসিতেছেন যাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বা টাউনহলে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার অস্তিচর্মসার মূর্তি দেখিয় অবাক্ হইয়া রহিলেন। কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসার হইতেছেন। অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন**।

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নিচে বসিয়াছেন। কেশব ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছেন। মাস্টারমশাইয়ের এই বর্ণনাগুলি ব্রাহ্মভক্তরা প্রথমের দিকে মানতে চাইছিলেন না। যাই হোক, **প্রণামান্তর উঠিয়া বসিলেন**। ঠাকুর আবার ভাবাবস্থায় চলে গেলেন।

ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায়। আপনা-আপনি কি বলিতেছেন। ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। এখান থেকে শুরু হল ঠাকুরের পুরোদমে আধ্যাত্মিক আলোচনা।

এখানে আপনাদের একটা কথা বলছি –যাঁরা আপনারা অনেকদিন ধরে কথামৃতের এই আলোচনা শুনছেন, আপনাদের মনে হবে বেশ কিছু একই কথা যেন বারবার বলা হচ্ছে। কোন উপায় নেই। যদি ধ্যান করে করে ধ্যানের অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, তাহলে ধ্যান করেই কাটাতে পারবেন, খুবই ভাল; আপনার শুনলেও কিছু নেই, না শুনলেও কিছু নেই। তা নাহলে ঠাকুরের সব কথাগুলো, আগে আগে শুনে থাকলেও এখনও শুনতে থাকুন, শুনলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়বে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ –মানুষলীলা

কেশব সেন পীড়িত। ঠাকুর তাই কেশবকে দেখতে এসেছেন। কেশবকে দেখার জন্য ঠাকুর ছটফট করছেন। ওরই মাঝে ঠাকুর বাহ্যশূন্য হয়ে যাচ্ছেন, ভাবাবিষ্ট। এখনও ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলছে। ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা-আপনি অনেক কথা বলছেন। ইতিমধ্যে কেশব ঘরে প্রবেশ করেছেন। ঠাকুরকে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করছেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় মার সঙ্গে কথা বলছেন। দিনটা ছিল ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩। মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন। ঠাকুরের অমৃত কথা দিয়ে সমৃদ্ধ কথামৃত যে কি উচ্চমানের গ্রন্থ এর পরিমাপ করা আমাদের সাধ্য নয়। এখন আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেখানে দেখবেন, আরও জোরাল ভাবে জিনিসটাকে কিভাবে নিয়ে যাবেন।

এইবার কেশব উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, "আমি এসেছি", "আমি এসেছি"। এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধরণ করিলেন ও সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গরগর মাতোয়ারা। আপনা-আপনি কত কথা বলিতেছেন। ভক্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত –এই সব। পূর্ণজ্ঞান হলে এক চৈতন্য-বোধ হয়। উপাধি হল নামরূপ, সংসারে যা কিছু দেখি সব নামরূপের খেলা। নানা বোধ মানেও উপাধি। একটা পুকুরে অনেকগুলো ঘটে জল ভরে ছেড়ে দেওয়া হল, ঘটগুলি এখন সব আলাদা আলাদা মনে হবে; আসলে সবটাই জল।

আবার পূর্ণজ্ঞানে দেখে যে, সেই এক চৈতন্য এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

তবে শক্তি বিশেষ। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশি শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ।

জীবনের, শুধু জীবনের নয়, যে কোন জিনিসের শেষটা যদি না জানা থাকে –কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি এগুলো সব এলেমেলো হয়ে যাবে। বাজারে মানুষ আনাজ কিনতেই যায়, ওখানে কেউ হরিনাম শুনতে যায় না। হাওড়া স্টেশনে দেখবেন লোকেরা লোকাল সুবারবর্ন ট্রেন ধরার জন্য দৌড়াচ্ছে। ট্রেনের জানালার ধারে বসা প্যাসেঞ্জারদের জিজ্ঞসে করে, দাদা এই ট্রেন অমুক স্টেশনে দাঁড়াবে? না জেনে ট্রেনে উঠে পড়লে সমস্যায় পড়ে যেতে হয়। আমার এক পরিচিত একবার মথুরা যাবেন, এ্যক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে এসেছেন। ওনার কানে একটা হেডফোন গোঁজা, ফোনে হয়ত কিছু শুনছিলেন। দেখছেন ওই একই ট্রেন দাঁড়িয়ে আছেন, উঠে পড়লেন। খেয়াল করেননি যে ট্রেনটা উল্টো দিকে যাচ্ছে, পৌঁছে গেলেন দিল্লী। অল্প বয়সে আমরা এই ধরণের অনেক রকম মজার চুটকি শুনতাম।

তখনকার দিনে এলাহাবাদ স্টেশনে বোম্বে থেকে প্রথমে ট্রেন ঢোকে, ঢুকে আবার ওখান থেকে বোম্বের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। এখনও নাকি এলাহাবাদ থেকে এভাবেই বোম্বের ট্রেন ঢোকে আর বেরোয়। ট্রেন যখন বেরোয় তখন বোঝা মুশকিল যে, ট্রেন বম্বে যাচ্ছে না হাওড়া আসছে। ভারতের বেশ

কিছু স্টেশনে এই রকম কিছু সিস্টেম আছে, বুঝতে পারা যায় না, ট্রেনটা আসছে না বেরিয়ে যাচ্ছে। একজন যাত্রী বোম্বে যাচ্ছিল। এলাহাবাদে এসে ট্রেন থেকে নেমে কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করল, চা খেলো। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে আবার ট্রেনে উঠে নিজের বাঙ্কে উঠে পড়ল।

নিচের যাত্রীকে জিজ্ঞেস করছে, দাদা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ভদ্রলোক বললেন, হাওড়া যাচ্ছি। খুব খুশি হয়ে এই যাত্রী বলছে –ভারত সরকার কি সুন্দর ট্রেন বানিয়েছে, উপরের বাঙ্ক বম্বে যাচ্ছে, নিচের বাঙ্ক হাওড়া যাচ্ছে। জীবনের শেষটা কি, এটা যদি ভাল ভাবে না বোঝা হয়ে থাকে। দিনগত কর্মক্ষয়টাই যদি জীবনের শেষ মনে হয়, কষ্ট ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। আর যদি মনে করেন মৃত্যুই শেষ কথা, তখন জীবন আর-এক রকম হয়ে যায়। ইদানিং কালে আপনারা সবাই দেখছেন আত্মহত্যার সংখ্যা কত হারে বেড়ে গেছে। এর কারণ এটাই, নূতন যে চিন্তা-ভাবনা –এই একটাই জীবন, মৃত্যুতেই সব শেষ। কিন্তু যাঁরা তত্ত্বদর্শি ঋষি, যাঁরা জ্ঞানী, স্বার্থশূন্য, সমাধিবান পুরুষ; আমরা এনাদের কথা শুনব, নাকি কালকে যারা জন্মেছে, দুটো বইও ভাল করে পড়েনি আর ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়া যাদের গুরু, তাদের কথা শুনব? কিন্তু তারাই এসে উপদেশ দেয়, জ্ঞান দেয়।

আজকে আমরা কথামৃতের উপর ১৬০তম ক্লাশ করছি। আপনারা যাঁরা নিষ্ঠা নিয়ে শুনে যাচ্ছেন, আমি ধরে নিচ্ছি আপনার অনেকগুলো কথামৃতের ক্লাশ শুনে নিয়েছেন। আর তার সাথে এটাও ধরে নিচ্ছি, নিশ্চয় আপনারা অন্য বক্তাদের ক্লাশও শুনছেন। কারণ আমরা দেখছি ইউটিউব আমাদের চ্যানেল চলতেই দেয় না, আটকে রেখেছে, বেঁধে রেখেছে; এগুলো দিয়ে বোঝা যায়, দর্শক সংখ্যা আগের থেকে কমে যাচ্ছে, বা নাও হতে পারে। তাও আমাদের চ্যানেলের দিনে চার থেকে পাঁচ হাজার ভিউস্ থাকে। চার থেকে পাঁচ হাজার লোক দিনে দেখছেন, এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। তাহলে শ্রোতাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে, এত যখন শুনেছেন; আমরাও যেখানে হাজার দুয়েক মূল ভিডিও আপলোড করে শাস্ত্রগুলিকে আপনাদের সামনে রেখে দিয়েছি; একটা অতি সাধারণ কথা যদি মনে রাখেন –শেষ সত্য কি। একবার বিচার করে, শেষ সত্যটা কি বুঝে নিয়ে যখন এটাকে সামনে রেখে দেবেন, দেখবেন বাকি জীবনটা সঙ্গে সঙ্গে গোছানো হয়ে যাবে। স্বামীজী অনেক আগেকার এক সাধককে খুব নামকরা একটা কথা বলছেন –ঈশ্বরকে না বুঝে তুমি সংসারকে কি করে বুঝবে? বিজ্ঞানের কাছে, ভোগবাদীদের কাছে, নিজেকে যারা যুক্তিবাদী বলে তাদের কাছে এটাই সমস্যা। কারণকে যদি আপনি না বোঝেন, কার্যকে আপনি কি করে বুঝবেন? একটা মেশিন কিভাবে কাজ করে, সেটা যদি আপনা না জানেন, মেশিনটা খারাপ হয়ে গেলে আপনি সারাবেন কি করে?

অনেক আগেকার একটা ঘটনার কথা আমি শুনেছিলাম; অনেক ক্লাশেও আমি ঘটনাটা বলেছি। একটা কারখানাতে একটা মেশিন খারাপ হওয়ার জন্য ওদের পুরো সিস্টেমটাই ডাউন হয়ে গেছে। কারখানার কিছুই চলছিল না। একজন অভিজ্ঞ মেকানিককে ডাকা হল। মেকানিক এসে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সব দেখার পর একটা জায়গায় হাতুড়ির এক ঘা মেরেছে। সত্যিকারের ঘটনা। মেশিনটা চলতে শুরু করল, পুরো সিস্টেম আবার আগের মত চলতে শুরু করল। মেকানিককে জিজ্ঞেস করা হল, আপনাকে কত দিতে হবে? বলল, একশ ডলার। তখনকার দিনে একশ ডলার বিরাট ব্যাপার। জেনারেল ম্যানেজার তাকে বলল, আপনি আইটেম-ওয়াইজ বিল দিন, অর্থাৎ জানতে চাওয়া হল, কোথায় কত কত টাকা লেগেছে। মেকানিক তখন বিলে লিখছেন –এক হাতুড়ি মারার জন্য পাঁচ ডলার, দ্বিতীয় লাইনে লিখছেন –হাতুড়ি কোন জায়গাতে মারতে হবে, এটা জানার জন্য –পচ্চানব্বুই ডলার।

আমি আপনি সবাই খুব ভাল হাতুড়ি চালাতে পারি, কিন্তু কোথায় ঘা মারতে হবে সেটা জানা নেই। এর একমাত্র কারণ, আমরা কারণটা জানি না। কার্যটা আমরা খুব ভাল করে শিখে নিয়েছি, কিন্তু কারণটা আমরা জানিনা। বর্তমান কালে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করছে, তাদের জিজ্ঞেস করুন, কেন বিয়ে করছ? জানিনা কেন করছি। খুব হলে কেউ বলবে, শুধু ভালবাসার জন্য। ভালবাসা! তাহলে দুদিন যেতে না যেতে ভালবাসা শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? ঠাকুরকে যদি বিশ্বাস না করেন, একজন ঋষিকে, একজন

সিদ্ধপুরুষকে যদি বিশ্বাস না করেন, কি করে আপনার জীবন চলবে। আমি একজনকে জানতাম, ওর ওই রকম আত্মহত্যা করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ছিল। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা সময় আসে, যখন সে মনে করে বেঁচে থেকে কি হবে। তিনি ঠাকুরের এই একটি কথা –অপঘাতে মরলে প্রেতনি হবে, শুধু এইটাকে মনে রেখে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেন। দেখাচ্ছেন যে, ধর্মের যে মূল, এটাকে জানার জন্য একজন প্রফেট, যীশু, মহম্মদ, এ্যব্রাহাম এনারা তাই; আর আমাদের এখানে এই রকম যাঁরা আছেন, তাঁদের আমরা ঋষি বলি, অবতার বলি।

এনারা সবাই একটি কথা বলেন, জগতের তুলনায় ঈশ্বর বেশি সত্য। এটা তো হতে পারেনা যে সবাই ভুল বলছেন। আর আমরা কিছু না পড়ে, কিছু না করে মনে করছি আমরা সত্য কে জানি। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংএর কাজ করাতে যাবে না, ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবে না, যে ওয়েল্ডিং করে, লোহা কাটতে জানে; তাঁর কাছে গিয়ে আপনি পায়ের অপারেশান করাবেন না। তাহলে বিজ্ঞান পড়া লোকের কাছে আমরা কেন ধর্মের কথা শিখতে যাব? সাহিত্যিক, কবির কাছে কেন আমরা ধর্মের কথা শিখব? সাহিত্যের জ্ঞান, লেখার কৌশল জানার জন্য আমি তার কাছে যাব। বিজ্ঞানের তত্ত্ব জানার জন্য আমি বৈজ্ঞানিকের কাছে যাব। ধর্মের কথা জানতে হলে তাঁর কাছে যাবো যিনি ধর্মজীবন যাপন করেছেন বা করছেন।

সবাই একটা কথাই বলেন –ঈশ্বর সত্য। আমাদের এখানে হিন্দু ধর্মের মূল হল বেদ। বেদের নাসদীয় সূক্ত, পুরুষসূক্তমে একটাই কথা বলছেন –চৈতন্যই সত্য, একমাত্র চৈতন্যই আছেন। সৃষ্টির আগে কি ছিল মুখে বলা যায় না, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি থেকে বলা যায়, তিনিই ছিলেন। কোন কিছু করতে গেলে আগে একটা কামনা দরকার হয়। আর ঈশ্বর কোন ছেলেমানুষ নন, ঈশ্বর কোন অনিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্ক, পাগলরা যেমন হয়, পাগলরা যেমন সব সময় কিছু না কিছু করে বেড়াচ্ছে, তিনি সেই রকম নন। তিনি কামনা করলেন সৃষ্টি হোক। এই কামনা সৃষ্টির বীজ, এই কামনা হল শক্তি। এই একটি কথা আপনারা যদি বুঝতে পারেন, তাহলে ধর্মের যে শেষ কথা, ধর্মের যে আদি কথা; একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

জ্ঞান হওয়ার জন্য সমাধি দরকার। একদিন একজন আমাকে বলল, সমাধিতে জ্ঞান হয় না। হবে হয় তো, কোন সমাধিতে হয়ত জ্ঞান হয় না। কিন্তু আমরা যে সমাধির কথা জানি, সেই সমাধিতে জ্ঞান হবে। জ্ঞান হওয়ার জন্যই সমাধি দরকার; মন যেখানে থেমে যায়, ওটাই সমাধি। ঠাকুর নিজের মনের শেষ একাগ্র অবস্থায় মা কালীকে দেখলেন সত্য রূপে। নির্বিকল্প সমাধিতে তিনি বোধে বোধ করলেন চৈতন্যই সত্য। দুটোর মধ্যে যেটাই আপনি নিন, কোথাও তো তিনি কামনা করলেন, যার জন্য এই স্থূল জগৎ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে সৃষ্টি হোক, এই কামনা সাধারণ কামনা নয়; আমাদের বিষয়কামনা নয়। বাচ্চা বলছে আমার পিস্তল চাই, ব্যাটবল চাই, ক্যাডবেরি খাব, মিষ্টি খাব; এটা ওই কামনা নয়। শুধু কামনা; একটা সঙ্কল্প। উপনিষদে এটাকে বলছেন *তপঃ*, তপস্যা –*তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*। ব্রহ্মের এটাই তপস্যা, এটাই জ্ঞান।

এই যে এই ঈশ্বরীয় শক্তি, কামনা রূপে দেখা দিয়েছে। এটাকেই আমরা শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি, মায়া বলি, মা কালী বলি। অধ্যাত্ম রামায়ণে দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করে বলছেন – যাবতীয় যত পুংবাচক আছে সব আপনিই হয়েছেন আর স্ত্রী লিঙ্গবাচক যা কিছু সব সীতা। এটা কখন হয়? সৃষ্টি যখন হয়ে যায়। সৃষ্টির আগে কি ছিল আমরা জানিনা, কেউই জানতে পারেনা। ঋষিরা, অবতাররা যা বলে গেছেন সেটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন পথ নেই। মানা ছাড়া আমাদের উপায় নেই, কারণ সেখানে আমাদের বুদ্ধি পৌঁছাতে পারবে না।

আর ব্রহ্ম ও শক্তি যদি আপনি নাও মানেন, আমার হাতে এই কলম আছে, যে কোন কারণেই হোক, আমার মনের ক্ষমতা দিয়ে আমি জানি এই কলমটা জড়। আর আমি জানি এই কলমকে আমি

জানতে পারছি; হয়ত কলমটাও আমাকে জানতে পারছে। কেউ যখন আমার সামনে আসেন, আমি জানতে পারছি কেউ এসেছেন, যিনি এসেছেন তিনি এক জীবন্ত প্রাণী। সাপকে দেখে কখন আমার কলম বলে মনে হয় না, কলমকে কখন সাপ বলে মনে হয় না। তার মানে যখনই কোন প্রাণী দেখি, তখন দেখি চৈতন্য আর জড় মিলে রয়েছে। সেখান থেকে দেখছি এই জগৎ চৈতন্য আর জড়ের খেলা, এই ব্যাপারে কারুর কখন সন্দেহ হতে পারেনা। চৈতন্যকে আপনি কিভাবে পরিভাষিত করবেন, সেটা আপনার খুশি।

কিন্তু জড়কে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। একটু সমস্যা আছে, সেখানে বিজ্ঞান জড়কে নিয়ে যাবে প্রোটন, ইলেক্ট্রন, কোয়ান্টাম রিয়ালিটি, সেখান থেকে কোয়ার্কাদি ইত্যাদিতে, বলতে গেলে আমার মাথা ঘুরে যায়। আমি ফিজিক্সের ছাত্র নই, এর বেশি কিছু বলার উপায়ও নেই আমার। ভাসা ভাসা একটু জানি। তাদের কাছে চৈতন্য হল মনের বিভিন্ন গতিবিধি। হিন্দু ধর্ম সেখানে বলছেন, যে কোন জড় বস্তু, ইলেক্ট্রন, প্রোটন, কোয়ান্টাম পার্টিকেলস, কোয়ার্ক সব কিছু পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, যেটা আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি। আর এই পঞ্চ তন্মাত্রার সবটাই হল সমষ্টি মনের সৃষ্টি। সমষ্টি মন হল প্রকৃতির শক্তি। এই যে শক্তি সব সময় আমরা দেখছি, যে শক্তিতে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে; এই শক্তিও সেই শক্তিরই ছোট্ট একটি অঙ্গ। এই শক্তি সেই শক্তি না। আপনি যদি বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা নিতে চান, নিতেই পারেন। মানুষের বিভিন্ন যে মন, সেই মন অনুযায়ী সে নেবে।

যাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্বাস, স্বামী বিবেকানন্দে বিশ্বাস, শঙ্করাচার্যে বিশ্বাস, শাস্ত্রে বিশ্বাস; যাঁরা কুতর্কের পারে, যাঁরা উচ্চমানের তর্ক পছন্দ করেন, যে উচ্চতর্ক অনুভূতিকে আধার করে আসে, তাঁরা সবাই ধর্ম জীবনযাপন করেন। যাঁদের কাছে উচ্চ জীবনাদর্শ, জীবনের মূল্য, জীবনের এক অর্থ, যেখানে জীবন এক শক্তির প্রকাশ, যে শক্তির প্রভাবে চৈতন্য ঝিকমিক করছে, তাঁরা এটাকে মানেন; ধর্ম এই জিনিসগুলিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন, সেটাকেই তাঁরা মানেন। তাঁরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বেদান্ত নিয়ে বোকা বোকা কথা বলতে যাবেন না। এই যে শক্তি, যেখান থেকে পুরো সৃষ্টি এসেছে, এর প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে হয়; সব কিছু এর মধ্যেই জুড়ে রয়েছে। যাঁরা অল্প একটু ফিজিক্স জানেবেন কিভাবে হিট এনার্জি, মেকানিক্যাল এনার্জি সব পরস্পর যুক্ত। পরে জানা গেল ইলেক্ট্রো ম্যগনেট ওয়েভসও তাপ সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে জানা গেলে সমস্ত শক্তি একই শক্তির রূপ। আগেকার দিনের লোকেরা এটা জানত না, বুঝত না; কিন্তু ঋষিদের সৌজন্যে আমরা এটা চিরকালই জানি, আমাদের পুরো ধর্মই এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার থেকেও বেশি, বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন বস্তুতে শক্তির প্রকাশ আলাদা আলাদা। আচার্য শঙ্কর এই জিনিসটার উপর জোর দেননি, কারণ তাঁর দরকার পড়েনি; যদিও তিনি বলতেন শক্তি আর শক্তিমান এক। তার মানে ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, গীতাতেও আগাগোড়া তিনি এটাই বলে গেছেন।

শক্তি বেশি, শক্তি কম; কিভাবে এটাকে আপনি পরিভাষিত করবেন? যে কোন ক্ষেত্রে, তার মাপকাঠি যেটা, সেটাতে যিনি বেশি দক্ষ সেখানে শক্তি বেশি। যেমন পালোয়ান, যে পালোয়ান সবাইকে হারিয়ে দিতে পারে, কুস্তির লড়াইয়ে তার শক্তি বেশি। আগেকার দিনে যাঁরা পণ্ডিত হতেন বেশির ভাগই হতেন রোগ-প্যাটকা, পালোয়ানের সামনে সে কিছুই না। কিছু লোক পালোয়ানকে সম্মান দিতে পারে, কিন্তু বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে, বিদ্বানের পূজা সব জায়গাতেই হয়। তার মানে, বিদ্যার শক্তি যেখানে প্রকাশ, সেখানে শক্তির প্রকাশ বেশি। ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন, একজন কি করে দশজনকে হারিয়ে দিতে পারে, আর বলছেন, তোমার ভিতর এই গুণগুলো আছে বলেই তো আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। খুব মূল্যবান কথা। কিন্তু আমরা এটাতেই ভুল করে বসি।

আমেরিকাতে হাজার কোটিপতিরা আছে, সেটাও এক ধরণের শক্তি, কিন্তু যাঁদের ঠিক ঠিক বিদ্যা আছে, তাঁদের সামনে তারা খড়কুটো। যাঁরা ফেমাস, কোন ফিল্মস্টার, কোন বিখ্যাত গায়িকা; প্রায়ই শোনা যায় বৃদ্ধাবস্থায় তারা কবে মারা গেলেন, কিভাবে মারা গেলেন, কেউই জানতে পারেনা। বিখ্যাত নেতা, নায়ক, নায়িকা, খেলোয়াড়; এনারা সবাই নিজের সময়কার রাজা। অথচ যাঁরা ঠিক ঠিক

বিদ্বান, অনেক সময় তাঁরা নিজের সময়ের অনেক পরে জানা জান। কিন্তু যাঁরা অবতার পুরুষ, সন্ত মহাত্মা, এনাদেরও পরে জানা যায়।

ঠাকুর এখানে পরিষ্কার বলছেন, যাঁর ভিতরে ঈশ্বরের ছবি বেশি পরিষ্কার, অর্থাৎ যাঁর মন, প্রাণ শুদ্ধ; যাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরের গুণ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে; আমরা তখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাঁর মধ্যে সাত্ত্বিক গুণের প্রকাশ হয়েছে। ঈশ্বরের গুণ –করুণা, ভালবাসা, সবারই প্রতি দয়া ইত্যাদি, তার সাথে জ্ঞান। জ্ঞানীর মধ্যে যদি এই গুণগুলো থাকে তবেই এগুলো হবে সাত্ত্বিক গুণ, না হলে অনেক সময় তামসিকও হয়। যেমন দয়া, দয়া কখন রাজসিক হবে না, হয় তামসিক হবে, নয় সাত্ত্বিক হবে।

এই জীবন হল ব্রহ্ম আর শক্তির খেলা। শক্তিটাও ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব; যদিও আমরা অন্য ভাবে দেখছি। টাকা-পয়সাকে এক ভাবে দেখছি, গ্ল্যামারকে এক ভাবে দেখছি; কিন্তু শেষে গিয়ে এগুলোও শক্তিরই খেলা। যদিও শ্রেষ্ঠতম শক্তি হল আধ্যাত্মিক শক্তি, তাঁর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনা। স্বামীজী যখন বলছেন, Sisters and brothers of America, সমস্ত মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে সমস্ত হল মুখরিত করে দিল। অঙ্গুলিমাল যখন ভগবান বুদ্ধকে বললেন, দাঁড়াও; তখন ভগবান বুদ্ধ শুধু বললেন, আমি তো দাঁড়িয়েছি, তুমি কবে দাঁড়াবে? ওখানেই অঙ্গুলিমাল থেমে গেল, তার ক্ষমতা ওখানেই শেষ। আধ্যাত্মিক শক্তির সামনে অন্য কোন শক্তি কাজ করে না। জল আর বরফ, বরফের ছোট চাঁই আর বড় চাঁই; সচ্চিদানন্দ সাগরে সবচেয়ে বড় চাঁই হল শক্তিপুঞ্জ অবতার।

ঈশ্বরের যে প্রকাশ, শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই শক্তিতে পুরো পাহাড়, ওইটাই হল সৃষ্টি; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল তাঁর স্থূল রূপ। বোঝানর জন্য বলা হয়; বাকিরা সব হলেন অংশ, কেউ বড় অংশ, কেউ ছোট অংশ। কিন্তু যদি স্থূল ভাবে বুঝতে চান তাহলে জীবনে হয় পুরোপুরি একশ ভাগ ঈশ্বরের দিকে যান; না হলে একশ ভাগ শক্তির দিকে যান। শক্তি অর্জন করুন, তা যে শক্তিই হোক, টাকার শক্তি হোক, গ্ল্যামারের শক্তি হোক। বেশির ভাগ মানুষই একেবারে অপদার্থ, ঠাকুরের কথা বাছুরের লেজে হাত দিলে বাছুর শুয়ে পড়ে। আমাদের কাছে যারা আসে তাদের মধ্যে কালভদ্রে কয়েকজনকে পাই, যাদের দেখে মনে হয় ভিতরে কিছু আছে। আমার এক পরিচিত ছেলে রোজ আমাদের ক্লাশগুলো শোনে; কিছুদিন আগে শুনলাম ছেলেটি WBCS কোয়ালিফাই করেছে, শুনে ভাল লাগল। আর-একটি ছেলে ডাক্তারিতে ভাল রেজাল্ট করল, সেও নিয়মিত আমাদের ক্লাশগুলো শোনে। অনেকে আমাদের লেখেন, ফোনে বলেন; এই ক্লাশগুলো শুনে আমার জীবনটা পাল্টে গেল। কিন্তু যারা আসে তাদের বেশির ভাগই শক্তিহীন। এদের সবাইকে বলি, ঈশ্বরকে ভুলে যাও, আগে জাগতিক শক্তি অর্জন কর। জাগতিক শক্তি অর্জন করলে এখন তুমি যে তমোগুণে পড়ে আছ, সেখান থেকে তুমি রজোগুণে যাবে; রজোগুণ থেকে এবার তুমি সত্ত্বগুণে যাবে। এখন তুমি তমোগুণকে সত্ত্বগুণ মনে করে একটা বাজে অবস্থায় পড়ে আছ, এই ভুল করো না।

মূল কথা, এই জগৎ ব্রহ্ম আর শক্তির খেলা; ওই শক্তিটাও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, দুটো আলাদা কিছু নয়। কিন্তু আসল শক্তি হল, যেখানে ব্রহ্মের ঠিক ঠিক প্রতিবিম্ব, সেটাই আধ্যাত্মিকতা। আমি আমার কয়েকজন পরিচিতদের দেখি মুখে বড় বড় বেদান্তের কথা বলবে, জগৎ মিথ্যা বলবে, ধ্যান না করলে কিছু হবে না, ধ্যানটাই আসল। সকালে বিছানা থেকে উঠতে চায় না, ঘোর তামসিক; সে নাকি ধ্যান করবে আর জগৎ মিথ্যা বলবে। ঠাকুর এদেরকে বলতেন, ঢ্যামনা শালা। এভাবে সাধনা হয় না, শক্তি সঞ্চয় করতে হয়।

আমাদের প্রাচীন ব্যবস্থাতে বলা হত –প্রথমে সকাম কর্ম, তারপর নিষ্কাম কর্ম, সেখান থেকে ধ্যানের দিকে এগোবে। প্রথমেই ধ্যান হবে না, প্রথমে নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে তৈরী করতে হয়। নিষ্কাম কর্মও প্রথমে একেবারেই হবে না, যতদিন প্রচুর সকাম কর্ম না করা হয়। কারণ সকাম

কর্ম মানুষকে তমোগুণ থেকে রজোগুণে নিয়ে যায় আর ওই মোমেন্টামেই আপনাকে দিয়ে নিষ্কাম কর্ম করিয়ে নেবে; তা নাহলে নিষ্কাম কর্ম ফাঁকিবাজি কর্ম হয়ে যায়। নিষ্কাম কর্ম যদি না করা থাকে বুদ্ধি শুদ্ধ হবে না আর বুদ্ধি শুদ্ধ না হলে ধ্যান হবে না। কিন্তু কেউ এগুলো শুনবে না, কারণ সবাই নিজেকে আগে থেকেই জ্ঞানী ভেবে বসে আছে। আশা করি আমি আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি –ঠাকুর এখানে কি বলতে চাইছেন। জেনে নিন এর অন্যথা একটুও কিছু হয় না। তবে শক্তি বিশেষ, ঠাকুর যেটা বলছেন, কিন্তু কোনখানে বেশি শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ।

বিদ্যাসাগর বলেছিল, 'তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেনে?' আমি বললুম, 'তা যদি না হতো, তাহলে একজন লোক পঞ্চাশজন লোককে হারিয়ে দেয় কেমন করে, আর তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন?' শক্তি বিশেষ।

শক্তি বিশেষ বিভিন্ন কারণে হতে পারে, ঘোর বিষয়ী, ঘোর জাগতিক যারা তাদের টাকা-পয়সা, গ্ল্যামারে শক্তির প্রকাশ হতে পারে, সেই শক্তিও ঈশ্বরীয়। তবে আসল শক্তি হল, আধ্যাত্মিক শক্তি, ওই শক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনা। কারণ আধ্যাত্মিক শক্তি হল শক্তির রাজা। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করার জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। তাতেও দেখুন, আমাদের সামনে আদর্শ রাখার জন্য ঠাকুর কত কি করলেন। কোন ছোটবেলা থেকে ঠাকুর কত কিছু করলেন। পূজা-অর্চনার বিধি শিখেছিলেন বলেই তো তিনি মা ভবতারিণীর পূজারী হলেন। আমরা বলি তিনি পড়াশোনা করেননি, কিন্তু পূজাটা জানতেন, পূজার মন্ত্রগুলো জানতেন বলেই কালী মন্দিরের পূজারী হতে পারলেন। এখন তো পূজারীরা সব ভুলভাল মন্ত্র উচ্চারণ করে। ঠাকুরের কাছে আমরা কোন দিন কল্পনা করতে পারব না যে, তিনি মন্ত্রগুলো ভুলভাল মন্ত্রোচ্চারণ করতেন, সম্ভই না; এর জন্যও খাটতে হয়।

তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি।

এটাই মূল বক্তব্য। স্বামীজী ছিলেন সেই আধার, যেখানে তাঁর লীলার প্রকাশ বেশি। ঠাকুরকে যদি আপনি অবতার রূপে না দেখেন, তাহলে কিন্তু এই ব্যাপারটা সাংঘাতিক এক পর্যায়ে চলে যাবে। ঈশ্বরের কাছে আমরা যে জিনিসগুলি আশা করি, তিনি সচ্চিদানন্দ; নিজের আনন্দে সব সময় ডুবে আছেন। ঠাকুরও সর্বদা সমাধিমগ্ন। তিনি যাকে খুশি মুক্তি দিয়ে দিচ্ছেন, যাকে খুশি সাংসারিক সুখ দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছেন, সত্যিই ভরিয়ে দিতেন। ঈশ্বরের মধ্যে যত শক্তি আমরা ভাবতে পারি, ঠাকুরের মধ্যে তার সমস্ত শক্তি বিদ্যমান। তার অর্থই হল, আধার, শক্তি বিশেষ। আমরা কথায় কথায় আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন নিয়ে কত কথা বলি; ঈশ্বরদর্শনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি। আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন আমার আপনার চেষ্টায় হবে না; নিজে থেকে হবে।

জীবনের উদ্দেশ্য আমাকে সে আধার তৈরী করা। মাধ্যমিকে ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করলাম, তার মানে আমি নিজেকে সেই আধার তৈরী করে নিলাম, যাতে ভাল কলেজে গিয়ে তাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, যে জ্ঞান আহরণ করার পদ্ধতি, সেটাকে আমি নিতে পারি। ভাল কলেজে গিয়ে আবার আমি সেই আধার করলাম, যাতে ভাল একটা চাকরিতে গিয়ে আমি ভাল ভাবে আমার কাজের দায়ীত্ব পালন করতে পারি। এইভাবে যদি আধার না তৈরী করা হয়, তাহলে কি হবে? পাতলা গেজের ইলেক্ট্রিক তারে হাই ভোল্টেজ কারেন্ট গেলে বুম্ করে ফিউজ্ উড়ে যাবে। চাকরি তো এসে যাবে, কিন্তু ফিউজটা উড়ে যাবে। জীবনের উদ্দেশ্য নিজের ফিউজ যেন না উড়ে যায়, সেইভাবে আধার তৈরী করা।

আধার, আধার; জীবনের উদ্দেশ্য আধার তৈরী করা। একবার যখন আধার তৈরী হয়ে গেল, একবার যদি দু কিলোমিটার, তিন কিলোমিটার রানওয়ে তৈরী হয়ে গেল, সেখানে এবার হেলিকপ্টারও নামতে মারবে, মাঝারি প্লেনও নামতে পারবে, বড় প্লেনও নামতে পারবে। আধার মানে, তমোগুণ থেকে বেরিয়ে রজোগুণে এনে পূর্ণ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এবার যেখানে মন লাগাবে সেখানে সাফল্য আসবে। তখন আমি নূতন ব্রহ্মচারী, অদ্বৈত আশ্রমে আছি। কলকাতার বইমেলাতে অদ্বৈত আশ্রমের

একটা স্টল থাকত। তখন বই কাঁধে করে স্টলে এনে বই বিক্রি করতাম। অনেক আগেকার ঘটনা, ১৯৮৮ সালের কথা, একবার এক হিন্দিভাষী একজন ভদ্রলোক রামকৃষ্ণ মিশনের স্টল দেখতে এসেছেন। এসে আমাদের বলছেন, স্বামীজী, 'এইসা বিদ্যা মুঝে শিখা দিজিয়ে, যাঁহা মন লাগায়ে লাগ যায়ে, যাঁহা সে মন হঠায়ে হঠ যায়ে।' বলতে চাইছেন, যেখান মন লাগাবো সেখানে মন লেগে যাবে, যেখান থেকে মন সরাবো, মন সরে আসবে। আমরা হেসে বললাম, আমাদেরও সেটা নেই। সবাই এটাই চায়। কিন্তু এটার জন্য নিজেকে আগে আধার করতে হবে। তখন তাঁর লীলা ওই আধারে প্রকাশ পাবে, তা নাহলে পাবে না।

জমিদার সব জায়গায় থাকেন। কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।

আমাদের একটা মজার ঘটনা আছে, যদিও এর সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক নেই। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমি তখন একেবারেই নূতন ব্রহ্মচারী। দেওঘরে আমার একটা কাজ ছিল, শীতের সময় ট্রাকে করে কয়লাখনি থেকে সারা বছরের কয়লা নিয়ে আসা। বেরমো-ফুসরো বলে একটা কয়লা খাদ আছে, গিরিডি দিয়ে যেতে হয়। ওখানকার সেলস ম্যানেজারের সাথে আমাদের দেখা করতে হবে। ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে সেখানে কোলিয়ারির এক অফিসে পৌঁছেছি। গিয়ে দেখছি অফিস তালা বন্ধ। লেখা আছে Office of Sales Manager। দাঁড়িয়ে আছি, ওখানকার কেউ কিছু বলতে পারছে না, অফিস কখন খুলবে। একজন বলল, হ্যাঁ, কখন-সখন খোলে। কিন্তু আমাদের কপাল এমন সুপ্রসন্ন, ঠাকুরের কৃপা ছিল। হঠাৎ দেখি মোটর সাইকেলে দুজন এসে ওখানে দাঁড়ালেন।

আমাদের ব্রহ্মচারীর সাদা পোশাকে দেখে একটু অবাক হলেন। 'আপনারা এখানে, কি ব্যাপার'? ওই ভদ্রলোকই সেলস ম্যানেজার। সব শোনার পর উনি নিজেই বলছেন, 'বাইচান্স তিনি আজ এসেছেন। সপ্তাহে কখন কিছুক্ষণের জন্য আসি, আমাদের মেইন অফিস অন্য জায়গায়'। তারপর তিনি আমাদের ওনাদের মেইন অফিসে নিয়ে গেলেন। অনেক লম্বা কাহিনী। যতটা আমরা আশা করেছিলাম, তার থেকে উনি অনেক বেশি সাহায্য করলেন আমাদের। ওটাও ওনার অফিস, কিন্তু এটা কোলিয়ারির মাঝখানে, কিন্তু এখানে উনি কখন-সখন আসেন। বাবু যেখানে বেশি থাকেন, সেখানে যেতে হবে। আধার যেখানে বেশি সেখানে আমাদের যেতে হবে। যার-তার কাছে যদি আপনি ধর্ম শিখতে যান, আপনার কিছুই হবে না।

তার লক্ষণ কি? যেখানে কার্য বেশি, সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ। এখানে কার্য মানে ধর্ম কার্য। অন্যান্য কার্যগুলোতেও বেশি প্রকাশ; কিন্তু জাতে তফাৎ হয়ে যায়।

এই আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। আচার্য শঙ্করও এই কথা বলছেন। আজকেই এক ভদ্রলোক এসে বলছেন, ভদ্রলোক ভাল লোক; তিনি ব্যাঙ্গালোর না কোথায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি একটা বই 'অপরোক্ষ অনুভূতি' নিয়ে এসেছেন। আমার আর হাসি থামছে না। 'অপরোক্ষ অনুভূতি' পড়ে আপনি কি করবেন? ব্রহ্মচারী অবস্থায় প্রথম সব প্রকরণ গ্রন্থের পাতা উল্টেপাল্টে পড়ার পর প্রথম দিন থেকেই আগ্রহ হারিয়ে গেল প্রকরণ গ্রন্থ পড়া থেকে। ঠাকুরের হয়ত ইচ্ছে নেই বেশি পড়াশোনা করি। স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজের কাছে পঞ্চদশী পড়েছিলাম। ব্রহ্মচারী অবস্থায় ওই একবারই পড়েছিলাম। আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'উপনিষদ ছেড়ে, গীতা ছেড়ে অপরোক্ষ অনুভূতির দিকেই গেলেন?'

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয় ঠাকুরের কাছে যেতে ঠাকুর তাঁকে বলছেন, তোমার পঞ্চদশী-টশি পড়া আছে? বৈকুণ্ঠ বললেন, 'সে কি জিনিস আমার জানা নাই'। ঠাকুর শুনে বলছেন, যাক বাঁচলুম; ছেলেগুলো এই সব বইটই পড়ে এসে এখানে জ্যাঠামি করে। লীলাপ্রসঙ্গে ঠিক এই শব্দ ব্যবহার করা

হয়েছে 'জ্যাঠামি করে।'। ঠাকুর বলছেন, পরব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ধর্ম জানতে হলে মূল জিনিসকে জানতে হবে, মূল জিনিসকে জানলে আপনি নিজেই একটা অপরোক্ষ অনুভূতি লিখে দেবেন।

একটিকে ছেড়ে আর-একটিকে চিন্তা করবার জো নাই। এটা খুব উচ্চাবস্থার কথা। প্রথমে আমরা যেখানে শুরু করেছিলাম, *কামস্তদগ্রে আসীদ্*; সৃষ্টি মানেই শক্তি, শক্তি ছাড়া সৃষ্টি হবে না। এই শক্তি ঈশ্বর থেকে আলাদা কিছু নয়। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁরই এক অংশ সৃষ্টি রূপে দেখায়, তাঁর থেকে সৃষ্টি আলাদা কিছু নয়। এই বলে ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন –**যেমন জ্যোতি আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিঃকে ভাববার জো নাই, আবার জ্যোতিঃকে ছেড়ে মণিকে ভাববার জো নাই। সাপ আর তির্যগ্‌গতি। সাপকে ছেড়ে তির্যগ্‌গতি ভাববার জো নাই, আবার সাপের তির্যগ্‌গতি ছেড়ে সাপকে ভাববার জো নাই**।

আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। মাণ্ডুক্যকারিকাতে ঠিক এই জিনিসটাকেই বারবার বলছেন –অজাতবাদ। নূতন কিছু হয় না। আমরা এখান থেকে দেখে মনে করছি যেন একটা নূতন কিছু এলো, আসলে নূতন কিছু হয়ও না, আসেও না। জল, জলের হিমশক্তির দরুণ জল বরফ হচ্ছে। বরফ দেখে মনে হচ্ছে নূতন কিছু সৃষ্টি হল, আসলে জল রূপে চিরদিনই ছিল। **অনুলোম, বিলোম। রাখাল, নরেন্দ্র আর আর ছোকরাদের জন্য ব্যস্ত হই কেন? হাজরা বললে, তুমি ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তা ঈশ্বরকে ভাববে কখন? (কেশব ও সকলের ঈষৎ হাস্য)** হাজরা ঠাকুরকে বলছে, ঈশ্বরকে ভাববে কখন?

তখন মহা চিন্তিত হলুম। ঠাকুরের বালক স্বভাব কিনা, একটুতেই চিন্তিত হয়ে যান। **বললুম, মা একি হল**। এই দেখুন, অদ্বৈতে অবস্থিত হয়ে যিনি ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ বলছেন, তিনিই আবার যখন কোন ব্যাপারে চিন্তিত হচ্ছেন, তখনই মা কালীর কাছে ছুটে যাচ্ছেন। ইদানিং কালের অদ্বৈতবাদীরা এই জিনিসগুলো বোঝেনই না। ভোলানাথ দক্ষিণেশ্বরে খাজাঞ্চি ছিলেন, কথামৃতে ওনার নাম কয়েকবার আসে। **তারপর ভোলানাথকে জিজ্ঞাস করলুম। ভোলানাথ বললে, ভারতে** (মহাভারতে) **ওই কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে কোথায় দাঁড়াবে? তাই সত্ত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম। (সকলের হাস্য**) কোন মানুষ কখনই মনকে কোথাও না রেখে বাঁচতে পারেনা। মন কিছু না কিছু একটা নিয়ে থাকবে। আমি এক সময় নরেন্দ্রপুরে ছিলাম, সেখানে একদিন ছাত্ররা ধরল, কি করে পরীক্ষায় বেশি নম্বর আনা যায়? আমি তাদের একটা কথাই বললাম –যখন পড়বে, তখন লিখে লিখে পড়বে, এটাই বেস্ট মেথড। তার সাথে পুরো বোঝালাম কিভাবে পড়াশোনা করতে হয়।

নরেন্দ্রপুরের ছেলে, সব বুদ্ধিমান ছেলে। একদিন একটা ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করে হাসছে, হেসে আমাকে বলছে, 'এই প্রথম একজন সন্ন্যাসীকে দেখলাম, যিনি প্র্যাক্টিক্যাল কোন কথা বলছেন। অন্য মহারাজদের জিজ্ঞেসস করলে বলবেন, মনকে শূন্য করে নাও।' আমারও হাসি পেল, আমি বললাম, 'ভাই আমার সন্ন্যাসী জীবনে আমি কোন মহারাজকে দেখলাম মনকে শূন্য করতে পেরেছেন'। মনকে শূন্য করে দাও, দেখবে সব জ্ঞান এসে যাবে; আপনার এসেছে কি? Impractical কথা সব। মনকে শূন্য করা যায় না। চিত্তবৃত্তি নিরোধ একমাত্র যোগীদের হয়। ফলে মনকে কোথাও না কোথাও থাকতে হবে। আর যে কাজ যত কঠিন হবে, সেই কাজ করতে গিয়ে আপনার মন তত বেশি কেন্দ্রিত হবে। যাঁরা উচ্চমানের, তাঁরাও যখন মনকে উচ্চ কোন চিন্তায় নিয়ে যান, তখন তাঁরা একটু শান্তিতে থাকেন। ঠাকুর অবতার হন আর যাই হন, তাঁর মনকেও কোথাও তো রাখতে হবে। আমার আপনার মত সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলে তিনি থাকতে পারবেন না; ওনার দরকার শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার।

হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নেতি' 'নেতি' করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা, তাঁকে লাভ করবার পর অনুলোম বিলোম। এই বলে তিনি সেই ঘোল আর মাখনের খুব প্রচলিত উদাহরণ দিয়ে বলছেন –**ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে, তখন বোধ হয় 'ঘোলেরই**

মাখন, মাখনেরই ঘোল।' তখন ঠিক বোধ হয়, তিনিই সব হয়েছেন। কোনখানে বেশি প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ।

ভাবসমুদ্র উথলালে ডাঙায় একবাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হয়। বন্যে এলে ডাঙায় একবাঁশ জল। তখন সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হল। আর ঘুরে যেতে হয় না। ধানকাটা হলে, আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে হয় না। সোজা একদিকে দিয়ে গেলেই হয়।

লাভের পর তাঁকে সবতাতেই দেখা যায়। ঈশ্বরজ্ঞান হয়ে গেলে কি হয়? এর উত্তর ভগবান অর্জুনকে দিচ্ছেন –*বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।* একবার আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে দেখেন, তিনিই সব কিছু হয়েছেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই। **মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণী ভক্তের ভিতর আবার বেশি প্রকাশ –যাদের কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করবার একেবারে ইচ্ছা নাই। (সকলে নিস্তব্ধ) সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তাহলে সে কিসে মন দাঁড় করাবে? তাই কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সত্ত্বগুণী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ দরকার হয়। না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে**। এনারাই হলেন সেই নরেন, রাখাল ও অন্যান্য ছোকরা ভক্তরা, এনারাই হলেন সেই বিরাট পাওয়ারফুল রানওয়ে যেখানে ঠাকুরের মত ব্যক্তিত্ব, বিশাল জেট বিমানের মত বড় বিমান সহজে অবতরণ করতে পারেন। অনুপযুক্ত রানওয়ে হলে প্লেন ক্র্যাশল্যাণ্ড করে যাবে। যার জন্য ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়ির ছাদে উঠে কাঁদতে হত, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, বিষয়ীদের সঙ্গে কথা বলে আমার মুখ জ্বলে যাচ্ছে।

পরের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কয়েকটি কথা বলে দিলে কিছু জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠাকুর এর আগে ব্যাখ্যা করলেন, সংসার কিভাবে শক্তির খেলা। ঠাকুর একই কথা এতবার বলছেন, তার কারণ আমাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক ও ধর্মের গূঢ় সত্যগুলি ধারণা করা খুব কঠিন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজনকে জানি, আর একজনকে তো আমি জানি যিনি আমাদের সমস্ত ক্লাশগুলো শুনেছেন। কিছু দিন পর আপনি যদি আবার সেই ক্লাশগুলো শোনেন, সবটাই আপনার নূতন মনে হবে। আসল জ্ঞান সব সময় ভিতর থেকে আসে। যতক্ষণ ওই জ্ঞান না আসছে, ততক্ষণ এই শব্দগুলো শব্দ মাত্র হয়ে থাকবে, আর কিছু দিন পরে শোনা জিনিসগুলো মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু জ্ঞান যেটা অর্জন করেছেন, সেটা কক্ষণ চলে যাবে না। এগুলো হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়, যাঁরা শাস্ত্র জানেন তাঁদের সাথে শাস্ত্রের বক্তব্য নিয়মিত আলোচনা করতে হয়; তার সাথে চিন্তন করতে হয়। যাঁদের এই কথাগুলো বলি, তাঁরা বলেন, আশেপাশে উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায় না, যার সাথে আলোচনা করব। সত্যিই এই সমস্যা সবারই হয়। তখন দ্বিতীয় সহজ উপায় হল, যা বুঝেছেন সেটাকে কাগজে লিখে রাখা। আপনার ভাবের মত যদি কাউকে না পাওয়া যায়, তখন নিজের সঙ্গে কথা বলুন। নিজের সঙ্গে কথা বলা মানে, কাগজে লেখা। এই কটি কথা বলে আমরা আবার কথামৃতে ফিরে আসছি। ঠাকুর কথা বলে যাচ্ছেন।

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন তাঁকে শক্তি বলি। প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী। পুরো জিনিসটা আপনারা নিশ্চয় জানেন, এতদিন শুনে শুনে নিশ্চয় আপনাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে। তবে বিষয়টা যখন এসে গেছে, তখন এর ব্যাখ্যা দরকার।

সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা অনেক মত দেখতে পাই। বিজ্ঞান এক রকম মত দেয়, বিভিন্ন ধর্ম তাঁদের মত করে মত দেন। এনারা কেউই ভুল বলছেন না। এটা কক্ষণ মনে করবেন না যে এ ভুল, সে ভুল। একটা সিস্টেম যেটা অনেক দিন ধরে চলছে; যেমন বিজ্ঞান, ওনাদের যে সিদ্ধান্তগুলো আছে, ওনারা সেখানে নিজের জায়গায় ঠিক আছেন। বাইবেল যেটা বলছেন, তাঁর মত ঠিক আছে। বেদ যেটা

বলছেন, তাঁর মত ঠিক আছে। তাঁর কারণ হল, যখনই আপনি সৃষ্টি তত্ত্বকে জানতে চাইছেন, মন দিয়েই জানার চেষ্টা করবেন, অথচ আপনি ভগবানকে মানছেন। যাঁরা ভগবানকে মানছেন না, তাঁদের জন্য এটা খুব সহজ। ভগবানকে যাঁরা মানেন না, তাঁদের জন্য জীবন খুব সহজ হয়ে যায়। আমার জন্ম হয়েছে, আমি একদিন মরে যাবো; আহার, নিদ্রা, মৈথুন করে, ক্ষমতা ভোগ করে চলে যাব, হয়ে গেলে সব শেষ; বিজ্ঞান এটাই শেখায়, পদার্থবাদ এটাই শেখায়, ভোগবাদ এটাই শেখায়, এটা তাই খুব সহজ।

আমাদের মত লোকেদের যাদের ঠাকুর-ঠুকুরে বিশ্বাস আছে, এদের প্রাণ যায়। এই একটা মত নিলাম, কদিন পর আর-একটা মত যেটা ভাল মনে হয় সেখানে ঢুকে গেলাম। শুধু একটি কথা ভাল করে মনে রাখা দরকার –মন পদার্থ জগৎকে জানতে পারে, ম্যাটারকে জানতে পারে, এনার্জিকে জানতে পারে, মন মনকে জানতে পারে। এই এনার্জি ওই শক্তি না, যেটা ঠাকুর এখানে বলছেন। এই এনার্জি হল, যেটা দিয়ে আমাদের জগৎ চলে। কিন্তু ঋষি, মুনি, আমাদের ধর্মগ্রন্থ, এনারা সবাই বলেন –সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে এসেছে। এনারা কেউই বলেন না, সৃষ্টি শুধুমাত্র পদার্থ থেকে আসছে; আশ্চর্য। নিন্দুকরা যাই বলুক, নিন্দুকের অভাবও নেই; ওরা বুঝতে চায় না শাস্ত্র কি বলছেন, বুঝতে না চাইলে কি আর করা যাবে। আমাদেরও মুশকিল আছে, ঠাকুর বলছেন, শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে। ফলে কি হয়, বালিকে ওরা গালাগাল দিতে গিয়ে চিনিকেও গালাগাল দিতে শুরু করে দেয়।

ভগবান থেকে সৃষ্টি; এর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত মত হল –তিনি ইচ্ছা করলেন আর সৃষ্টি হয়ে গেল। খুব সুন্দর ব্যাখ্যা, কোন সন্দেহ নেই। কারণ ঈশ্বরের মনকে আমরা কোন ভাবেই জানতে পারব না, ঈশ্বর আমাদের মনের জগতের বাইরে। তার সঙ্গে আর-একটি প্রচলিত মত, যেটা ভারতে বেশি ঘুরঘুর করে –চিজ্জড়গ্রন্থি, পুরুষ আর প্রকৃতি; পুরুষ হলেন চৈতন্য আর প্রকৃতি হল শক্তি। চৈতন্য আর শক্তি, এই দুই মিলে সৃষ্টি। আমি এক সময় প্রত্যেক বুধবার আইআইটি খড়্গপুরে যেতাম। সেখানে একবার পুরুষ ও প্রকৃতি এই জিনিসটাকে ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করে পুরো বুঝিয়ে দিলাম। রাত্রিবেলা ওখানকার একজন সিনিয়র প্রফেসার আমার ফোন নম্বর জোগার করে ফোন করে বললেন, ‘আপনারা সব সময় মেয়েদেরই দোষ দেন কেন’? আমি বললাম, ‘আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারলাম না’। ‘এই যে আপনি লেকচারে শুধু প্রকৃতি প্রকৃতি করে যাচ্ছিলেন’।

আপনাদের কাছে আমি সত্যি বলছি, প্রফেসরের কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। দু ঘন্টা আগে এত করে ব্যাখ্যা করে এলাম, প্রকৃতি মানে নারী নয়। তন্ত্র মত থেকে এটা ঢুকেছে –নারী পুরুষ, পুরুষ আর প্রকৃতি। যখন আমরা বেদান্তে বলি বা সাংখ্য যোগে বলি, সেখানে পরিষ্কার আমরা বলি, পুরুষ হলেন চৈতন্য সত্তা আর প্রকৃতি হল জড় সত্তা, যেখানে শক্তিও কাজ করছে। তার মানে যেটা স্থির ভাব, এটা হল পুরুষের, গতি যেটা, সেটা প্রকৃতি। মনে মনে তখন ভাবলাম, হে ভগবান, আইআইটির এত সিনিয়র প্রফেসর, এত করে বোঝালাম, তারপরেও এই ভুল; কিছু বলার নেই। এটা অনেক আগেকার কথা। তখন বুঝলাম, যতই আপনার ডিগ্রি থাকুক, যাই থাকুক, ধর্ম জিনিসটা পুরো আলাদা, ধর্মতত্ত্ব ধারণা করা খুব মুশকিল।

পুরুষ আর প্রকৃতির ব্যাপারটা ভারতবর্ষের সবারই মনে ভিতরে ঢুকে আছে। সৃষ্টি মানেই পুরুষ প্রকৃতি। তন্ত্রের মাধ্যমে এটাই নারী পুরুষের ধারণাতে এসে গেছে। কিন্তু ওদের মধ্যে এই ভাবটা এসেছে চীন থেকে, এই ভাব আমাদের নয়। যোগ মতে এই অর্থে বলেন না। রাজযোগে পরিষ্কার পুরুষ প্রকৃতিকে বলছেন চৈতন্য আর মনের জগৎ। যোগদর্শন পরিষ্কার বলবেন, পুরুষ এক স্বাধীন সত্তা আর প্রকৃতি এক স্বাধীন সত্তা। দুটো আলাদা স্বাধীন সত্তা হওয়ার ফলে কি হয়, অনেকগুলো সমস্যা সেখানে এসে যায়। এই দুটো সত্তার মিলন হয় কি করে? আর একবার যদি পুরুষ স্বাধীন সত্তা হয়ে যায়, সে তো আবার একদিন কয়েদী হয়ে যাবে। স্বাভাবিক, প্রকৃতি যেহেতু স্বাধীন কিনা। সাংখ্য ও যোগের কাছে এগুলোর ঠিক ঠিক কোন উত্তর নেই।

কিন্তু এই জিনিসটাকে বেদান্ত খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভগবান গীতাতে পরিষ্কার বলছেন –যে কোন জীবের ভিতরে পুরুষ আর প্রকৃতি আমিই। যিনি ভগবান, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তিনিই পুরুষ হয়ে দেখান, তিনিই প্রকৃতি হয়ে দেখান। তার মানে পুরুষ-প্রকৃতির যে খেলা, যেটা সাংখ্য বলছেন, যোগ বলছেন, তন্ত্র বলছেন, শক্তি মত বলছেন; আসলে সবটাই ভগবান। যখন নিষ্ক্রিয়, যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কিছু নেই; তিনিই আছেন। যেমনি তিনি ইচ্ছা করেন; এই কথা শোনা মাত্র অনেকের কাছ থেকে ওই এক প্রশ্ন আসবে, কেন তিনি ইচ্ছা করেন? কেউ জানে না কেন ইচ্ছা করেন। ভগবানের মনকে কে জানবে? এই ইচ্ছাটাই হল ঈশ্বরীয় শক্তি। যাঁরা প্রথম শুনছেন, যাঁদের ধারণা পরিষ্কার নেই, আপনারা যদি এই কথাটা ভাল করে বুঝে নেন –ভগবান ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক; এই ইচ্ছাটাই হল শক্তি। সৃষ্টির পিছনে যে শক্তি, সেটা এই ইচ্ছাটাই। এই ইচ্ছা তো আমাদের সাধারণ কোন মানুষের ইচ্ছা নয়। যখন শিব-শক্তি বলা হয় বা শিব-পার্বতী বলা হয়, এটা সেই।

পোটেনশিয়াল ও কাইনেটিক –পোটেনশিয়াল হল পুরো জিনিসটা যখন এক হয়ে আছে। কাইনেটিক –চলতে শুরু করল। অনন্ত সমুদ্রে বিভিন্ন কারণে ঢেউ ওঠে –এই যে ঢেউ উঠল এটা গতিমান আর অন্যটা শান্ত সমুদ্র শান্ত। আপনি বলবেন, এনার্জি আছে বলেই তো ঢেউ চলছে। আপনি ঠিক ধরেছেন। যেকোন ধরণের এনার্জি, যে কোন ধরণের ডিস্টার্বেন্স, পৃথিবী, গ্রহ, তারা যে গতিমান; তা যে ভাবেই হোক; এখানে এটাই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বর আমাদের মত নন, তার মানে সমুদ্র ইচ্ছা করল ঢেউ হোক। আপনি বলবেন, সমুদ্রের মনে ইচ্ছা উদয় হওয়া, এটা মিলল না তো। আপনাকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। প্রথম কথা সমুদ্র ইচ্ছা করতেই পারবে না, দ্বিতীয় কথা সমুদ্র ইচ্ছা করলেই সমুদ্রে ঢেউ উঠবে না। ঢেউ ওঠার জন্য সেখানে ফিজিক্যাল এনার্জি লাগবে; তা লাগুক। কিন্তু আপনি যদি এটা বুঝে নেন –চৈতন্য সত্তার ইচ্ছাটাই শক্তি; তিনি যে ইচ্ছা করেন, সেটাই শক্তি। সঙ্গে সঙ্গে জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল। এই যে শক্তি, এটাকেই প্রকৃতি বলা হয়, এটাকেই কালী বলা হয়, এটাকেই দূর্গা, পার্বতী বলা হয়, এটাকেই শক্তি বলা হয়।

সৃষ্টির পিছনে যে শক্তি, এই শক্তি কোথা থেকে এলো? ঈশ্বরের ইচ্ছা (Will of God)। Will of God কি? One with God, ঈশ্বর আর ঈশ্বরের ইচ্ছা তো আলাদা হতে পারে না। এখন আপনি এক দেখছেন, না দুই দেখছেন? শিব-শক্তি দুই দেখছেন, না এক দেখছেন? সব ভক্তরা তো কথা বলার সময় বলেন, ঠাকুর আর শ্রীমা এক, কিন্তু এক দেখেন কি? দেখেন না, দেখতে পারবেনও না। কেন? কারণ আপনি মনের জগতের লোক। মনের জগতে থাকলে আপনি শিব আর শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি, দুই দেখবেন। ঠাকুর হলেন, সীমা কে বিচ্ অসীম দেশ কা কোন দেবতা আয়া রে। ঠাকুর হলেন, অসীম দেশের এক অতিথি, তিনি এসে বলছেন –ঠিকই দেখছ, চৈতন্য আর শক্তিকে যে দেখছ ঠিকই দেখছ। কিন্তু জেনে নাও, চৈতন্যই হলেন শক্তি। শিব আর শক্তিকে দেখছ, কোন ভুল নেই, শুধু জেনে নাও, যিনি শিব তিনিই শক্তি হয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টিতে তিনি যখন আছেন, মনের সাম্রাজ্যে যখন তিনি আছেন, তিনি দুই হয়ে দেখাবেন। বাস্তবে তিনি এক, কিন্তু দুই হয়ে দেখান।

এটা অত্যন্ত মূল্যবান, একবার যদি বুঝে যান Will of God আর God এক, শিব আর শক্তি এক, পুরুষ আর প্রকৃতি এক; জীবনের অনেক অশান্তি জীবন থেকে মিটে যাবে। কারণ তখন আপনি জানবেন; আপনি যে কাজগুলো করছেন, সব কাজের পিছনে যে শক্তি, এটা হল জগন্মাতার যে শক্তি, মাতৃশক্তি যেটা, এই শক্তি সেটার অংশ। জগন্মাতা ভগবানেরই রূপ। সবটাই তাঁর ইচ্ছা। আপনি যা কিছু করছেন, আপনি হাত নাড়ালেন, গাছের যে পাতা নড়ছে, সব ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। কিন্তু আমরা দুই বই এক মানতে পারিনা, জানতে পারিনা; সেইজন্য জীবনে আমাদের এত কষ্ট, এত সমস্যা।

এই যে বলছেন, পুরুষ আর প্রকৃতি; যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আমি জানি আপনাদের এখন আর এই নিয়ে কোন প্রশ্ন হবে না, কারণ এর আগে অনেকবার এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে। প্রথম কথা, পুরুষ আর প্রকৃতি এক। পুরুষ অর্থাৎ যিনি চৈতন্য, তিনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক,

সৃষ্টি এসে গেল। ঈশ্বর আর তাঁর ইচ্ছা এক। এই জগতে যাবতীয় যা কিছু চলছে, চলছে প্রকৃতির দরুন, কিন্তু আসলে সবই হল চৈতন্য। চৈতন্য হল, যেখানে কোন চাঞ্চল্য নেই, কোন গতি নেই। মনের দিক থেকে যখন দেখি, তখন এই ইচ্ছাকে আমরা আলাদা করেই দেখি।

যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে, তার মা জ্ঞানও আছে। (কেশবের হাস্য)

চৈতন্যের জ্ঞান যদি আপনার থাকে, অর্থাৎ পুরুষের জ্ঞান থাকলে প্রকৃতির জ্ঞানও আপনার থাকবে। প্রকৃতির জ্ঞান যদি আপনার থাকে, ঈশ্বরের শক্তির জ্ঞানও আপনার থাকবে। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান যদি আপনার থাকে, শ্রীমতি রাধারও জ্ঞান আপনার থাকবে। গুজরাতের দিকে অবশ্য ওরা রুক্মিণীকে বেশি মানে। শ্রীরামের জ্ঞান যদি আপনার থাকে, সীতার জ্ঞানও আপনার থাকবে। ঠাকুরের জ্ঞান থাকলে শ্রীমারও জ্ঞান আপনার থাকবে। থাকতে বাধ্য, কারণ আপনি মনের জগতে বাস করছেন। কারণ মনের জগতে তিনি আর তাঁর ইচ্ছা আলাদা রূপে দেখায়। সমুদ্রে যখন ঢেউ উঠল, তখন আপনি হয় সমুদ্র দেখবেন, নয় ঢেউ দেখবেন। যার সমুদ্রের জ্ঞান আছে তার ঢেউএর জ্ঞানও আছে। এই কারণেই বলা হয় –আত্মাকে জানা যায় না, আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া যায়। আত্মাকে জানলে অনাত্মাকেও আপনি জানবেন। ঈশ্বরকে জানলে শক্তিকেও জানবেন, স্বাভাবিক। তোমার যদি মনে হয় শক্তি আছে, ক্রিয়া শক্তি আছে, তাহলে জানবে এটা চৈতন্যেরই রূপ।

ঠাকুর একটা সহজ কথা দিয়ে পুরো ধর্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে দিলেন। এই যে আমি হাত নাড়ছি, আমি বুঝতে পারছি; তার মানে হাত নাড়ার পিছনে শক্তি আছে। এই ক্রিয়া শক্তির ধাপে ধাপে যদি যাওয়া যায়, তখন শেষে দেখবো সব শক্তি প্রকৃতি থেকে আসে। প্রকৃতির বোধ আছে বলে আপনাকে পুরুষের বোধও রাখতে হবে। কেন রাখতে হবে? কারণ আমি বলছি, আমি হাত নাড়ছি; এখানে ‘আমি’টাও এসে যাচ্ছে। এই ‘আমি’টাই চৈতন্য। এই যে পুরুষ আর প্রকৃতি এসে গেল, ঠাকুর বলছেন, দুটো এক। চৈতন্যের বোধ থাকলে শক্তির বোধ থাকবে, শক্তির বোধ থাকলে চৈতন্যের বোধ থাকবে; শুধু এইটুকু জেনে নেওয়া যে, দুটো এক। ঠাকুর বোঝাবার জন্য এখানে বাবা আর মায়ের কথা বলছেন।

যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে, তার দিন জ্ঞানও আছে। যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে। তুমি ওটা বুঝেছ?

অধ্যাত্ম রামায়ণে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন –শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে আমরা অজ্ঞানের কল্পনাও করতে পারিনা। যেমন সূর্যলোকের বাসিন্দা অন্ধকারকে জানে না, সেইজন্য তার কাছে দিন ও রাতের কোন ধারণাই নেই। যারা পৃথিবীলোকের বাসিন্দা, আমরা জন্ম-মৃত্যু জানি, পাপ-পূণ্য জানি, দিন-রাত জানি, সুখ-দুঃখ জানি। সূর্যলোকের বাসিন্দা রাত জানে না, ফলে দিনও জানবে না। দ্বন্দ্ব, দুই বোধ, দ্বৈত ভাব কি –যার এক বোধ আছে তার দুই বোধ থাকবে। অদ্বৈত মানে এক নয়, এক দুইয়ের পারে; এই জিনিসটা আমরা অনেকবার ব্যাখ্যা করেছি। যেমনি এক এসে যাবে, তেমনি ওটা দুই হয়ে যাবে। ভগবান যদি এক হন, তাহলে ভগবান দুইও হবেন। ভগবান যদি এক হন, তাহলে প্রকৃতিও এসে যাবে। এই যে বলা হয় পুরুষ আর প্রকৃতি এক, এটা বোঝানর জন্য বলছেন, যখন তুমি ধ্যানের গভীরে গিয়ে জ্ঞানলাভ করবে তখন তুমি জানবে পুরুষ আর প্রকৃতি এক; তার আগে পুরুষ প্রকৃতি আলাদা থাকবে। ঈশ্বর আর জগৎ সব সময় আলাদা থাকবে। বাইবেলে যে রকম বলছেন, ঈশ্বর আর জগৎ আলাদা; স্বাভাবিক ভাবেই আলাদা হয়ে যাবে।

আসলে দুটো আলাদা নয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এই জিনিসগুলিকে ধারণা করা মুশকিল। আমাদের কাজ হল ব্যাখ্যা করা, তাই ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি। এরপর আপনার যত ধ্যান-জপ, যতটা তপস্যা করা আছে; যতটা আপনার উপর ঠাকুরের কৃপা আছে, ততটা ধারণা করবেন। তাড়াহুড়োর কিছু

নেই, হাজার হাজার জন্ম পেরিয়ে এসেছেন, আরও কত হাজার হাজার জন্ম পেরোতে হবে জানা নেই, এক জন্মে না হলে আর এক জন্মে হবে, সেই জন্মে না হলে আরও জন্ম হবে, আরও সুযোগ আসবে। কোন এক জন্মে হয়ত ঠিক ঠিক আচার্য পেয়ে গেলেন, তখন সেই আচার্যের সান্নিধ্যে শিক্ষা লাভে জ্ঞানের উন্মেষ হয়ে যাবে। এখন তাই শুধু মন দিয়ে শুনে যান, তাতেই অনেক হবে।

কেশব (সহাস্যে) –হাঁ বুঝেছি।

এক জ্ঞান যদিও হয়, দুই থাকবেই। শুধু দুই থাকে না; বাবা-মা থাকলে পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি সব এসে যাবে। দিন-রাত থাকলে ভোরবেলা হবে, সকালবেলা হবে, অপরাহ্ন হবে, বিকাল হবে, সন্ধ্যা হবে, দশটা বাজবে, এগারোটা বাজবে; লাইন দিয়ে এক-এক করে সব এসে যাবে। কারণ আপনি এক-কে জানেন। যদি ঈশ্বরকে জানেন, তার মানে আপনি এককে জানলেন। ঈশ্বরকে জানলে শক্তিকেও জানবেন, শক্তি জানলে সৃষ্টি আসবে, সৃষ্টি এলে দিন-রাত আসবে, সুখ-দুঃখ আসবে; মাঝখানে সবটাই থাকবে। উদ্দেশ্য শুধু ঈশ্বরকে জানা নয়, উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এইসব কথা শুনে আপনারা অনেকেই চার-পাঁচটা কোটেশান নিয়ে আসবেন, ঠাকুর কি বলেছেন, স্বামীজী কি বলেছেন ইত্যাদি। এখন আমার কথা শুনছেন আমারটাই শুনুন; শুধু এতটুকু বলতে পারি, ভুলভাল কিছু বলছি না, সংশয়াত্মক কিছু বলিনা। এইটুকু শ্রদ্ধা রাখুন, অনেক কিছু হবে।

এক জ্ঞানটাও জ্ঞান, এক জ্ঞান যাঁর আছে তিনিও জ্ঞানী; ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। কারণ জ্ঞানী এক জানে, এক জানলে দুই, তিন, চার, পাঁচ সব এসে যাবে, এটা থামার জিনিস না। একটা পাপকর্ম করলে ওখানেই পাপকর্ম থেমে যাবে না, পাপকর্ম চলতেই থাকবে। আমি প্রায়ই এই কথা বলি –আমাদের হিন্দু ধর্মে এক বলে কিছু নেই; আমাদের এখানে ধর্মে দুই থেকে গণনা শুরু হয়। এখানে শূন্য বলে কিছু নেই, এক বলে কিছু নেই; হয় সব কিছুর পারে অদ্বৈত আর তা নাহলে দুই, দ্বৈতবাদ। রামানুজ মাঝখানে নিয়ে এলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; উনি খুব উচ্চমানের ঋষি; কিন্তু ঋষি হলেই যে তাঁর সবটাই যে বুঝতে পারব বা বুঝতে হবে, তাতো সম্ভব না, আর সে-রকম কিছু না।

কেশবচন্দ্র বলছেন, 'হাঁ বুঝেছি'। শুধু শব্দ দিয়ে তো সব মেলানো যায় না। ঠাকুরের উপস্থিতি মাত্রে যে কারুর চেতনার স্তর উপরে উঠে যাবে। এই যেমন আপনারা এখন ইউটিউবে অনলাইনে শুনছেন, আবার অফলাইনে আমাদের ক্লাশগুলো হয়, সেখানে সামনে বসে যদি শোনেন, তখন জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যাবে। কারণ ওখানে আরও দশজন যাঁরা শুনছেন, তাঁদের চিন্তা-ভাবনার স্তরে মিল হচ্ছে বলে চেতনার স্তরটা একটু উপরে উঠে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –মা –কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। প্রচলিত ধারায় আমরা জানি যে, এটা শক্তি, মায়া; কিন্তু আসলে তো সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা। নাসদীয় সূক্তে বলছেন –*কামস্তদগ্রে আসীদ্‌*। তিনি ইচ্ছা করলেন –আমি এক আমি বহু হব। যেমনি তিনি ইচ্ছা করলেন বা বাইবেলে বলছেন God will –শক্তি রূপে দেখাচ্ছেন। ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি কখনই আলাদা না।

যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন। আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ –যে যা চায়, তাই দেন। মা কি দেন? যে যা চায়, মা তাই দেন। আমি নিশ্চিত যে ঠাকুরের এই কথার সাথে আপনারা অনেকেই একমত হবেন না। কারণ যার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বাড়িতে পাঁচজন কাজের লোক আছে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, ব্ল্যাক মানি আছে, হোয়াইট মানি, ইয়েলো মানি, সব রকম মানি আছে, টি-পার্টি আছে, ওয়াইন পার্টি, ডিনার পার্টি আছে, এরা কি কখন আমাদের এই ব্যাখ্যাগুলো শুনতে যাবেন? কেন শুনতে যাবেন বলুন তো? বয়ে গেছে তাদের শুনতে। কারা আমাদের ব্যাখ্যাগুলো শোনেন? কোথাও হয়ত কিছু কামনা থেকে গেছে, কোথাও হয়ত কিছু অভাব বোধ থেকে গেছে। আপনি হয়ত বলবেন, ধর্মভাব এসেছে। ধর্মভাব এমনি হয় না; জগৎ থেকে প্রচুর আঘাত পেয়ে পেয়ে জগতের প্রতি বিরক্তি ভাব না এলে ধর্মভাব আসবে না। এই কথা শুনে

আপনি যদি পিছনের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন একটা লম্বা তালিকা তৈরী হয়ে গেছে; জীবনে কি কি পেলাম না।

ঠাকুরের কথাকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন, সন্দেহ করেন, তাহলে শাস্ত্র আপনি কোন দিন শিখতে পারবেন না। শাস্ত্র শিখতে এসে যদি আপনি শাস্ত্রকেই সন্দেহ করেন, তাহলে শাস্ত্র কি করে শিখবেন? অর্থাৎ ঠাকুরের কোন কথাকে সন্দেহ করা যাবে না। সেইজন্য যে যা চায়, তিনি তাকে তাই দেন, এই কথাকেও সন্দেহ করা যাবে না। তিনি জগজ্জননী, তিনি আদি শক্তি, ঠাকুর বলছেন আদ্যাশক্তি; তিনি ঈশ্বরেরই প্রকৃতি, ঈশ্বরেরই রূপ তিনি; প্রত্যেক মানুষের ভিতরে তার যে প্রকৃতি, তিনি প্রত্যেকের ভিতর তার সেই প্রকৃতি রূপে অর্থাৎ তার স্বভাব রূপে বিরাজমান; কি সাংঘাতিক ক্ষমতা তাঁর কল্পনা করা যাবে না। যে যা চাইবে, একটা তুড়ি দেবেন, বল বাপু কি চাও, এই নাও তোমার কাঙ্ক্ষিত জিনিস। জানি, আপনারা একমত হবে না, আর না হয় বলবেন, ঠিক আছে ঠাকুর যখন বলেছেন মেনে নিলাম; কিন্তু হৃদয় থেকে মানতে পারলাম না। হৃদয় থেকে যদি না মেনে নিতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে, হয়ত ঠাকুর ভুল বলেছেন।

কিন্তু ঠাকুর একটুও ভুল বলেননি; কারণ ঠাকুরের একটা কথা যদি ভুল হয় তাহলে ঠাকুরের সব কথাই ভুল হবে। আসলে মানুষ কি চায়? পরিষ্কার এখানে বলছেন –ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। পরীক্ষার আগে সব বাচ্চারাই ঠাকুর দেবতার কাছে খুব করে প্রার্থনা করে –হে ঠাকুর, যেন ভাল নম্বর পাই। আমিও ছোটবেলা তাই করতাম। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার পর দেখতাম, ভাল নম্বর দূরে থাক, কোন রকমে হয়ত পাশ মার্ক এসেছে। একবার তো বায়োলজিতে পঞ্চাশে মাইনাস টু পেয়েছিলাম। আঁকার পরীক্ষায় একবারই শুধু পঁচিশে সবচেয়ে বেশি দুই পেয়েছিলাম, বাকি সব পরীক্ষায় শূন্য। অথচ শুদ্ধ মন নিয়ে কত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করতাম। কম বয়সে অত শুদ্ধ হৃদয় ঠাকুর আর কোথায় পাবেন। তাহলে কেন ঠাকুর দিলেন না? বা আপনাকেই বা কেন দিচ্ছেন না। তার কারণ, ওটা আসলে আমাদের ইচ্ছা নয়।

আপনারা বলবেন, আপনি এ কি কথা বলছেন? আপনি দুটো টাকা চাইছেন, ঠিকই আপনি দুটো টাকা চাইছেন, শুনে তাই মনে হয়। কিন্তু আপনি যদি ভাল করে ভিতরে গিয়ে দেখেন, দেখবেন total mass of confusion। যেমন, ছোটবেলা থেকে আমি প্রচুর বই পড়তাম। এখন ঠিক পরীক্ষার সময় এসে গেল, ঠাকুরকে গিয়ে যেমনি বললাম, ঠাকুর পরীক্ষায় যেন নম্বর ভাল হয়। ঠিক আছে পরীক্ষাটা দিয়ে এসো, তোমার জন্য একটা ভাল বই রাখা আছে পড়ার জন্য। তারপর পরীক্ষা শেষ হলেই দৌড়ে গিয়ে বইটা পড়তে শুরু করতাম; বাস্তবে আমি তাই করতাম। তার মানে আমার বাস্তব ইচ্ছাটা হল –গল্পের বই পড়া। ঠাকুর ঠিক ওটাই দেবেন। আপনি খালি উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। একজন লোক ধামা করে খই নিয়ে যাচ্ছে বাজারে বিক্রি করার জন্য। এখন কিছু খই হাওয়াতে উড়ে যাচ্ছে। কি আর করবে, কিছু খই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; তখন সে বলছে –উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। সবটা তো দেওয়া যাবে না, প্রসাদ হয়ে যাবে তাহলে। ভগবান এভাবে দেন না।

জর্জ বার্ণাড 'শ, খুব নামকরা ইংলিশ লেখক, তাঁর একটা খুব নামকরা নাটক আছে, পিগম্যালিয়ান্, খুব সুন্দর মজার নাটক। ইংলিশে এই নাটকের খুব সুন্দর সিনেমা বানিয়েছিলেন –মাই ফেয়ারল্যাডি। যদিও মূল বইটা আরও ভাল। সেখানে পিগম্যালিয়ান নামে একজন আছে, যে ফুল বিক্রি করে। তার বাবা গরীব লোক, আবার মাতাল। কিন্তু ওটাই সে ভালবাসে। ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, ভদ্রলোক তার কথা কোথায় এদিক সেদিক লিখেছে, কিভাবে কিভাবে তার খবর ছড়িয়ে গেছে। ওকে এখন কোথায় সম্বর্ধনার জন্য ইনভাইট করেছে। সেই লোকটি এখন এসে চেঁচামেচি করছে –এই দেখুন আমার কথা এদিক সেদিক লিখে আমার জীবন সর্বনাশ করে দিলেন। এখন আমাকে স্যুটবুট পরতে হবে, ভদ্রলোক সেজে যেতে হবে।

আপনার হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরতম আকাঙ্খায় যাবেন, আপনি দেখবেন সেখানে বেশির ভাগ লোকই কনফিউসড। স্কুল লাইফে বই পড়তে বসলে, এই ফিজিক্সের বই খুলে বসলাম, পাঁচ মিনিট পর কেমেস্ট্রির বই, তারও পাঁচ মিনিট পর ম্যাথসের বই, পর পর সাবজেক্ট পাল্টে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি সব সাবজেক্টে মাস্টারি কখন হয় নাকি? সকালে আপনার একটা ইচ্ছা, দুপুরে আর-একটা ইচ্ছা, বিকালে আর-একটা ইচ্ছা; এভাবে হয় না। ওই ইচ্ছাটা যদি ঠিক ঠিক থাকে; ওই ইচ্ছাটাই থাকবে; জাগ্রত অবস্থায় ওটাই থাকবে, স্বপ্নাবস্থায় ওটাই থাকবে; প্রত্যেক মন্দিরে ওটাই থাকবে। আর ঠাকুর এখানে বলছেন –ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আপনি বলবেন, আমার ছেলের যেন চাকরি হয়ে যায়; এটা তো সরাসরি ওখানে পড়ছে না। কাজ করছেন আপনি এক রকম, প্রার্থনা করছেন আর-এক রকম; স্বাভাবিক ভাবেই সেটা আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে আসছে না। তার মানে আপনার ভিতরে যে প্রকৃত ইচ্ছাটা ঠিক করা আছে, ওই জায়গাতে কনফিউসান।

বাচ্চাদের একটা হাসির চুটকি আছে। সব ধর্মের একটা কম্পিটিশান হচ্ছে। সবাই একটা উঁচু বাড়ি থেকে ঝাঁপ মারছে, আর তার ইষ্ট এসে তাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছেন। একজন হিন্দু, সেও ঝাঁপ মেরেছে; কিন্তু সে মারা গেল। মারা যাওয়ার পর ভগবানের কাছে পৌঁছেছে। ভগবানকে বেচারা বলছে, 'আমি এত বিশ্বাস করে আপনাকে ডাকলাম আপনি এসে আমাকে বাঁচালেন না'? 'কি বলছ তুমি? তুমি বললে, হে রাম বাঁচাও; আমিও তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে ধনুর্বান নিয়ে তৈরী হয়ে এলাম; ততক্ষণে তুমি বলতে লাগলে, হে হনুমানজী বাঁচাও; আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে সব কিছু রেখে গদাটা নিয়ে দৌড়ালাম। এসে দেখছি, তুমি বলছ, মা সীতা বাঁচাও; এই শাড়িটা পড়তে গিয়েই আমার দেরী হয়ে গেল'। অত্যন্ত থার্ড গ্রেড জোক, আমিও মানছি; কিন্তু আইডিয়াটা এক।

আপনি আসলে কি চাইছেন, নিজেই বুঝতে পারছেন না। এই বলছেন টাকা দরকার, এই বলছেন মোক্ষ দরকার, এই বলছেন ধর্ম দরকার। ঠাকুর যিনি চৈতন্যস্বরূপ, সমস্ত বুদ্ধিকে যিনি চেতনা দিচ্ছেন; তিনিও যদি আপনার হৃদয়ে ঢুকে বলেন, বল কি চাও তুমি, উনিও কনফিউজড হয়ে যাবেন, আপনি কি চান। কিন্তু যে সত্যিকারের জগন্মাতার ভক্ত, যে সত্যি চাইছে। খুব নামকরা ঘটনা আপনারা সবাই জানেন, স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ, তাঁর পরিবারের তখন খাবার পয়সা নেই। ঠাকুর সব জানার পর বললেন, আজ শনিবার, যা মা কালীর মন্দিরে গিয়ে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা কর। স্বামীজী লজ্জায় বলতে পারলেন না, গান করছেন আর বলছেন, মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। স্বামীজী খাওয়া-পরার অভাব দূর করার কথা বলতে পারলেন না। ঠাকুর তাঁকে তিনবার পাঠালেন, তিন বারই লজ্জায় ওসব চাইতে পারলেন না।

আমি আপনি হলে কি করতাম? ঠাকুর এই দাও, সেই দাও, ওটা চাই, সেটা চাই। আমাদের ভিতরটা সম্পূর্ণ সংশয়ে আচ্ছাদিত; মাতালের কথার মত, বাইয়ের রোগীর মত কথা। কিন্তু সত্যিকারের যে জিনিসটা আপনি চাইছেন, যে চাওয়ার পিছনে কোন রকম বিচলিত ভাব নেই আর দীর্ঘদিন ধরে ওই চাওয়াটাকে ধরে আছেন; জগন্মাতা ওইটা আপনাকে দেবেনই দেবেন। ঠাকুর বাচ্চা ও চুসনির গল্প বলছেন। বাচ্চা যখন মায়ের জন্য কাঁদে তখন তাকে এটা ওটা দিয়ে ভোলানো যায়, কিন্তু একটা অবস্থার পরে বাচ্চাকে যেটাই দিতে যাবেন সেটাই ছুড়ে ফেলে দেবে। আপনার যদি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাওয়াটাই মূল হয়, জগন্মাতা সেটা দেবেনই দেবেন। তিনি যে আপন মা, নিজের মা, সত্যিকারের মা। আমরা কি চাইছি একটু বিচার করে দেখুন। যেটা চাইছেন, ওইটা ছাড়া যেন অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকে, আর ওই চিন্তাটা যেন দীর্ঘদিন ধরে থাকে। আর আপনার মন, বাণী, কর্ম এই তিনটে যেন একই থাকে; তবেই না ওটা হবে ইচ্ছা।

ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, বেড়ায়; অত শত জানে না। ঠাকুর এই উদাহরণ অনেকবার দিয়েছেন। মা জানে তার ছোট বাচ্চা কি চায়, মাও ঠিক সেটাই দেন।

কেশব –আজ্ঞে হাঁ।

দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হল। একটা হল সৃষ্টিতত্ত্বকে নিয়ে, যেখানে পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বিস্তারে বলা হল। দ্বিতীয়, আমরা সবাই জগন্মাতার সন্তান, সন্তানরা যে যা চায় মা তাকে তাই দেন। সমস্যা হল আমরা প্রায়ই যেটা বলি, এটা চাই; আসলে আমরা সেটা চাই না। আমার চাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আলস্য; বেশির ভাগ মানুষ আলস্য চায়। এরপর অষ্টম পরিচ্ছেদ শুরু।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা –পূর্বকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে প্রকৃতস্থ হইয়াছেন। কেশবের সহিত সহাস্যে কথা কহিতেছেন। একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক্ যে "তুমি কেমন আছ" ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা।

বিষয়ী লোকেরা শুধু শরীর আর ভোগের বিষয়ের মধ্যেই বিচরণ করে। একজন দেখা করতে এসেছিলেন; এটা সেটা কথা হতে আমি বললাম, 'দেখুন, কি দুরবস্থা আপনাদের, যোগকে আপনারা ভোগে নামিয়ে দিয়েছেন। যোগ করুন শরীর ভাল থাকবে, যোগ করুন পেট ভাল থাকবে; আর 'যোগ' তো বলবে না 'যোগা' বলে। যাঁরা ঠিক ঠিক একটা বিষয়ের মধ্যে ডুবে আছেন, তারা এইসব কথা, কেমন আছেন, ওর খবর কি, এর অবস্থা এখন কেমন; এই খোশখবরের খোঁজ করেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) –ব্রহ্মজ্ঞানীরা অত মহিমা-বর্ণন করে কেন? "হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ!" এ-সব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখে তারিফ করে। বাবুকে দেখতে চায় কজন। বাগান বড় না বাবু বড়? স্বাভাবিক ভাবেই আপনি বলবেন, বাগান বড়। কারণ তারপরেই ঠাকুর বলছেন –

মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে, তার হিসাবে আমার কি দরকার? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়।

আপনি অন্য ভাবে প্রশ্ন করতে পারেন, আমি মদ কিনতে গেছি, এই মদ কে বানায়, এই মদের দোকানের মালিক কে; ইত্যাদি খোঁজ নিয়ে আমার কি হবে? বাগানে আমি সুখ ভোগ করতে এসেছি, এই বাগান কার জেনে আমার কি দরকার? আপনার প্রশ্ন পুরো বৈধ প্রশ্ন। আমি সংসারে সুখ পেতে এসেছি, সংসারের অতশত জেনে আমার কি হবে। আমি চাকরি চাইছি, আমি গাড়ি-বাড়ি চাইছি, এই সংসারের স্রষ্টা কে, কেন সংসার সৃষ্টি করল, অতশত জেনে আমার কি হবে। কিন্তু এখানে ঠাকুর কথা বলছেন কেশবে সেনের সাথে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে ঠাকুর এই কথা বলছেন।

ঠাকুর আসলে কেশব সেন আর তাঁর অনুগামীদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন। এই কথাটা ঠাকুর তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, সাধারণ লোকেদের উদ্দেশ্যে নয়। যদি আপনি নিজেকে মহাত্মা বলেন, যদি নিজেকে সন্ত মনে করেন আর যদি বলেন আমি মানব জাতিকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যেতে চাইছি, তাহলে ঐশ্বর্যের এত বর্ণনা করা কি দরকার –হে ঠাকুর, তুমি কলকাতার মত শহর করিয়াছ, কলকাতায় ট্রাম করিয়াছ, দোতালা বাস করিয়াছ; আর আমি তোমাকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া রাখিয়াছি; এত বর্ণনা করার তাহলে কি দরকার, পরিষ্কার সরাসরি ওইদিকেই যান। আর আপনি বলছেন, আমি ওইটার জন্যই আছি। সাধারণ লোক যারা আহার, নিদ্রা, মৈথুনের বাইরে কিছুই জানে না; ওটা তাদের জন্য, তারা যা করার করুক না। আপনি যেখানে নিজেকে বিশেষ মনে করেন, নিজেকে আচার্য মনে করেন; তাহলে আপনি ওই ভুলটা কেন করছেন? ঠাকুর যেটা কেশব

সেনকে বলছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ওইটাই। ঈশ্বরকে জানাই যখন আপনার উদ্দেশ্য তখন ওইদিকে যাচ্ছেন কেন?

নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি না, 'তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি? ঠিক ঠিক সম্পর্ক যেখানে, সেখানে এইসব জিজ্ঞেস করে না।

কেশব সেন অসুস্থ, জীবনের শেষের দিকে চলে এসেছেন। ঠাকুর অসুস্থ কেশব সেনকে দেখতে এসেছেন। আমাদের ভিতরে যা আছে সেটাই আমাদের কথাবার্তায়, আচরণে বেরিয়ে আসবে; ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুরই উঠবে। প্রসঙ্গটা হল –সবাই বাবুর বাগান দেখতে চায়, বাবুকে কে আর দেখতে চায়। এখানে ঠাকুর মানুষের ঐশ্বর্য আর সেখানে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যে বিমুখিতা; খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন। ধর্ম সাহিত্যের জগতে কথামৃত এক অদ্ভুত গ্রন্থ। ইদানিং কালে হিন্দু ধর্ম নিয়ে যাঁরাই কথা বলেন, তাঁরা যে কত আলতুফালতু কথা বলেন, নিজেরাই বুঝতে পারেন না। বেশির ভাগ বক্তা সবেতেই ভক্তি নিয়ে বলেন; বাচ্চা বয়সে যেগুলো শিখেছেন সেগুলোকে নিয়েই বলে যাচ্ছেন। এনাদের মধ্যে কজন শাস্ত্র পড়েন বা পড়েছেন, ভগবান জানেন। আমাকে সেদিন একজন বললেন, ইদানিং কালে যোগ, বেদান্ত নিয়ে কেউ একটু কিছু বললে বক্তা ফেমাস হয়ে যান। এগুলো দিয়েই বোঝা যায় ধর্ম নিয়ে আমাদের সাধারণ ধারণাগুলো কত ভুলভ্রান্তিতে ভরা, এইজন্য দরকার অবতার পুরুষের। কারণ অবতার যখন আসেন, তিনি তখন এই ভুলভ্রান্তিগুলো ঠিক করে দেন।

ঈশ্বর বলতে মানুষ কি বোঝে? আপনি যা, তারই অনেক বেশি গুণ যদি বাড়িয়ে দেন, আর সেটাকে এক দৈবী ভাবে দেখলে সেটাই হয়ে যাবে ঈশ্বর। বাচ্চা মন ওই রকমই মনে করে। সংসারে যে হাবুডুবু খাচ্ছে, ঈশ্বরকে সে সেই রকমই দেখে। এখানে দুটো আলাদা জিনিস। ঈশ্বরের কাছে আপনি একটা প্রার্থনা করলেন; ঠাকুরও যেমন কেশবের জন্য ডাবচিনি মানত করেছিলেন। এই প্রার্থনাটা আলাদা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাপারে যে ধারণা, সেটাই যদি এলেমেলো হয়ে যায়, কোথায় গিয়ে আপনি দাঁড়াবেন? বেশির ভাগ ভক্তদের দেখেছি, তাঁদের মনে যে ঈশ্বরের অবধারণা –নিজে যেটা চান, নিজে যেমন; সেটাকেই অনেক গুণ বাড়িয়ে দেখেন। ফলে ঈশ্বরের ব্যাপারে অবধারণা ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে। বাচ্চা বয়সে এক রকম ধারণা ছিল, একটু বড় হয়ে আর-এক রকম, জপধ্যান করে অন্য রকম, শাস্ত্র পড়ে অন্য এক রকম; পাল্টাতেই থাকে। কারণ শাস্ত্র পড়ে, মনন করে, তার মত নিজেকে যে তৈরী করা, বেশির ভাগ লোক তা করেন না।

আজকে যাঁরা কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, তাঁরাও যখন ক্লাশ নাইন টেনে ছিলেন, তখন ইতিহাস, ভূগোল অবশ্যই পড়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস, ভূগোলের ধারণা তাঁদের সেখানেই শেষ। কদাচিৎ কখন কেউ কেউ, তার বিশেষ রুচি থাকতে পারে, সে ওগুলো নিয়ে নিজের মত পড়বে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। পনের-ষোল বয়সে ধর্মের ব্যাপারে আমরা যা কিছু শিখেছি, সেখানেই আমরা থেমে যাই। যখন গীতা পড়ছি, কথামৃত পড়ছি তখন শুধু ওই কথাগুলোতেই আমাদের মনটা যায়, যেটা আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে মেলে। এই জিনিসটা একটু বিচার করে দেখবেন আমি ভুল কিছু বলছি না, ঠিকই বলছি। আরও মুশকিল হয়, আমরা মনে করি ঈশ্বরকে আমি যেমনটা ভাবি, এটাই একমাত্র ঠিক। মুখে বলবেন, সব ধর্মের ঈশ্বর এক, সব ধর্ম একদিকে যাচ্ছে। আসলে কম বয়সে যে ধারণাটা করে রেখেছেন, ওটা আর পাল্টায় না, আর আমি যেটা জানি সেটাই একমাত্র ঠিক। যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এগুলো শুনছেন, বিশেষ করে যাঁরা প্রথমের দিকে শুনছিলেন, নিশ্চয় চমকে উঠেছেন যে এগুলো কি। ঠাকুরের সমস্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ, নিজে দেখেছেন, সেইজন্য সন্দেহ করার কিছু নেই।

হিন্দু ধর্ম যে কি বিরাট ধর্ম, যার কোন তুলনা হয় না, আপনারা সেই ধর্মের লোক। কিন্তু বাকিদের ওই সমস্যা, চটি একটা বই নিয়ে মনে করে তারাই ধর্মের সব বোঝে। কারণ ধর্ম যে সব সময় আধ্যাত্মিক ভাবে চলে তা না; গোলাগুলি, টাকা, সোনা, এগুলোর উপরেও চলে। এই

ভুলভ্রান্তিগুলো ভাঙার জন্যই অবতারকে আসতে হয়। গীতার শঙ্কর ভাষ্যের উপর প্রথমের দিকে আমরা আলোচনা করেছিলাম –প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, ভক্তিপথে সংসারে কিভাবে থাকতে হয় আর সন্ন্যাসী জ্ঞানপথ অবলম্বন করে কিভাবে থাকেন; অবতার এই তিনটির শিক্ষা দেন।

উপনিষদে কোন কিছুকে ঢেকেঢুকে বলা হচ্ছে না, কাহিনীর মাধ্যমেও বলা হচ্ছে না, ফলে উপনিষদ আমরা বুঝতে পারিনা। ঠাকুর যখন বলছেন তখন সেখানে তিনি মূল কথাও বলছেন, ব্যাখ্যাও তিনি দিচ্ছেন। ভাগবতে এই জিনিসটা পাওয়া যায়। কিন্তু ভাগবতে কি হয়, সেখানে এত কথা ও কাহিনী যে, মূল কথাগুলো কোথাও হারিয়ে যায়। অবতার আসেন মানুষের ভাল করার জন্য। ঠাকুর বারবার বলছেন, ঈশ্বর অবতার হয়ে জ্ঞান, ভক্তি শেখাতে আসেন। আচার্য শঙ্করও তাঁর গীতা ভাষ্যে প্রথমেই এই কথা বলছেন, অবতার জ্ঞান, ভক্তি শেখাতে আসেন। প্রবৃত্তিলক্ষণ হল কর্ম দিয়ে ভক্তি আর নিবৃত্তিলক্ষণ হল ত্যাগের মাধ্যমে জ্ঞান। প্রথমের দিকে যেটা বলা হল। আমরা যেটাকে ভালবাসি, সেটা আমাদের কাছে ঐশ্বর্য। কোনটাকে আমরা ভালবাসি? যেটাকে পাওয়ার পর মনে হয় আমি পূর্ণ হয়ে গেলাম। বাচ্চারা খেলনা পেয়ে, চকলেট পেয়ে নিজেকে পূর্ণ মনে করে, ওটাই তাদের কাছে ঐশ্বর্য। একজন বলবে, আমার কাছে চারটে খেলনা আছে; আর-একজন বলবে আমার কাছে ছটা খেলনা আছে। বয়স হয়ে গেলে টাকা-পয়সা, মান-সম্মান এগুলোই তখন ঐশ্বর্য। ভগবানের দৃষ্টিতে এগুলো কিছুই না, শূন্য। ভগবানকে ছেড়ে দিন, একজন যে উচ্চমানের যোগী, তাঁর কাছেও এগুলো শূন্য।

ঠাকুর অন্য জায়গায় বলছেন, ঈশ্বরের সৌন্দর্য দেখলে রম্ভা, মেনকার সৌন্দর্যকে চিতাভস্ম বলে মনে হয়। সেই ভগবানের কাছে আমার আপনার ঐশ্বর্য কিছুই না। তাই না, আমার আপনার যে দুঃখ-কষ্ট, আমাদের যে সুখ-সমৃদ্ধি, এগুলোও কিছুই না। আচার্য শঙ্কর বিষ্ণুপুরাণ থেকে ব্যাখ্যা করে ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনা করছেন *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ*, যাঁর জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল, শক্তি, বীর্য, তেজ সব সময় বিদ্যমান। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন –মা সরস্বতীর একটি কিরণ যাঁর কাছে আসে, তিনি জ্ঞানী হয়ে যান। সরস্বতীর একটি কিরণে জ্ঞানপ্রাপ্ত জ্ঞানী আমাদের জ্ঞানকে নিয়ে কি আর ভাববেন। তাই বলে ভগবান কি আমাদের ভালবাসবেন না? অবশ্যই ভালবাসবেন। কখন ভালবাসেন? ভগবান আপনার অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী; আপনার ভিতরে যিনি শুদ্ধ আত্মা, সেটাও তিনি। ফলে আপনার মন যখন ওই গুণের আকর হয়ে যাবে, যেটা আত্মার গুণ, ঈশ্বরেরও ওই গুণ; আপনাকে তখন ঈশ্বর অবশ্যই ভালবাসবেন। আপনিও তখন আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাবেন; কারণ আপনার ভিতরে যিনি আত্মা, তিনিও কিন্তু জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য, তেজে সদা সম্পন্ন।

আমরা কাকে ভালবাসি? যেখানে গিয়ে আমার মনের মিল দেখতে পাই। মনের মিল যদি ভালবাসা হয়, ভাল যেখানে বাসে বাঁধা, ওটাই আমার বাসস্থান। আমার যাবতীয় যা ভাল, আমার যে ব্যক্তিত্ব, যার কাছে গিয়ে একটা ভাল আশ্রয় পায়, আমার আমিটা তার সাথে জুড়ে যাবে। বর্তমান কালে এত বিবাহ বিচ্ছেদ কেন হয়, কেন আমাদের মধ্যে এত ঝগড়াঝাটি হয়? কারণ মনের মিল নেই; মিল ছেড়ে দিন, ভালবাসা ওরা ভুলেই গেছে। ওর দুটি টাকা হয়েছে, এর দুটি টাকা হয়েছে, তাতেই এরা লাফালাফি করছে, মনে করছে তাদের জীবন চলছে; কিন্তু কিছুই না। ফলে আপনার ভিতরে যদি ঠিক ঠিক জ্ঞান, ভক্তি হয়; যার বাইরে আপনি কিছুই জানেন না, তবেই ভগবান আপনাকে ভালবাসবেন।

কিছু দিন আগে একজন মেইল করেছে, প্রার্থনা করা নিয়ে গীতার কি একটা শ্লোক উদ্ধৃতি করে বলছে –দ্বৈতবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রার্থনা ঠিক আছে, কিন্তু অদ্বৈতের দৃষ্টিতে কি হবে? আমি পরিষ্কার বলে দিলাম, আপনি আমাদের গীতার লেকচারগুলো পুরোটা শুনুন। খাটতে চাইবে না, উঠল বাই তো নেপাল যাই। মাথায় কোন একটা বাই উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, এই প্রশ্নের উত্তর দিন; নিজে থেকে কেউ খাটবে না। আমি একটাই উত্তর দিলাম –ভাই তুমি কি বলতে চাইছ? অদ্বৈতবাদীরা কি প্রার্থনা করেন না? অদ্বৈতবাদীরা কি জপধ্যান করেন না? গীতায় ভগবান বলছেন, *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্,* আত্মজ্ঞানী আমার প্রিয়; কারণ সে আমার আত্মা। ভগবানের আত্মা জ্ঞানী, জ্ঞানীর আত্মা ভগবান। তাহলে আমাদের

আত্মা কি? ওটাও তাই, কিন্তু ইচ্ছা, ঐশ্বর্য দিয়ে ঢাকা। ঠাকুর পরের বাক্যে এটাই আমাদের সাবধান করছেন, এই ভুলটা যেন না করি।

কি জান? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে বলে, ভাবে ঈশ্বরও আদর করেন, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। ১৯৯১ থেকে ২০০৪ কি ২০০৫ পর্যন্ত ভারতে কতজন যে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন, নামগুলোও মনে রাখা মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, অথচ নামগুলোও মনে নেই। যখন যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তখন তাঁর ঐশ্বর্য চোখে পড়ছে; কিন্তু দু-দিন পর কেউ তাঁকে মনে রাখছে না। শুনতে হয়ত খারাপ লাগবে; কারুর ভাল কিছু হলে বললাম, বাঃ দারুন করেছেন তো! বলবেন, সব ঠাকুরের কৃপায় হয়েছে। ঠাকুরের নিকুচি করেছে কারুর কোন ভাল করার। ভগবান গীতায় বলছেন –*ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভু*। আর বলছেন, *ন কর্মফলসংযোগং*, ভগবান কোন কর্তৃত্ব তৈরী করেন না, কোন কর্ম করান না, কর্ম ও কর্মফলপ্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না। শুদ্ধ আত্মা কি নিতে যাবেন! আপনি নিজে ওটা মনে করছেন। ঈশ্বর কি ভালবাসেন? জ্ঞান, ভক্তি। কিন্তু সে তো একদিনে হবে না। সেইজন্যই তো গীতাতে ধাপে ধাপে বলা হয়েছে –কর্ম কর, খুব মনযোগ দিয়ে দায়ীত্ব পালন কর, পঞ্চ মহাযজ্ঞ কর; তারপর এগুলোকেই ঈশ্বরের সেবারূপে করা। সেখান থেকে এগিয়ে ধীরে ধীরে সকাম কর্ম, নিষ্কাম কর্ম এবং শেষে কর্মত্যাগ। নিষ্কাম কর্ম যখন হবে, তখন এক হাত দিয়ে কর্ম আর-এক হাত দিয়ে ঈশ্বরের নাম করে যাওয়া। আর কর্মত্যাগ মানে –দুই হাত দিয়ে ঈশ্বরকে ধরা।

সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে ভগবান খুশি হবেন। হে প্রভু তুমি সূর্য, চন্দ্র করিয়াছ, হে প্রভু তুমি এই করিয়াছ, সেই করিয়াছ। এগুলো থাকে, সাধনার প্রথম অবস্থায়, বিশেষ করে যাঁরা ভক্তিপথে যান, তাঁদের এসবেরও দরকার আছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়লে হাসি পেয়ে যায়। এগুলোরও দরকার আছে, কিন্তু এগুলিকেই যদি ধর্মের শেষ কথা বলে মনে করা হয়, তাহলে হাসি পাওয়া ছাড়া আর কিছু পায়না।

শম্ভু বলেছিল, আর এখন এই আশীর্বাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য, তাঁকে তুমি কি দিবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি। এই সব উদাহরণ যদি ঠাকুর না দিয়ে যেতেন, আমরা ধর্ম কি বুঝতেই পারতাম না। আমরা কথায় কথায় কত প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর তুমি আমার এই সব কিছু সরিয়ে দাও, আমার কিছু লাগবে না। ঠাকুর কেন সরাতে যাবেন, আপনার জিনিস আপনি সরান, উনি কি আপনার ঝাঁটা দেওয়ার লোক নাকি? তারপর ঠাকুর খুব নামকরা ঘটনার কথা বলে এই জিনিসটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

যখন বিষ্ণুঘরে গয়না সব চুরি গেল, তখন সেজোবাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখতে গেলাম। সেজোবাবু বললে, 'দূর ঠাকুর! তোমার কোন যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু করতে পারলে না?' আমি তাঁকে বললাম, 'এ তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না করছো, তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির ডেলা! লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি তোমার গুটিকতক টাকা চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? এরকম কথা বলতে নাই'।

সাধারণ একটি কথা যদি আপনি বুঝে নিতে পারেন, জীবনে আপনার অনেক শান্তি এসে যাবে। ঈশ্বর কি তাঁর ভক্তকে দেখেন না? পুরোদমে দেখেন, যদি আমিত্ব না থাকে। যদি তিনি না দেখেন, অর্থাৎ তিনি চাইছেন না অন্য রকম কিছু করতে; আর যিনি ভক্ত, এতে তাঁরও কিছু আসে যায় না। ভক্ত না খেয়ে থাকলেও আনন্দে থাকে, রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলেও আনন্দে থাকে; কারণ সে ঈশ্বরকে ধরে আছে। ভক্ত মানেই সেখানে আমিত্ব আসবে, আমি, তুমি আসবেই। ঠাকুরের সন্তানদেরও কখন সখন যেন আমিত্ব এসে যেত, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে অন্য রকম বলতেন। জীবদ্দশাতেও তিনি বলতেন, পরেও বলতেন।

আমরা সবাই ওই দলের লোক, যাঁরা সংসারে ভোগ করতে চাই। আমাদের কাছে টাকা-পয়সা, গয়না, গাড়ি-বাড়ি এগুলোর দাম আছে, এতে দোষের কিছু নেই; কিন্তু ওর মধ্যেও ঈশ্বর যে কি বস্তু, এটাকে ভুলে যেতে নেই। সেইজন্য শাস্ত্র নিয়মিত পড়তে হয়, শাস্ত্র নিয়মিত পড়া মানে মনকে নিয়মিত মনে করিয়ে দেওয়া –ঈশ্বর এই। আমি সংসারের এই চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরোতে পারছি না, ঠিক আছে, কিন্তু তার মানে এই না যে, আমি যেটা ভাবছি সেটাই ঠিক। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাইছেন, তাঁরা কিছু চান না, ঈশ্বরের ভাবে তাঁরা ডুবে থাকেন। ঈশ্বরের ভাব মানে –জ্ঞান, ভক্তি। কি জ্ঞান? আত্মা বাদে যা কিছু আছে সব নাম আর রূপের খেলা, সব অনিত্য আর ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। কিন্ত এর বাইরে আমরা যদি যেতে না পারি, তাহলে যাব, গিয়ে জগতে নামব। কতটুকু নামব? ততটুকুই নামব, যাতে জগতের মধ্যে মজে গিয়ে ঈশ্বরের যে স্বরূপ, সেটাকে যেন না ভুলে যাই।

ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। বশ মানে, গীতায় যেটা বলছেন, *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, ওটাই ঠাকুর বলছেন। তিনি কি চান? আপনি তাঁকে কি দেবেন? তাঁর দেওয়া মাটির ডেলাতে আপনার এত ঐশ্বর্য, বিশ্বের যিনি সবচেয়ে ধনীলোক, তাঁকে ঠাকুর একটু মাটির ডেলা দিয়েছেন তাতেই সে বিশ্বের সবার চাইতে ধনীলোক, সেখানে ঠাকুরকে আপনি কি আর দেবেন?

তিনি আপনার কাছে কি চান? **টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য –এই সব চান**। এখানে একটু বোঝার আছে, ঈশ্বর কেন চাইবেন, ঈশ্বর কিছু চাইতে যাবেন না। বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, তিনি কি চান। এগুলো দ্বৈত ভাব দিয়ে বোঝা যায় না। যে ছেলেটি আমাকে লিখেছিল, দ্বৈতভাবে প্রার্থনা তাও বোঝা যায়, অদ্বৈত ভাব দিয়ে প্রার্থনা বোঝা যায় না। পুরো জিনিসটাই উল্টো হয়; প্রার্থনা একমাত্র অদ্বৈত ভাবের দৃষ্টি দিয়েই বোঝা যায়। কিভাবে? কারণ ঈশ্বর আমার স্বরূপ, সেই স্বরূপের সঙ্গে আমি এক হতে চাই। এটাকেই বোঝানর জন্য ঠাকুর বলছেন –তিনি এই সব চান। কি চান? যেটা চাইলে তাঁর সাথে এক হয়ে যাওয়া যাবে। তাঁকে আপনি খুশি করতে চাইছেন, এর অর্থ কি? এই কথার অর্থও তাই – আপনি তার সাথে এক হতে চাইছেন বলেই তাঁকে খুশি করতে চান।

অনেকবার আমি ব্যাখ্যা করেছি –মানুষ কেন মিথ্যা কথা বলে? কারণ সে আপনাকে হারাতে চায় না। আপনার সন্তান কেন আপনাকে মিথ্যা কথা বলে? স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে কেন মিথ্যা কথা বলে? সে আপনাকে হারাতে চায়না। জানে, সত্যি কথা বললে আপনি ওই সত্যটা নিতে পারবেন না। যে মানুষ আপনার সামনে এসে ক্যাট ক্যাট করে সত্যি কথা বলে, বুঝবেন সে আর আপনাকে পাত্তা দিতে চাইছে না। তার বক্তব্য হল, তুমি থাক না থাক আমার তাতে কিছু যায় আসে না। যে যাকে ভালবাসে, সে দিনরাত তার কাছে মিথ্যা কথা বলবে। কেন? আপনার সঙ্গে এক হতে চায়, এক হয়ে থাকতে চায়। আত্মা আপনার স্বরূপ, আত্মার সঙ্গে আপনি এক হতে চান; ফলে তাঁর মত আপনাকে হতে হবে। আত্মার কাছে আপনি তো মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না –হে আত্মা তোমাকে কত ভালবাসি, হে প্রভু তোমাকে কত ভালবাসি। আত্মা আপনার বাড়ির লোক না যে, আপনি তাঁকে বোকা বানিয়ে দেবেন। উনি তো মনের অধীন নন যে, বোকা বানিয়ে দেবেন। ফলে, ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য একমাত্র এগুলো দিয়ে আপনি তাঁর সাথে এক হতে পারবেন। হে প্রভু তোমাকে এই অর্পণ করলাম, হে প্রভু তোমাকে এই এই অর্পণ করলাম; এগুলো আপনার ভাব ও ভক্তি; আপনার ভাব-ভক্তি আপনি দিলেন। কিন্তু ঠিক ঠিক যদি আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়তে চান, তাহলে আপনাকে ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এই গুণগুলো আপনার মধ্যে আনতে হবে।

যার যেমন ভাব ঈশ্বরকে সে তেমনই দেখে। তমোগুণী ভক্ত, সে দেখে মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই। যারা অলস প্রকৃতির তাদেরও ভক্তি অনেকটা এই রকমই। সত্ত্বগুণীর নাম করে যত কুড়েমি বেরিয়ে আসে।

তার পূজা লোকে জানতে পারে না। ফুল নাই, তো বিল্বপত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়।

এখানে বলা দরকার, সবারই জন্য পূজা করা কিন্তু আবশ্যক। আপনি যে মতের, যে বাদের হন; সেই মতে পূর্ণ আচার মেনে আপনার পূজা করা কিন্তু খুব জরুরী। আমাদেরও ঠাকুরের পূজা করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা পদ্ধতি বই আছে। ওটা যে শুধু ঠাকুরের পূজার জন্য, তা না, আপনার যিনি ইষ্ট আপনি এই পদ্ধতিতে তাঁর পূজাও করতে পারেন।

আর আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তাঁর বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম। আপনারা যাঁরা অনেকদিন আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনছেন, আপনারা নিশ্চয় বেদের ব্যাখ্যাতে ওঁকারের উপর ব্যাখ্যা শুনে থাকবেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদের ক্লাশেও ওঁকারকে নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওঁ-এর 'অ' 'উ' ও 'ম' এই তিনটের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শব্দ বাঁধা। আর যে কোন বস্তুর একটা নাম থাকে, বস্তু আর নাম আলাদা কিছু নয়। সমস্ত বস্তুর আধার ঈশ্বর আর সমস্ত নামের আধার ওঁ, সেইজন্য ওঁ আর ঈশ্বর এক, দুটো আলাদা কিছু নয়। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের প্রত্যেকটি নামের একটি অর্থ হয়; রাম বলুন, কৃষ্ণ বলুন, শিব, কালী, দূর্গা যাই বলুন, সব নামের একটা অর্থ আছে। সেইজন্য যিনি ঈশ্বরের নামে ডুবে আছেন, তিনি তো ত্রিগুণাতীত; তাঁর আর বিধিবাদিয় পূজা-অর্চনা লাগে না।

খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলা হচ্ছে, আর এই অবস্থা কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার ব্যাপার। এটা এমন নয় যে, দু-মিনিট ঠাকুরের নাম শুনলাম, মন ডুবে গেল –এটা তা নয়। কঠোপনিষদে আত্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যমরাজ বলছেন –শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল দিলে, দুটো জল মিশে এক হয়ে যায়। নাম আর নামী অভেদ; ঈশ্বর আর তাঁর নাম অভেদ। ঈশ্বর শুদ্ধ পবিত্র, অপাপবিদ্ধ; ঈশ্বরের নামও শুদ্ধ পবিত্র অপাপবিদ্ধ। যেমনি তাঁর নাম করছেন, সেই নামের যিনি নামী, তিনি ঈশ্বর, তাঁর ভাবে আপনি ডুবে যাচ্ছেন। ঈশ্বরের নামে ডুবে যাচ্ছেন মানে, সংসার খসে পড়ে যাচ্ছে। এইজন্য বলা হয়, জপ মনকে শুদ্ধ করে। যত জপ করা হবে মন তত শুদ্ধ হবে। ফাঁকা সময়ে হাততালি দিয়ে যদি ইষ্টের নাম করেন, আপনার মন শুদ্ধ হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

কেশব সঙ্গে কথা –ঈশ্বরের হাসপাতালে আত্মার চিকিৎসা

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি, সহাস্যে) –তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ওইরকম হয়েছে। ঠাকুরের এই বর্ণনা আমি কোন শাস্ত্রে পাইনি। ভাব আদির ঠিক ঠিক গ্রন্থ হল ভাগবত, সেখানেও এই বর্ণনা নেই। কথামৃতে এত রকম কথা আছে, যা কিনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে কোন ভাব যদি খুব প্রবল থাকে, যেমন আপনারা সাইকোসোমাটিকে বিভিন্ন ধরণের রোগের কথা শুনে থাকবেন, সেখানেও বলা হয় যে, মনের কোন ভাব যদি খুব জোরাল হয়ে যায়, তখন শরীরে অনেক রকম রোগ দেখা যায়। মনের সঙ্গে শরীরের সরাসরি সম্পর্ক। আধ্যাত্মিক ভাবও একটা ভাব, কিন্তু এই ভাব সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উপর ছাপ ফেলে। সাইকোসোমাটিক একদিনে হয় না, সময় লাগে; বেশ কিছু দিন পরে আঘাত করে। আমিও ভাবি, আমারও তো সত্তর বছর হতে চলল; জীবনে অনেক রকম ভাব দেখলাম, এর পর কি কি যে হবে ভগবান জানেন।

যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। কাম, ক্রোধ এই রিপুগুলো যদি খুব প্রবল ভাবে থাকে, প্রথমে বোঝা যায় না, পরে ধাক্কা মারে। ঈশ্বর একটা ভাব, যেখানে মন ঈশ্বরের ভাবে উত্তাল হয়ে যায়, তখন দেহকে ভেঙে দেয়। তাহলে ধর্মকর্ম করে কি লাভ? কিন্তু সত্যটা হল, ধর্মকর্ম করে দেহ ভেঙে গেলেও গায়ে কিছু লাগবে না। যাঁরা বৈজ্ঞানিক, ঠিক ঠিক লেখক যাঁরা, এনারা নাম-সম্মান-টাকা-পয়সা এগুলোর জন্য ভাবনা-চিন্তা করেন না। বিখ্যাত পদার্থ

বিজ্ঞান রিচার্ড ফাইনম্যান আর-একজন নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানীর সাথে জাপানে একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। সেখানে হঠাৎ আমেরিকা থেকে একটা কল এসেছে, যেটা তখনকার দিনে একটা বিরাট ব্যাপার। ওরা ফাইনম্যানের একটা ইন্টারভিউ নিতে চাইছিল, ওই পদার্থবিদ সঙ্গে সঙ্গে না করে দিলেন। উনি বলছেন, নামযশ আজ ওর পিছনে, কাল তার পিছনে দৌড়াতে থাকে। ঠিক ঠিক সমাজবিজ্ঞানী যাঁরা হন, লেখক হন, বিজ্ঞানী হন, চিন্তক হন, যাই হয়ে থাকুন, কক্ষণ তাঁরা টাকা-পয়সা, নামযশের দিকে যাবেন না; দেহ তাঁদের কাছে কোন ব্যাপারই না।

ঠাকুর তারপর বলছেন –**আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস ধপাস করছে; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয় তো কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল**। বেলুড় মঠে আমরা এই জিনিস প্রায়ই দেখি।

কুঁড়েঘরে হাতি প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙে চুরে দেয়। ভাবহস্তি দেহঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে। বিশেষ করে ভক্তি, ভাব থেকে ভক্তি হয় কিনা, জোরাল ভক্তি, জোরাল ভালবাসা শরীরের ভিতরটা চুরমার করে দেয়। আমাদের ঠাকুরের শরীর, মায়ের শরীর, স্বামীজীর শরীরও ভেঙে গিয়েছিল; কারুর শরীরই ঠিক থাকে না। ঠাকুর কত রকম উদাহরণ দিচ্ছেন, কারণ এই কথা কোন চলতি কথা না, কোন শাস্ত্রেও পাওয়া যাবে না। ঠাকুর আবারও একটা উদাহরণ নিয়ে আসছেন।

হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে-টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হইহই কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কামক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে, তারপর অহংবুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে।

আপনারা ভেবে দেখুন, এ-সব শোনার পরেও কি আপনারা জ্ঞান-ভক্তি চাইবেন? ধরুন একটা ঘরে আগুন লাগল আর সেখানে আমার এই ছেঁড়া রুমালটায় আগুন ধরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হুশ্ করে বিরাট ভাবে জ্বলে উঠবে, ওটাকে আর বাঁচানো যাবে না, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পুড়ে যাওয়ার পর আগুন নিভে গিয়ে সব শান্ত হয়ে যাবে, ছাই হয়ে গেল। এখানেও ভাব, ভক্তি প্রবল হলে কাম, ক্রোধাদি প্রচণ্ড ভাবে জেগে উঠবে, সামলানো যাবে না। তখন মনে হবে, আমার এ কি হল, জপধ্যান করার আগে ভালই তো ছিলাম; হঠাৎ কি হল? আমার কাম সামলাতে পারছি না, আমার ক্রোধ সামলাতে পারছি না। ওই মুহূর্তে সামলানো যাবে না, তারপর হঠাৎ হুশ্ করে জ্বলে আবার শান্ত হয়ে যাবে। আবর্জনাগুলো পুড়ে গেল, এরপরে হবে তোলপাড়।

তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। এই কথাটা আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার। ধর্ম জীবনে যদি যেতে চান, চারিদিক থেকে অশান্তি লাগবে। লোকেরা আপনাকে অপমান করবে, শরীর খারাপ হবে, মন অবসাদগ্রস্থ হয়ে যাবে; ওর মধ্যেই ঈশ্বরকে ধরে রাখতে হবে। ঈশ্বরকে যদি ছেড়ে দেন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার এই অবস্থা পাল্টে গিয়ে সব আবার আগের মত ভাল হতে শুরু করবে। যেমনি আপনি ঈশ্বরের দিকে এগোতে থাকবেন, তেমনি নানান ধরণের সমস্যা হতে শুরু হয়ে যাবে। তখন মনে হবে ভালই তো ছিলাম, কি দরকার বাবা ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার, আমার লাগবে না। না, আপনি সংসার ছেড়ে দিচ্ছেন ঈশ্বরের জন্য, সেখানে দেহ আর কি জিনিস; দেহ তো সংসারই অংশ।

ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, **হাসপাতালে যদি তুমি না লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি না লিখালে কেন! (সকলের হাস্য)** আমরা সবাই ফেঁসে গেছি, পালাতে চাইলেও পালানো যাবে না। কিছুদিন এদিক-সেদিক যেতে দেবে; আবার ধরে নিয়ে আসবে। কুকুর যখন কোন পাখি শিকার করে, তখন পাখিটাকে

একটু ছেড়ে দিয়ে দেখতে থাকে, যেই পালাতে যাবে তক্ষুণি খপ্ করে গিয়ে ধরে। নাম লিখিয়েছেন, আর ছাড়বে না।

কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়া বারবার হাসিতেছেন। হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসিতেছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

কথামৃতের এই অংশে ঠাকুর কেশব সেনকে অনেকগুলো জরুরী কথা বলছেন। কথামৃতের এই অংশকে আপনাদের যদি মনে হয় এটা ঠাকুর ও কেশব সেনের মধ্যে কথোপকতন; অবশ্যই তা মনে করতে পারেন, কোন অসুবিধা নেই; সাধারণ ভাবে এভাবেই দেখা হবে। কিন্তু এর আরও একটা দিক আছে; একজন যিনি সাধক মোটামুটি ধর্ম পথে এগিয়ে গেছেন; এখানে বলতে দ্বিধা নেই যে আপনারও কিন্তু এগিয়ে আছেন; এই ধরণের সাধকদের জীবনেও দুঃখ-কষ্ট আসে, সমাজে যে সম্মান ছিল, সবারই সমান থাকে না, সেটার হানি হয়ে যেতে পারে, পদমর্যাদা কমে যেতে পারে, যদিও কেশব সেনের সামাজিক সম্মান, পদমর্যাদা অটুট ছিল, কিন্তু সবারই থাকে না, কমে যায়; তদুপরি অসুখ-বিসুখ, অশান্তি এগুলো বেড়ে যায়; বাস্তবে বেড়ে যায়। দেববাণীতে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা এগিয়ে যান, তাঁদের এই জিনিসগুলো একটু তাড়াতাড়ি আসে।

যদি মনে করেন আপনি সত্যিই খুব সুখে আছেন, সংসারে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে; বুঝতে হবে আপনি থেমে গেছেন, আধ্যাত্মিক যাত্রা পথে আপনি এগোচ্ছেন না। শুনতে খারাপ লাগে আর ভয়ও হয়, কিন্তু এটাই সত্য। এই যে ঠাকুর কেশব সেনকে বলছেন –হাসপাতালে যদি তুমি না লেখাও, আর তোমার চলে আসবার জো নাই। যারা পাপীতাপী তারাও ঠাকুরের হাতে, যারা চুরি-চামারি করে, ডাকাতি করে, খুন করে তারাও তাঁরই হাতে আছে; যারা ভাল মানুষ, তারাও তাঁরই হাতে আছে। অনেকেরই মনে হয়, যারা ভাল মানুষ তারা যেন ঈশ্বরের বেশি কাছে; না সে-রকম কিছু না। সবাই ঈশ্বরেতেই বাস করছে। কিন্তু যাঁদের এই ভাব হয়ে গেছে –মার কাছে যাব; তাঁদের সাথে ঠাকুর একটু অন্য ব্যবহার করেন; যার পেটে যা সয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনে তাকে এখনও এগোতে হবে। ফলে আবর্জনা যে জড়িয়ে আছে, তার সবটাই তাঁকে পরিষ্কার করতে হবে।

সংসারের সবটাই আবর্জনা, সংসারের প্রতি একটু যদি আসক্তি থাকে সেটাও আবর্জনা। ভাগবতে খুব সুন্দর কাহিনী আছে –নারদের মন পুরো ঈশ্বরে ডুবে আছে, একবার এক ঝলক ভগবান তাঁকে দর্শন দিলেন। ওইটুকু দর্শনে নারদের মন ঈশ্বরের আরও দীর্ঘস্থায়ী দর্শন পাবার জন্য ছটফটানিটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। তার কিছু দিন পরে নারদের মা মারা গেলেন। এই সংসারে নারদ একটু যাঁর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, সেটাও চলে গেল। এখন কি আর আছে সংসারে, সবই শেষ হয়ে গেল। নারদ, তিনি দেবর্ষি, ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়তম, যার জন্য ভগবান বিষ্ণু আর লক্ষ্মীর কাহিনী কম; তুলনায় বিষ্ণু আর নারদের কাহিনী অনেক বেশি। যদি আপনি ঈশ্বরকে ধরার ইচ্ছা করে থাকেন, কোথাও কোন সাধুবাবাকে দেখলেন, কোন সন্ন্যাসীকে দেখলেন; দেখে আপনার মনে হল, আমিও যদি এই রকম হতাম। ঠাকুর এবার আপনাকে পরিষ্কার করতে শুরু করবেন। এটাই হল হাসপাতালে নাম লেখানো, যেটা এর আগে আমরা ব্যাখ্যা করলাম।

কেশব চন্দ্র সেন, কি মধুর ব্যক্তিত্ব; এত শরীর খারাপ, এরপর আর বেশি দিন শরীরটাও থাকল না। ঠাকুরের কথা শুনে হাসছেন। সাত-আট বছর আগে আমি একজন মহারাজকে দেখেছিলাম, আমার থেকে বয়সে খুব বেশি বড় নন, তার মানে তখন তাঁর বয়স পয়ষট্টি হবে বা আরও কম হতে পারে। পাটনা মঠের সেক্রেটারী ছিলেন। ওখানে থাকতেই তাঁর পেটে একটা কিসের ব্যাথা হতে শুরু হল, অনেকদিন পেটের ব্যাথা নিয়েই সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। পরে দিল্লীর এএমসিতে গিয়ে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল ওনার সিরিয়াস ক্যান্সার। তখন আমি কোন কাজে দিল্লীতেই ছিলাম। সেখানে মহারাজকে দেখে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। খুব ভালবাসতাম ওনাকে, উনিও

আমাকে ভালবাসতেন। আমার ব্রহ্মচারী অবস্থা থেকেই ওনার সাথে পরিচয় হয়, তখন থেকেই উনি আমাকে ভালবাসতেন। সাধুদের বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে তিনি এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত, চোখে-মুখে কষ্টের কোন ছাপ নেই। ওনাকে দেখেও বোঝার উপায় ছিল না যে, ভিতরে তাঁর প্রচুর কষ্ট। আর প্রত্যেক কথায় হাসছেন; ওনার স্বভাবে ছিল সব সময় হাসিখুশি থাকা, সেই স্বভাবটা তখনও তাঁর কথাবার্তায় বেরিয়ে আসছে। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এইভাবেই ছিলেন।

আর একজন মহারাজকে জানতাম, রায়পুরে ছিলেন। তখন তিনি প্রায় মৃত্যুশয্যায়; কিন্তু কেউ এলেই বলতেন, 'ভাই শরীর নিয়ে কথা বলো না, ঠাকুরকে নিয়ে দুটি কথা বল'। অন্য দিকে সংসারী লোকেদের দেখুন, একটু কিছু হলে পাড়া শুদ্ধ লোককে জাগিয়ে রেখে দেবে। বাচ্চাদের মত স্বভাব, বাচ্চাদের শরীরে কোন কষ্ট হলে কান্নাকাটি, চেঁচামেচি করতে থাকবে; তবে সবাই করেন না, দু-একজন অন্য রকম স্বভাবের হন। এখানে কেশবচন্দ্র সেন হাসছেন। এটা মনে রাখবেন, এই কথোপকথন আমার জন্য, আপনাদের জন্য অতি জরুরী। দুঃখ-কষ্ট যখন আসবে, শরীরে যখন ভয়ঙ্কর ব্যাধির আক্রমণ হবে, তখন আমাদের কিভাবে থাকতে হবে, এই কথোপকথন সেই শিক্ষা দিচ্ছে।

অনেক আগেকার কথা, সেই ১৯৯১ কি ১৯৯০ সালের কথা। আর-একজন মহারাজকে জানতাম, তিনি জলপাইগুড়ি মঠে ছিলেন, শরীর খারাপ নিয়ে তিনি এসেছেন। মারা যাওয়ার দুদিন আগে ওনার সঙ্গে যাঁরাই দেখা করতে যেতেন, উনি খুব আনন্দের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে বলতেন – চললাম ভাই, চললাম। ওনার থেকে ছোট আর-একজন মহারাজ খুব দুঃখ করে বেলুড় মঠে বলছেন – কলকাতায় সেবাপ্রতিষ্ঠানে ওনার সাথে দেখা করতে গেলাম, উনি আনন্দে ভরপুর হয়ে আমাকে বলছেন, চললাম ভাই, চললাম। দেখ আমার এতো মন খারাপ করছে, আমি তো জীবনে এখনও এতটা অর্জন করিনি যে, আনন্দে বলতে পারব –চললাম ভাই, চললাম। কারণ যাঁরা দেখছেন, তাঁদের কষ্ট হয়। আবার সংসারী লোক যদি হয়, আর সংসারে যদি তার মন পড়ে থাকে, ওরাও চেঁচামেচি করবে। কিন্তু সাধুপুরুষ যাঁরা, তাঁরা এদিকে দৃষ্টি দেন না। ঠাকুর এবার নিজের অবস্থা বলছেন। ঠাকুর তখন বেদান্তাদির সাধনা করছিলেন, সাধনাদি করে তাঁর শরীর খুব খারাপ করেছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁর মন ছিল না; সেই কথা এবার বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) –হৃদু বলত, এমন ভাবও দেখি নাই। এমন রোগও দেখি নাই। তখন আমার খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি। আর তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বরে বাহ্য করতে যাওয়া মানে, ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে পঞ্চবটী পেরিয়ে সেই ঝাউতলায় যেতে হত। **মাথায় যেন দুলাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে**। এগুলো তখনকার দিনে একটা কথার কথা। **কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চলছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এল। সে দেখে, আমি বসে বিচার করছি**। বেদান্তের সাধনা করছিলেন কিনা, ঠাকুর তখন বেদান্ত ভাবে আছেন। তখনকার দিনে লোকেরা কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিতে বেশি ভরসা করত। এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার তখনও ছিলেন, কিন্তু সেই সময় আজকের দিনের মত এ্যালোপ্যাথি এত প্রচলিতে হয়নি আর তখন এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এত উন্নতও হয়নি। **তখন সে বললে্ "একি পাগল! দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে"**। কারণ লোকেরা মনে করে সব কিছু যখন ভাল চলছে, তখনই ধর্মকথা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ভুবনেশ্বর মঠের মজার গল্প আছে, একজন দোকানী মঠের এক সাধুকে দেখে বলছে, 'মঠঠর খাউছি, খট্টর শুইছি, এরা সংসারের কি বুঝবে'। লোকেদের ধারণা, যারা সুখে আছে একমাত্র তারাই ধর্মীয় কথা বলতে পারবে। ধর্মীয় কথা ঠিক ঠিক তখনই হয়, যখন আপনি সুখে আছেন তখনও করছেন, কষ্টে আছেন, তখনও করতে পারছেন। মনের যে ভাব –ঈশ্বরে ডুবে রয়েছে।

(কেশবের প্রতি) –তাঁর ইচ্ছা। সকলই তোমার ইচ্ছা। ঠাকুর গান করছেন –সকলই তোমার ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। এখান থেকে ঠাকুর যে কথা বলছেন, খুব নামকরা কথা। আমাদের যাঁদের শরীর চেতনা খুব বেশি, আমাদের পক্ষে এই কথা মেনে নেওয়া খুব কঠিন। কিন্তু ঠাকুর যখন এই কথা

বলছেন, তখন আমাদের মানা ছাড়া কোন উপায় নেই। দ্বিতীয়, সব সাধকদেরই এই অবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হয়।

শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড়সুদ্ধ তুলে দেয়। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমি যখন ছিলাম, আমার কপাল এমন যে, তখন দুজন মহারাজকে পেয়েছিলাম, যাঁরা ফুলগাছ চাষে দক্ষ ছিলেন। একজন মহারাজ তো ফুলগাছ পরিচর্যার উপর বইও লিখেছেন। একজন ছিলেন স্বামী বিনয়ানন্দ মহারাজ, ডালিয়া, গোলাপ এগুলো নিয়ে তিনি থাকতেন, আর ছিলেন স্বামী পাবনানন্দ, বিদেশী মহারাজ, ডাকনাম ছিল শম্ভু মহারাজ। ওখানেই প্রথম দেখেছিলাম কিভাবে গোলাপের চাষ ও পরিচর্যা করা হয়; মহারাজদের পরিচর্যাতে তখন আশ্রমের জমিতে প্রচুর গোলাপ হত। শীতের সময় দেখতাম একেবারে গোড়াসুদ্ধ সব গোলাপ গাছগুলিকে তুলে রাখা হয়েছে। বলা হয় যে, যত শীত পড়বে গোলাপ তত ভাল হবে। দেওঘরের ওই শুষ্ক ঠাণ্ডা, শিকড় মাটি থেকে আলগা করা, ওই একটা দুটো শিকড় মাটিকে ধরে আছে। এই যে বলছেন, শিশিড় পাবে বলে; শিশিরের সাথে গোলাপের শিকড়ের কি সম্পর্ক আমার জানা নেই, বোটানি যাঁরা জানেন তাঁরা হয়ত বলতে পারবেন। শিশিড় খাওয়ানর পর সার দিয়ে, মাটি চাপা দেওয়া হল, তারপর একটা দুটো ডাল রেখে সব ডাল ছেটে ফেলে দেওয়া হত। কিছু দিন পর থেকে হু হু করে ডাল বেরোত, আর কি গোলাপই না তখন হত।

শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড়সসুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাসি) এখানে আমার যেটা মনে হয়, ঠাকুর যেটা বলছেন না, আপনারা এক মত নাও হতে পারেন; এই যে শিকড়সুদ্ধ তুলে দেওয়া তিনটে স্তরে হয় –শরীরের দিক থেকে, মনের দিক থেকে আর সমাজের দিক থেকে। সমাজে যদি আপনি প্রচুর জড়িয়ে থাকেন; আজ এই সভার উদ্বোধন করছেন, কাল ওই সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, আপনাকে অনেক বড় বড় লোকেরা চেনেজানে, নেতা-নেত্রীরা জানে, পুলিশের বড় কর্তারা জানে; এই অবস্থায় ঠাকুরে একশ ভাগ মন দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ব্যক্তিগত স্তরে আমি এগুলো অনেক কম বয়সে পেরিয়ে এসেছি। মনের দিক থেকে কি হয়; মনের এমন দুরবস্থা হয়ে গেলো যে, সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুই আর ভাল লাগছে না। তৃতীয় হল শরীরের ব্যাধি। এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটা বা একের অধিক এই রকম অবস্থা করে দিয়ে ঈশ্বর আপনাকে সবার থেকে আলাদা করে দেবেন; শিকড়সুদ্ধ তুলে দেবেন।

এরপর ঠাকুর একটি কথা বলছেন, অতি সাংঘাতিক কথা –**ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে**। ঠাকুর এখানে কেশবকে কোন সান্ত্বনা দিচ্ছেন না। গীতাতে যোগভ্রষ্টের কথা আছে; আমরা সবাই যোগভ্রষ্ট। আগের জন্মে যোগ সাধনা করছিলেন, সিদ্ধি হল না, আবার জন্ম নিলেন। গীতায় এখানে ভগবান খুব সুন্দর বলছেন –*তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্*। বুদ্ধির সংযোগ এমন হয়ে যায় যে, তারপর এই যে শিকড়সুদ্ধ তুলে দেওয়া হয়; তারপর এমন একটা যোগাযোগ হয়, *লভতে পৌর্বদেহিকম্*, আগের যে সাধনার শরীর সেটা পুরোদমে চলে গেল। এরপর পুনর্জন্ম যখন হবে, কেশবচন্দ্র সেন আবার যখন ফিরতি আসবেন, তখন একটা বড় কাণ্ড হবে, স্বাভাবিক। কারণ কেশবচন্দ্র সেন, যাঁর প্রতি ঠাকুরের এত ভালবাসা, তিনি কোন সাধারণ গোলাপ নন, বসরাই গোলাপ।

আপনারাও সাধারণ না, নাহলে এতদিন এই ব্যাখ্যাগুলো শুনতেন না। যেখানে নৃত্য আছে, গান আছে, 'আহা আহা' আছে, সেখানেই যেতেন, যদি সাধারণ হতেন। আমি প্রায়ই ভাবি, আজকে কেন হিন্দুদের এই দুরবস্থা? আপনারা যাঁরা আপনাদের ঠাকুরদাকে দেখেছেন, তাঁর কাছে ঠাকুরদার বাবার কথা শুনেছেন। ওনারা ভোরবেলা স্নান করে জপধ্যান, পূজা, পাঠ সব কিছু করতেন। ফলে ধর্মীয় কোন আলোচনা হলে ওনারা সেটার সাথে নিজেকে জুড়ে নিতে পারতেন। মন প্রস্তুত ছিল বলে সব সময় ওই অবস্থায় থাকতে পারতেন। আবার আপনাদের এই সময়ে ইংরাজী পড়া বিদ্যা, চাকরি করা বিদ্যা, দুটি টাকা আয় করার বিদ্যা ইত্যাদি করে আমরা ওই ধর্মাচরণের অবস্থা থেকে হারিয়ে গেছি। ফলে কি হচ্ছে যেটার সাথে আমি জুড়তে পারব, সেটাই তো আমি নেব।

আমার মনে আছে, আমাদের যখন বয়স কম ছিল তখন জানতাম স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ খুব বড় বক্তা ছিলেন। উনি ভাষণ দিতে এলে আমরা দৌড়ে দৌড়ে যেতাম, তখন কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর নাম শুনে ওনার সামনে হাঁ করে বসে থাকতাম। ব্যক্তির প্রতি একটা আকর্ষণে হাঁ করে বসে থাকতাম। প্রস্তুতি নেই কিনা। প্রস্তুতি না থাকলে তখন, বৃন্দাবনের ওই মহারাজ, হরিদ্বারের ওই সাধুবাবা, গঙ্গোত্রীর সেই বাবাজী; আহা কি সুন্দর বলেন আর কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচেন। আমার কাছে একজন এসে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের একজন সাধুর নাম করলেন, পরে একটা ভিডিও ক্লিপে দেখি একটা জোকার। আর একবার পাঠালেন, কোথাকার এক সন্ন্যাসীর একটা অডিও ক্লিপ। এত অযৌক্তিক কথা বলছেন কি বলব। যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠিয়েছেন, দেখুন কি সুন্দর কথা বলছেন। আমি ওই অডিও ক্লিপটা শুনে তো হতবাক; এই লোকটাকে মানুষ শোনে?

একটা জায়গার অভিজ্ঞতার কথা মনে আছে, সেটা আপনাদের বলছি। হল ভর্তি লোক। আমি যদি বক্তৃতা দিতে যাই, ওই ধরণের অডিয়েন্সে পাঁচজনও লোক থাকবে না, আমাকে কজনই বা চেনে। আর লোকেদের ধরে নিয়ে আসার ক্ষমতাও আমার নেই। বক্তা বলছেন, বলুন আপনারা কজন রামের পক্ষে আর রাবণের পক্ষে কজন? স্বাভাবিক, সবাই রামের পক্ষেই হাত তুলেছে। তারপরেই বলছেন – এবার যদি রাবণের সোনার মূর্তি হয়, আপনারা কজন নেবেন না? কেউ আর হাত তুলছেন না। এটা কোন আর্গুমেন্ট হল? সোনার মূর্তি যখন তারা নেবে তারা কি রাবণকে রাবণ রূপে নিতে চাইছে নাকি? রাবণের সোনার মূর্তিটা সোনার জন্য নিতে চাইছে। আর লোকেরা হাততালি দিচ্ছে, হাহা হিহি করছে। আজকে ধর্মের এই দুরবস্থা হয়ে গেছে।

পরিচিতরা কেউ কেউ আমাকে টুকটাক এই ধরণের কিছু ভিডিও ফরোয়ার্ড করে। আমি কিছুই দেখিনা; মেসেজ পড়ি না, ছবি দেখি না, দেখার প্রশ্নই নেই। কারণ কখন যে এদের মামার গোয়ালে ঘোড়া ঢুকে যাবে বলা মুশকিল। শাস্ত্রের পারায়ণ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় নেই, তাতে দুটো ব্যাখ্যা করলেন; তার বেশি করতে নেই। এটাই আমাদের ভারতবর্ষের পরম্পরা, লেকচার দেওয়া আমাদের পরম্পরা না। দশজন বড়লোক যারা ধর্মের কোন কথা শোনে না, এই ধরণের অনেকেই আমাকে অনেক জায়গা থেকে ডাকে, আমি হাতজোড় করে বলি, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আপনি যা শুনতে চান, আমি তা বলতে পারব না; আমি যেটা বলি আপনি সেটা বুঝতে পারবেন না'। এদের মন এখন পুরো মজে রয়েছে টাকা-পয়সায়, ধর্মের কথা কি বুঝবেন এরা। সেইজন্য বললাম, আপনারা এখানে যাঁরা শুনছেন আপনারা বিশেষ। ঠাকুর তাই আপনাকে কষ্ট দেবেনই। সামাজিক ভাবে, মনের দিক থেকে আর শরীরের দিক থেকে, এই তিনটে থেকে মানুষ যখন কষ্ট পায়, তখন যে যেখানে আছে, ওটা খসে পড়ে যায় আর একটু এগিয়ে যায়।

মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*, বা আমার টিয়া বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরা ওখানে দেখে থাকবেন –আমাদের যে বিভিন্ন অনুভূতিগুলি হয়, সেখানে সুখের অনুভূতিতে আমরা বসে থাকতে চাই; কারণ ওই অবস্থায় থাকতে ভাল লাগে, আরাম পাই। যেখানেই আমরা কষ্ট পাই, দুঃখ পাই, মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। হয়ত এমন কোন পরিস্থিতি আছে, মা-বাবা এমন, স্বামী-স্ত্রী এমন, সেখান থেকে বেরোতে পারছে না; কিন্তু মনের দিক থেকে একেবারে ঠিক করে নিয়েছেন – আর না। যখন মৃত্যুশয্যায় পড়ে যাবে, তখন এটাই মনে আসবে –আর না। ফিরে ফিরতি বুঝি এদের একটা বড় কাণ্ড হবে। আমি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবি মানি, এই আলোচনা আপনারা যাঁরা শুনছেন, এতে একটা তো প্রস্তুতি হল। ফিরে ফিরতি আপনারা যদি বেরিয়ে এসে একটা বড় কাণ্ড করেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

আমাদের একজন শ্রোতা আছেন, ভদ্রলোকের সাথে যোগাযোগ হল, করিমগঞ্জের লোক। গীতা, উপনিষদ মুখস্ত করেছেন আবার পরিচিতদের আর ইয়ং যাদের জানেন, তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে কিছু কিছু শ্লোক মুখস্ত করিয়েছেন। শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমারও তো এই স্বপ্ন ছিল। এদের মধ্য থেকেই কেউ একজন উৎসাহিত হয়ে আরও তার পরিচিত দু-একজনকে বলবে। অথচ বেশির ভাগ যাঁরা আসেন, বলবেন, মহারাজ কেউ শুনতে চায় না। শুনতে চাইবে না কেন। আপনার সঙ্গে যদি আমাকে কথা বলতে হয়, আমি নিশ্চয় কথা বলব; আধ ঘন্টা কথা বলব, কিন্তু পাঁচ মিনিট আমার সঙ্গে শ্লোক পাঠ করতে হবে। শেখাবার ইচ্ছা থাকলে হাজারটা উপায় পেয়ে যাবেন। বাচ্চারাও তো পড়তে চায় না, তারপরেও তো তাদের পড়ানো হয় কিনা। আপনিও কেন পারবেন না। একজন কি দুজনকে আপনি উদ্বুদ্ধ করুন, এই পথে নিয়ে আসুন। আমি বাইরের অনেককে জানি যাঁরা নিজের বাচ্চাদের কিছু কিছু মুখস্ত করাচ্ছেন। ফিরে ফিরতি আশা করি আপনারাই বিরাট কাণ্ড করবেন। আবার ঠাকুর নিজের কথা বলছেন। যাঁরা খুব উচ্চমানের এই পথের পথিক, তা ভক্তিপথেরই হোক বা জ্ঞানমার্গেরই হোক; তাঁরা কার সাথে কথা বলবেন?

তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। প্রেমিক প্রেমিকার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, কারণ জীবনে আর কিছু নেই কিনা, মন ওর মধ্যেই ঘুরঘুর করছে। **আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম**। অনেক বড় বড় মহারাজদেরও দেখেছি, আর আমাদের শ্রোতাদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন বলেন –মহারাজ, কারুর সাথে কথা বলতে ভাল লাগে না; কথা বলতে গিয়ে কি কথা বলব। **বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো**। তাদের কথায় আপনার কোন রুচি নেই, আর আপনার কথা তারা বুঝবে না। যদি ওরা বুঝতে চায়, বুঝতে চাইলেও বুঝবে না।

তখন কলকাতায় এলে ডাব-চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনেছিলুম যাতে অসুখ ভাল হয়। এই যে আপনজন যাঁরা, যাঁদের আপনি ভালবাসেন, তাঁদের কোন বিপদ হলে কি আর করবেন; এই মন্দির সেই মন্দিরে গিয়ে মানত করবেন। ঠাকুরের এখানে কোন স্বার্থ নেই। ভগবান অবতার হয়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য এসেছেন, দু-একজনের সঙ্গ তাঁর চাই, যাঁদের সঙ্গে দুটো কথা বলবেন, যাঁরা তাঁর কথা বুঝবেন। অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করছেন, *স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত*, স্থিতধী পুরুষ কিভাবে কথা বলেন; তাঁরা এই ধরণের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। বাকিদের সঙ্গে হাই হ্যালো। যীশু শিষ্যদের বলছেন, সবার সঙ্গে ইয়ে ইয়ে নে নে করে বেরিয়ে যাবে।

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাঁহার জন্য ব্যাকুলতার কথা সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এবার কিন্তু অত হয় নাই। ঠিক কথা বলব। ঠাকুর জানতেন, এবার কেশবের খেলা শেষ, নূতন শরীর ধারণ করবেন। এই জন্মে যা শিখে নিয়েছেন, মন একই থাকবে; পুনর্জন্মে মন সেটাই থাকে। আমরা খ্রীশ্চান ও মুসলমানদের মত চিরস্বর্গ, চিরনরক মানি না। আমরা মানি, এই জন্মে যা কিছু করা হয়েছে, এটারই সংস্কার ও ফল নিয়ে জন্মাব। এইভাবে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে এগিয়ে যাবে, যেটা ঠাকুর তাঁর ভাষায় বলছেন –ধীরে ধীরে ফিরে ফিরতি একটা বড় কাণ্ড হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। ঠাকুর একেবারে বিস্তারে বলছেন।

কিন্তু দু-তিনদিন একটু হয়েছে। পুরো বিস্তারে বলে দিচ্ছেন, কোন দিন প্রাণ কতটা আটুপাটু করেছে। আসলে মন এই স্তরে চলে গেলে মন এত সরল হয়ে যায় যে, সবটাই বলে দেবেন। যাঁরা শুনছেন, তাঁরা মনে করবেন, এত কিছু বলার কি দরকার, কেমন বোকা বোকা মনে হবে। আসলে আমাদের মন খুব জটিল, জটিল লোকেরা সরলদের বুঝতে পারে না, বোকা ভাবে। সরলরা আরও বেশি, জটিলরা কি বলে কিছুই বুঝতে পারেন না। কেশবের মা এসেছেন, বয়স হয়ে গেছে।

পূর্বদিকের যে দ্বার দিয়া কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়া জননী আসিয়াছেন।

সেই দ্বারদেশ হইতে উমানাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, 'মা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।' কেশব সেনের মা ঠাকুরের থেকে বয়সে কত বড়, কিন্তু তিনি জানেন বোঝেন, ঠাকুর একজন ঈশ্বরীয় পুরুষ।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। উমানাথ বলিতেছেন, 'মা বলছেন, কেশব্দের অসুখটি যাতে সারে।' ঠাকুর বলিতেছেন, 'মা সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি দুঃখ দূর করবেন।'

ঠাকুর অসুখ দূর করবেন বলছেন না; বলছেন, দুঃখ দূর করবেন। ঠাকুর ঘুরেফিরে জানিয়ে দিচ্ছেন, ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া কোন পথ নেই। ঈশ্বর আপনার অভাব দূর করবেন না, ঈশ্বর আপনার অসুখ সারিয়ে দেবেন না; তিনি আপনার দুঃখ দূর করে দেবেন। বাইবেলে আমরা খুব সুন্দর এই জিনিসটা পাই। যীশুকে যখন ক্রুশিফাই করা হয়েছে, তখন তিনি বলছেন –প্রভু, তুমি আমায় ছেড়ে দিলে; কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে গেলেন। মায়ের সন্তান মারা গেছে, ভগবান সন্তান ফিরিয়ে দেবেন না, কিন্তু প্রার্থনা করলে মায়ের দুঃখটা দূর করে দেবেন। সেইজন্য ভক্তিগীতি, কাহিনী যেখানেই দেখবেন, তিনি এই দেন, সেই দেন, এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতে নেই।

তিনি ত্রিতাপহর্তা, তিনটে তাপকে তিনি হরণ করেন। তার মানে আপনার দেহ থেকে, মন থেকে বা বাইরে থেকে যে তাপ সৃষ্টি হয়েছে, সেই তাপকে তিনি সরিয়ে দেন, তাই তাঁর নাম ত্রিতাপহর্তা। বন্যায় বাড়ি ভেঙে গেলে তিনি এসে বাড়ি বানিয়ে দেবেন না, বাড়ি কি করে বানাতে হবে সেটাও বলবেন না; এগুলো সমাজের কাজ, রাষ্ট্রের কাজ, তারা করবে। বড় বাড়ি থেকে যদি ছোট বাড়িতে থাকতে হয়, সেটা থেকে যদি দুঃখ হয়, সেখানে যদি আপনি প্রার্থনা করেন, ভগবান তখন আপনার এই দুঃখটা দূর করে দেবেন, এগুলো বুঝতে হয়। হিন্দুদের জীবনের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক ভাবে এগিয়ে যাওয়া। স্ত্রী, স্বামী, পুত্র সবই ওটারই জোগান। এখন কোন কিছু যদি এর মধ্যে হারিয়ে যায়, এই অভাব পূরণ হবে না। আমাদের যত ঠিক ঠিক শাস্ত্র আছে, সেখানে আমরা কোথাও এগুলো পাইনা। যেটা পাওয়া যায়, তা হল –প্রার্থনা করলে দুঃখ দূর হয়। এগুলো পড়ে, এগুলো শুনেও যদি চেতনা না জাগে, কিছু বলার নেই। যখনই জীবনে কোন কিছু নিয়ে দুঃখ পাবেন, তখন এই কথাটা সবারই মনে করা উচিৎ। প্রার্থনা করতে হয়; প্রার্থনায় আপনার অভাব মিটবে না, কিন্তু দুঃখ মিটবে। এবার ঠাকুর যে কথা বলতে যাচ্ছেন, এটা অত্যন্ত জরুরী, বিশেষ করে আপনাদের জন্য খুব জরুরী, যদিও ইদানিং ঘরবাড়ির সিস্টেম পাল্টে গেছে।

কেশবকে বলিতেছেন –

বাড়ির ভিতরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরও ডুববে, ঈশ্বরীয় কথা হলে আরও ভাল থাকবে।

মেয়েরা বলতে, মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন সবাইকে নিয়ে বলছেন; আসলে ওনারা স্বভাবে হলেন ইমোশানাল আর সংসারকে ওনারা চালাচ্ছেন। ওদের সাথে যদি সব সময় ওঠাবসা করেন, আপনার মধ্যে সংসারের ভাব বেড়ে যাবে। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ঈশ্বরীয় চিন্তন করার জন্য আপনাকে অবশ্যই ওদের থেকে দূরে থাকতে হবে। কাঁচা মনের লোকেরা এই নিয়েই অনেক কথা বলবে, বাড়ির মা, বোনদের কি আপনি খারাপ মনে করছেন, ওনারা তো আমাদের ভালর জন্যই আছেন, আমাদের ভাল-মন্দ সব ওনারাই তো দেখেন। এখানে ভাল-খারাপ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে না।

আপনি কি ঈশ্বরের পথে যেতে চান কি, চান না? এই কথাগুলো যদি না বুঝতে পারেন বা না বুঝতে চান, তাহলে বুঝবেন আপনার এই পথে আসার এখনও সময় হয়নি। বোঝার জন্য একটা প্রস্তুতি

লাগে, প্রস্তুতি না থাকলে কিছু না বুঝেই সঙ্গে সঙ্গে তর্কে নেমে যাবে। আগেকার দিনে পরিবারগুলো বড় হত, অনেক লোক থাকতেন; ঈশ্বরীয় ভাবে যাঁরা থাকতে চান, খুড়ি-জ্যেঠি-পিসিদের সঙ্গে বেশি থাকলে ঈশ্বরীয় ভাব আপনার আসবে না। এমনিতেই বলা হয়, মেয়েদের সঙ্গে থাকতে থাকতে একটা মেয়েলি স্বভাব এসে যায়। মেয়েলী স্বভাব খারাপ কিছু না, কোন দুর্বল স্বভাব তাও না; কোন মা দুর্বল হন না, কিন্তু ওনাদের মধ্যে সংসারী ভাবটা বেশি থাকে। ওই যে পৌরুষ ভাব, যেটা সংসার বন্ধনকে কেটে বেরিয়ে নিয়ে যাবে; ওই পৌরুষ ভাবটা কমে যায়। ঈশ্বরীয় কথা যত শুনবেন ওই পৌরুষ ভাবটা তত ভিতরে আসবে। কথাগুলো ঠাকুর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বললেন। এগুলোই হল বেদবাক্য।

গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলিয়া আবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। কেশবকে বলছেন, "দেখি, তোমার হাত দেখি।" ঠাকুর এই জিনিসগুলো মাঝে মাঝে করতেন। ঠাকুর শরীরের অনেক কিছু দেখে বুঝতে পারতেন সামনের মানুষটি চেতনার কোন স্তরে অবস্থান করছে। **ছেলেমানুষের মত হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন। অবশেষে বলিতেছেন, "না, তোমার হাত হালকা আছে, খলদের হাত ভারী হয়।" (সকলের হাস্য)** হাত হালকা হওয়ার সাথে কি সম্পর্ক আমার ঠিক জানা নেই, কিছু নিশ্চয় একটা হবে, যেটা ঠাকুর জানতেন। ইদানিং জিম আদিতে গিয়ে যারা মাসেল বানায়, তাদের হাত দেখে ঠাকুর কি বলতেন জানি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি এত বড় যোদ্ধা, সুদর্শন চক্র এক আঙুলে ঘোরাতেন আর অশ্বত্থামা সেই চক্র দু-হাত দিয়েও তুলতে পারলেন না, অথচ তাঁর শরীর ছিল অত্যন্ত কোমল।

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে বার বলিতেছেন, "মা বলছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর স্বরে) –আমার কি সাধ্য! তিনিই আশীর্বাদ করবেন। 'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।' ঠাকুর এগুলো করতেন না। তবে এগুলো পুরোপুরি যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কাউকে কপি করতে হবে তা না। ঠাকুর যেহেতু আশীর্বাদ করতেন না, আমিও তাই কাউকে আশীর্বাদ করতে যাব না; এই ধরণের কিছু না। এক একজনের এক এক রকম ভাব। আসলে আশীর্বাদ আদি করতে গেলে নিজেকে একটু উঁচু বলে মনে হয়। আমরা তো সাধু-সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ পেয়েই এতটা এসেছি, না হলে আমাদের কি সেই ক্ষমতা ছিল এতটা পথ এইভাবে একটা ভাবকে দৃঢ় ভাবে ধরে এগিয়ে যাওয়ার।

ঈশ্বর দুইবার হাসেন। ঠাকুরের এই ধরণের কথাগুলো হল সাধকদের বোঝানর জন্য যে, 'আমি' ভাব যেন না আসে। **একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে; আর দড়ি ফেলে বলে, 'এ-দিক্‌টা আমার, ও-দিক্‌টা তোমার'! ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে এ-দিক্‌টা আমার ও-দিক্‌টা তোমার**! গ্রাম দেশে এই কথাগুলো খুব চলে। হিন্দিতে নামকরা একটা প্রবাদ আছে –সবে ভূমি কপাল কি। সব ভূমিই তাঁর। কিন্তু বাঁচার জন্য এগুলো করতেই হয়। মিলেমিশে কাজ করার সময় বলা হয়, তোমার জমি আমার জমি, আমার জমি তোমার জমি, এগুলো মুখেই হয়; ভিতরে ভিতরে ষোল আনা হিসাব আছে। এভাবে জগৎ চলে না।

ঈশ্বর আর-একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন! মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে, 'ভয় কি মা, আমি ভাল করব' বৈদ্য জানে না ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে!' (সকলেই নিস্তব্ধ) ইদানিং কালের অনেক ডাক্তারদের দেখি, তাঁরা বলেন, দেখুন আমাদের যা করার করলাম, এবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, আমার হাতে কিছু নেই। ইদানিং কালের অনেক ডাক্তারদের এই চেতনাটুকু দেখা যায়।

ঠিক এই সময় কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন। সে কাশি আর থামিতেছে না। সে কাশির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কষ্ট হইতেছে। অনেক কষ্টের পর কাশি একটু বন্ধ হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজ ও বেদোল্লিখিত দেবতা –গুরুগিরি নীচবুদ্ধি

(অমৃত –কেশবের বড় ছেলে –দয়ানন্দ সরস্বতী)

এরপর ঠাকুরকে একটু মিষ্টিমুখ করানো হল। কেশবের বড় ছেলে ঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন।

অমৃত বলিলেন, এইটি বড় ছেলে। আপনি আশীর্বাদ করুন। ও কি! মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করুন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার আশীর্বাদ করতে নাই।"

এই বলিয়া সহাস্যে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি অনেক মহারাজদেরও দেখেছি, সহজে কারুর মাথায় হাত দিতে চান না, কেউ কেউ অবশ্য দেন। স্বামী স্মরণানন্দজীকে দেখেছি, কেউ যদি মাথায় হাত দিতে বলতেন, উনি খুব বিরক্ত হয়ে যেতেন। সবাই যে দেন না, তা না, কেউ কেউ দেন।

অমৃত (সহাস্যে) –আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলান। (সকলের হাস্য) আমরা হিন্দুর মানি, কেউ মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলে ঠিক ঠিক আশীর্বাদ হয়। **ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কেশবের কথা কহিতেছেন**।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত প্রভৃতির প্রতি) –"অসুখ ভাল হোক" –এ-সব কথা আমি বলতে পারি না। সত্যিই মুশকিল, কারণ ঠাকুর হলেন সত্যসঙ্কল্প। নরেনকে ঠাকুর বলে দিলেন, যা, তোর আর মোটা ভাত আর মোটা বস্ত্রের অভাব হবে না, আর সত্যিই অভাব হল না। ঠাকুর হলেন সত্যসঙ্কল্প। আমরা সমাজে অনেক সময় কাউকে বলি, আমি সত্য কথা বলব; গান্ধীজী যেমন সত্যের অনুশীলন করতেন; কিন্তু ঠাকুর তা নন। তিনি সত্যসঙ্কল্প; কাউকে যদি কিছু বলে দেন, সেটা হতে বাধ্য। তাতে অনেক ধরণের সমস্যা এসে যায়। কপালে যা লেখা আছে, সেটা মুছে যাবে; কর্মে যেটা আছে সেটা কেটে যাবে। **ও-ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না। আমি মাকে শুধু বলি, মা আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও**। কিছু চাইতে নেই, চাওয়ার কি আছে। তোমাকে ভালবাসি; হয়ে গেল; ছেলেও যদি সারাক্ষণ বলতে থাকে, মা, এটা দাও, সেটা দাও; মাও বিরক্ত হয়ে যায়।

ঠাকুর কেশবের কথা বলছেন –ইনি কি কম লোক গা। যারা টাকা চায়, তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে। এটা যে কত উচ্চমানের কথা। যেমন ভগবান শিব, গৃহস্থদেরও তিনি ইষ্ট আবার সন্ন্যাসীদেরও তিনি ইষ্ট। কেশব সেনকে যাদের টাকা আছে তাঁরাও মানছেন, আবার সাধুরাও মানছেন। কেশব সেনকে যে ঠাকুরই দেখতে যেতেন তা না, দয়ানন্দ সরস্বতীও কেশবকে দেখতে এসেছিলেন। সাধুরা সহজে গৃহস্থদের সঙ্গে দেখা করতে যান না। বিশেষ করে সম্মানের খাতিরে, কোন কাজের জন্য গেলেন সেটা অন্য ব্যাপার।

ঠাকুর দয়ানন্দের প্রসঙ্গ এনে বলছেন –**দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর-বাহির করছে –কখন কেশব আসবে! সেদিন বুঝি কেশবের যাবার কথা ছিল**। এরপর অন্য প্রসঙ্গে ঠাকুর কথা বলছেন।

দয়ানন্দ বাঙলা ভাষাকে বলত –'গৌড়াণ্ড ভাষা'।

ইনি বুঝি হোম আর দেবতা মানতেন না। তাই বলেছিল ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না?

ঠাকুর কেশবের শিষ্যদের কাছে কেশবের সুখ্যাতি করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেশব হীনবুদ্ধি নয়। ইনি অনেককে বলেছেন, "যা যা সন্দেহ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে।" ঠাকুরের কাছে যাওয়ার কথা বলছেন। গুরুগিরি করার ভাব কেশব সেনের মধ্যে ছিল না। 'যা আছে আমার কাছেই আছে, আর কারু কাছে নেই' এই ভাব কেশবের ছিল না। ঠাকুর বলছেন, **আমারও স্বভাব এই। আমি বলি, ইনি আরও কোটিগুণ বাড়ুন। আমি মান নিয়ে কি করব?** ঠাকুর বাছা বাছা কয়েকজনের জন্য ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন জানতেন যে, সব কিছুর উত্তর তাঁর কাছে নেই, তিনি তাই সংশয় মেটাবার জন্য ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আবার দ্বিতীয়বার ঠাকুর বলছেন –

ইনি বড়লোক। টাকা চায় যারা, তারাও মানে, আবার সাধুরাও মানে। এই জিনিস যদি আপনার জীবনে হয়, তাহলে বুঝবেন আপনি কিছু হয়েছেন। যাদের টাকা-পয়সা আছে, ক্ষমতা আছে, তারাও আপনাকে মানে, আবার সাধুরাও আপনাকে মানে। জীবনের উদ্দেশ্য কি? যারা ক্ষমতাবান তাঁরাও আপনার কাছে আসবেন, সাধুরাও আসবেন; তার মানে, আপনাকে মানবে, কোন লোভে না।

সব শেষে ঠাকুর এবার বেরিয়ে আসছেন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে কিনা। **সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নিচে আলো নাই। তখন অমৃতাদি ভক্তদের বলিলেন, এ-সব জায়গায় ভাল করে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র হয়। এরকম যেন আর না হয়**।

আমাদের পুরো ভারতবর্ষে নিয়ম আছে, সন্ধ্যেবেলা সব ঘরে, বাইরে আলো জ্বালিয়ে দিতে হয়। সব জায়গায় প্রদীপ দেখানোর প্রথা ছিল। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সব ঘরে, বারান্দায় আলো জ্বালাতে হয়, পরে নিবিয়ে দিলেন। আমাদের বিশ্বাস যে, সন্ধ্যাবেলা আলো দেখলে মা লক্ষ্মী নাকি ঘরে আসেন। এইবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। ওই দিনেই ঠাকুর কেশব সেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত্রি ৭টার পর মাথাঘষা গলিত শ্রীযুক্ত জয়গোপালের বাটি যাবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়িতে শুভাগমন

ইংরেজী ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ ৩১০)। **আজ বেলা ৪টা-৫টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কমলকুটির নামক বাটীতে গিয়াছিলেন। কেশব পীড়িত, শীঘ্রই মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন। কেশবকে দেখিয়া রাত্রি ৭টার পর মাথাঘষা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপালের বাটীতে কয়েকটি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আগমন করিয়াছেন**।

মাস্টারমশাই প্রায় এক পাতা ধরে ঠাকুরের জীবন, ঠাকুরের সাধনা, ঠাকুরের কথা, এই জিনিসগুলিকে নিয়ে খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন। অনেক লোকজন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এ-রকম হয়। সাধু-সন্ন্যাসী, বিশেষ করে কোন নামকরা মানুষ বাড়িতে আসার থাকলে বাড়ির লোকেরা আগে থেকে অনেককে খবর দিয়ে রাখেন। অনেক আগে আমাকে এক-আধবার এখানে সেখানে যেতে হয়েছিল, খুব কম। এখন তো মনে হয় না যে, গত পনের বছরে আমি কোথাও গেছি। গিয়ে দেখি সেখানে অনেক লোক দেখা করতে এসেছেন, ওনাদের আগে থেকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন।

মাস্টারমশাই সেদিনকার কথা লিখতে গিয়ে ভূমিকাতে একটা বর্ণনা দিচ্ছেন। আমি আর এই অংশটা পাঠ করছি না, পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন মাস্টারমশাই কি বলছেন। শেষের দিকে তিনি নিজের মনের কথা নিজের মত করে খুব সুন্দর করে একটা ছোট্ট প্যারাগ্রাফে বলছেন।

আচ্ছা, যারা দুর্বল, যাদের সে প্রেমোদয় হয় না, যারা সংসারী জীব, যাদের পায়ে মায়ার বেড়ি, তাদের কি উপায়? দেখি, এই প্রেমিক বৈরাগী কি বলেন।

বাংলাতে কিছু কিছু expression এত সুন্দর; আসলে কি হয় দু-চারটে ভাষা জানা থাকলে বোঝা যায় কোন ভাষার বৈশিষ্ট্য কি; শুধু নিজের ভাষায় দখল থাকলে ওটা বোঝা যায় না। কারণ আপনি যেটা জানেন, সেটাকেই আপনি মনে করবেন, এটাই সবচেয়ে ভাল। ছোটবেলা আমি গ্রামে ছিলাম, সেই সময় আমাদের প্রবন্ধ লিখতে হত 'আমার গ্রাম', সেখানে লিখতাম, আমার গ্রামের মত গ্রাম আর কোথাও নেই। এটা কিন্তু কথার কথাতে লিখতাম না, পুরো বিশ্বাসে লিখতাম। তারপর গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলাম, জগৎ দেখলাম, নিজের গ্রামটি ভাল, কিন্তু এমন কিছু না। ঠিক তেমনি অন্য ভাষা একটু জানা থাকলে বোঝা যায় অন্য ভাষাও কত সুন্দর। এই 'প্রেমিক' শব্দ সাধকদের জন্য, এটা কিন্তু সাধারণ লোকেদের জন্য ব্যবহার হয় না।

কম বয়সে একজন মহারাজ ব্রহ্মচারী অবস্থায় আমার ব্যাচমেট ছিলেন, উনি একজন সাধুর নামে আমাকে বললেন, 'উনি খুব প্রেমিক সাধু', তখন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। অনেক পরে গিয়ে বুঝলাম, প্রেমিক সাধু কি। মাস্টারমশাই এখানে 'প্রেমিক বৈরাগী' শব্দ ব্যবহার করছেন। এগুলো খুব উচ্চমানের ভাব। প্রেমিক মানে হয়, যিনি সবাইকে ভালবাসেন, কাউকে বাদ দেন না; আর বৈরাগী, অর্থাৎ সংসার থেকে যিনি আলাদা। দুটো শব্দের মধ্যে কেমন একটা যেন বিরোধ। ঠাকুর প্রকৃতপক্ষে তাই ছিলেন। একাধারে জ্ঞান, ভক্তি; শুধু জ্ঞান না, জ্ঞানের সাথে বৈরাগ্য, সংসার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; তার সঙ্গে প্রেমিক। দুটি শব্দ দিয়ে ঠাকুরের যে বর্ণনা করছেন, ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব যে কি, পুরোটাই বেরিয়ে আসছে। এগুলোই সত্যিকারের কবিতা। যখনই কোন ভাব আপনি সামনে রাখতে চাইছেন, তখন যে দুটি কি তিনটি শব্দে অনেক কিছু বলা হয়ে যায়, ওটাই হয়ে যায় কাব্যিক। কাব্যিক মানে ছন্দ না, কাব্য হয় যখন একটা ছোট্ট বাক্যাংশ, তাতে অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে; এই যেমন ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'প্রেমিক বৈরাগী'। মাস্টারমশাই এটা নিজের মত চিন্তা করছেন।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট –সম্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ। একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলি প্রস্তুত ছিলেন।

এটা একটা খুব সুন্দর পরিস্থিতির বর্ণনা। জানিনা আপনাদের কি ভাব, অনেক সময় মনে হবে ঠাকুরকে এত প্রশ্ন করা কেন। আমি এক-আধবার স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী মহারাজের নাম নিয়েছি, এখন তিনি গত হয়েছেন, একটা সময় সঙ্ঘ ছেড়ে দিয়েছিলেন; আমাকে উনি খুব স্নেহ করতেন। খুব বেশি দিন আমরা এক সঙ্গে ছিলাম না, দশ বছরের মত। সঙ্ঘে এসে ওনার কথা অনেক শুনেছিলাম। দু বছরের জন্য বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে সব ব্রহ্মচারীদের থাকতে হয়, আমিও ছিলাম। উনি সেই সময় পাটনা আশ্রমে ছিলেন। কোন কাজে আমাকে পাটনা যেতে হয়েছিল। উনি সেই সময় আমাকে রাম মহারাজের সম্বন্ধে, যাঁর কথা আমি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকি, ঠিক এই কথা বলেছিলেন। রাম মহারাজ যেন মৌচাক, টোকা দিলে মধু ঝরে, প্রশ্ন করলে মধু ঝরে। সোমেশ্বরানন্দজী সবাইকে আপনি করে সম্বোধন করতেন, আমাকেও আপনি করে ডাকতেন। আমি তখন পঁচিশ বছর বয়সের একজন ব্রহ্মচারী, রামকৃষ্ণ মিশনে একেবারেই নূতন। এই expressionটা তখন আমার কাছে একেবারে নূতন ছিল।

যাঁরা খুব উচ্চমানের, অতি উচ্চমানের আচার্য, তাঁরা নিজে থেকে কথা বলেন না। হয় আপনার মনের ভাব বুঝে কথা বলবেন, না হয় তো তাঁকে একটা টোকা দিতে হবে। গাছে একটা মৌচাক দেখলেন, আপনি একটা পাথর ছুড়ে মারলেন, কি একটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন অমৃতধারা নেমে আসছে। আমরা যে প্রশ্ন করি, বেশির ভাগ সময় প্রশ্নগুলো করা হয়, দেখতে চাইছি যে উনি এই প্রশ্নের উত্তর জানেন কিনা। কোন পরিচিত দেখা করতে এসেছেন, সঙ্গে তাঁর বাচ্চাও এসেছে। সাত-আট বছরের বাচ্চাটি যে ধাঁধাগুলো শিখে এসেছে, সেগুলোকে নিয়ে সে আমাকে পরীক্ষা করবে।

একবার দেখেছিলাম, খুব বিচক্ষণ একজন অধ্যাপক নিজের বাচ্চাকে বলছেন, 'তুমি যেটা জানো সেটা ওনাকে জিজ্ঞেসে করো না, যেটা জানো না সেটা জিজ্ঞেস করো'। খুব ইন্টারেস্টিং, যাঁরা

পণ্ডিত মানুষ তাঁরা কিভাবে কথা বলেন। কি সুন্দর নিজের বাচ্চাকে বলছেন, মহারাজকে সেটি জিজ্ঞেস করো না, যেটা তুমি জানো; যেটা জানো না, সেটাই জিজ্ঞেস করো। আমার জীবনে এটা খুব বড় সৌভাগ্য যে, বেশ কিছু সুসংস্কৃত লোকের সঙ্গ পেয়েছি। ভদ্রলোক আইআইএমের প্রফেসার ছিলেন। প্রশ্ন যখন করা হয়, তখন একটা হল, আপনি কতটুকু জানেন। আমাকেও অনেকবার এই রকম লোকের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

দ্বিতীয় হয় –শ্বশুর মশাই আপনার কি বিয়ে হয়েছে? একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এসে একদিন দেখা করতে এসেছেন, আমাদের লেকচারগুলো শোনেন। দেখা করতে এসে আমাকে বলছেন, 'মহারাজ, ঠাকুরের দুটো কথা বলুন'। একটাই কথা শ্বশুর মশাই আপনার কি বিয়ে হয়েছে? আপনি দেখা করতে এসেছেন, দেখা হল, হয়ে গেল। আমি বললাম, 'আপনার বয়স হয়েছে, এখনও আপনি ছেলেমানুষী প্রশ্ন করছেন? ধৈর্য ধরে বসতে হয়, ধৈর্য ধরে শুনতে হয়। আর প্রশ্ন ওটাই করবেন, যেটা আপনি জানেন না'। তৃতীয় হয় বাদ। বাদ হল, শিষ্য যখন গুরুকে প্রশ্ন করে; 'আচার্য, এটা আমার জানা নেই, যদি বলে দেন'। স্কুলে ছাত্ররা শিক্ষকদের যে প্রশ্ন করে, এটা বাদ। চতুর্থ হল, আপনি জানেন না, তখন আপনি আচার্যকে গিয়ে একটা টোকা দিলেন, এবার উনি বলতে থাকবেন। ওই যে আপনি প্রশ্নটা করলেন, বা একটা কথা বললেন, তাতে শ্রদ্ধা থাকবে, শোনার আগ্রহ থাকবে; প্রশ্ন করার মধ্যে এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে থাকতে হবে।

এখানে এই যে প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে, যে প্রসঙ্গটা এখন চলতে থাকবে, এখানে বলা খুব মুশকিল প্রতিবেশীর মনে উপরে উল্লেখিত চারটে ভাবের কোন ভাবটা ছিল। কারণ তখনকার দিনে ঠাকুরের সেই রকম নামডাক ছিল না। ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারমশাই আছেন, মাস্টারমশাই ছাড়াও ঠাকুরের সঙ্গে আরও কয়েকজন আছেন।

ইদানিং ওই বাবাজী, সেই বাবাজী, ফাইভ স্টার বাবাজী এনাদের এখন একটাই আধ্যাত্মিক উপদেশ –মাংস মছলি মত খাও। এটা একটা আধ্যাত্মিক গুরুর শিক্ষা? 'চন্দ্রগ্রহণকে বাদ নাহানা', এটা কি কোন আধ্যাত্মিক গুরুর শিক্ষা? এগুলো তো পুরোহিতদের কাজ। লোকেরা এখন এসবই গিলছে, দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে শুনতে। আর তার সাথে যদি কোন ফিল্মস্টার, কোন নেতা সেখানে পৌঁছে গেল, তাহলে তো আর কথা নেই। আমি যখন দেখি ঠাকুরের ইদানিং অনেক ভক্তরাও এদের প্রবচন শুনছে, তখন আমি ভাবি; এরা কাকে অপমান করছে? নিজের বুদ্ধিকে, নাকি ঠাকুরকে? ঠাকুরের এই উদার ভাব, মহাসমুদ্রের ভাব, তারপরেও ঠাকুরের ভক্তরা এইসব বাবাজীদের শুনতে যায়? এর উত্তর আমার জানা নেই।

মাস্টারমশাই বলছেন, **তিনিই অগ্রণী হইয়া কথারম্ভ করিলেন। জয়গোপালের ভ্রাত বৈকুণ্ঠও আছেন**।

বৈকুণ্ঠ –আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন?

আপনারা বলবেন, 'আপনাকে যদি আমরা এই প্রশ্ন করতাম আপনি তো আমাদের মহারাজ ধমক দিয়ে বসিয়ে দিতেন, ঠাকুরও তো বকে দিতে পারতেন'। দেখুন, ঠাকুর ওখানে গেছেন কথা বলতে। যদি আমাকে কোথাও এই বলে ডেকে নিয়ে যায়, 'চলুন, ওখানে কিছু লোক আছেন যাঁরা আপনার মুখ থেকে ঠাকুরের কথা, শাস্ত্রের কথা শুনতে চান'। সেখানে তখন কথা বলাটাই আমার কাজ। কিন্তু এখানে আমি কাজে ব্যস্ত; কথা বলার জন্য এখানে বসে নেই। আপনি বলছেন, আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। দেখ তো হয়ে গেল, আর কি চাই।

আমাদের ব্যাখ্যাগুলোতে প্রায়ই দুই ধরণের সাধনার কথা আসে –প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে যেখানে সংসারে থাকে মানুষ কর্মের মাধ্যমে সাধনা করে

এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, বৈরাগ্য দিয়ে সাধনা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, গত একশ দেড়শ বছর থেকে লোকেদের ধারণা হয়ে গেছে, ধর্ম মানেই বৈরাগীর ভাব। ধর্ম বলতে বৈরাগী না। গৃহস্থ যাঁরা, সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের জন্যও ধর্ম, কিন্তু সেটা হল প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। আমাদের হিন্দু ধর্মে প্রথম থেকেই চারটি পুরুষার্থের কথা বলা হয় –ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এটাকেও আবার দেখি লোকেরা নিজের মত ব্যাখ্যা করছেন –যেমন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ধর্মকে নিয়ে যখন ব্যাখ্যা করেন, তখন বলেন, সমস্ত কিছু ধর্মে আধারিত হবে। কোথাও নেই এই কথা; চারটে পুরুষার্থের ধর্ম হল স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে যে কর্মগুলি করা হয়। মন দিয়ে শাস্ত্র না পড়লে এই হয়, না বুঝে না জেনে আবার তর্ক করবে। চারটি পুরুষার্থের মধ্যে অর্থ হল, অর্থোপার্জন করা। কিন্তু আপনি যদি শাস্ত্র মতে অর্থোপার্জন না করেন, এটাই কাঞ্চনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তারপর আসে কাম, কামভোগ শাস্ত্র মতে যদি না করেন, এটাই কামিনীতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ঠাকুর যেটাকে কামিনী-কাঞ্চন বলছেন, এটাই যখন শাস্ত্র মতে চলে, তখন এটাই দুটো পুরুষার্থ হয়ে যায় –অর্থ আর কাম। ধর্ম –এই যে বিভিন্ন ব্রতপালন, উৎসবাদি করা, তীর্থে যাওয়া, জপধ্যান করা; এগুলো সবটাই ধর্ম। মৃত্যুর পরে যে পরলোক গমন হয়, ওই গমনটা যেন অশুভ না হয়, তার জন্য ধর্ম পালন। স্বর্গপ্রাপ্তি, ভাল কুলে জন্ম, *শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্ট অভিজায়তে*, তার জন্য ধর্ম পালন। অর্থ, কাম ও ধর্ম; এই তিনটে হল গৃহস্থের জন্য। মোক্ষ একমাত্র সন্ন্যাসীদের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সবাই এখন মোক্ষকেই ধর্ম মনে করে, মোক্ষ ধর্ম নয়। লোকেরা এখনও কোথাও একটা ভুল ধারণা নিয়ে চলছে।

আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রো চ্যান্সেলার, শ্রীমৎ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী। উনি থেকে থেকে খুব রেগে যান আর বলবেন –আমাদের ভক্তগুলো ভুলভাল বুঝে এসে বলতে থাকবে –মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। আরে ভাই, ঈশ্বরদর্শন আপনাদের জন্য নয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য। বৃদ্ধাবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়ের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তখন সবাই এসে জানতে চাইবেন, মহারাজ মন কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখব? ইন্দ্রিয় আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকছে না, সেখানে আপনি করবেন মনের নিয়ন্ত্রণ! আবার জিজ্ঞেস করবেন, ঈশ্বরদর্শন কিভাবে হবে? বৃদ্ধ বয়সে এসে জানতে চাইছেন, ঈশ্বরদর্শন কিভাবে হবে? আপনার যে নাতিনাতনী আছে, আগে ওদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখুন, সেটা করলেও বুঝবেন ভাল কিছু করছেন। কিন্তু সেটাও পারবেন না, নাতিকে নাতি রূপেই দেখবেন।

এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাব বোঝা দরকার। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে প্রথমে দুটি শব্দ বলছেন –যুস্মদ্ ও অস্মদ্, *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয় গোচরঃ*। এর অনুবাদ করা খুব মুশকিল। যুস্মদ্ হল তুমি এবং অস্মদ্ শব্দের অর্থ আমি। এই যে তুমি ও আমি বোধ, এটাকে স্বামীজী অনুবাদ করছেন –আমার জগৎ তোমার জগৎ। আসলে স্বামীজীই সবচেয়ে ভাল অনুবাদ করেছেন। কারণ ইংরাজীতে যত অনুবাদ পাওয়া যায়, তাতে অর্থ পরিষ্কার হয় না। আচার্য শঙ্করের ভাষ্যকে যদি ব্যাখ্যা করা না হয়, বোঝা যায় না। আমি বোধ হল এই সংসার বোধ। আমি বলতে, আমার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব কিছু। আর জগৎ বলতে বাইরের সব কিছু। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনি আরও কিছু জিনিসকে নিজের ভিতরে টেনে আনেন; নিজের স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, টাকা-পয়সা ইত্যাদি বা এগুলো বাইরেও থাকতে পারে।

যুস্মদ্ প্রত্যয় অস্মদ্ প্রত্যয় অর্থাৎ আমি-তুমি এই বোধ যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ একজন বহির্ভূত ঈশ্বর, একজন ঈশ্বর বাইরে কোথাও বসে আছেন, এই বোধ থাকবেই। আর যতদিন এই বোধ থাকবে, ততদিন কারও মুক্তি হতে পারবে না, মোক্ষলাভ হতে পারবে না; ততদিন শুধু ধর্মসাধনের মধ্যেই নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ মানুষের আমি বোধ আছে, এই সংসারের বোধ আছে, যতক্ষণ আমি গৃহস্থ এই বোধ আছে, যতক্ষণ আমি সন্ন্যাসী এই বোধ আছে; ততক্ষণ তুমি বোধটাও থাকবে। তার মানে যতক্ষণ আমি বোধ থাকবে, ততক্ষণ তুমি বোধটাও

থাকবে। আর আমি-তুমি বোধ থাকলে তিনি বোধ থাকবে, থাকতে বাধ্য। এটাই পৌত্তিলকতা। এই যে বিশেষ ধর্মগুলি, এব্রাহামিক ধর্মগুলি পৌত্তিলকতার কথা বলে, এরা জানে না যে, যেমনি আমি, তুমি ও তিনি এসে গেল, এটাই হয়ে যায় পৌত্তলিকতা। এত কথা এরা জানেও না, বোঝাতে গেলে বুঝবেও না। যত বাবাজীরা প্রবচন দিয়ে বেড়াচ্ছেন, অজান্তায় সবাই হলেন আইডোলেটারস্। পৌত্তলিক কথাটা আমি অত্যন্ত নিন্দার সুরে বলছি।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন –আমি, তুমি আর তিনি; এই তিন বলে কিছু নেই। আর এটাকে বোধে বোধ করাকেই তিনি বলছেন, এটাই হল মানব শরীর ধারণের উদ্দেশ্য। কথামৃতে যে প্রসঙ্গটা চলছে, ঠাকুর ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়েই বলবেন। শাস্ত্র কখনই দু-রকম কথা বলেন না, আমি হিন্দুদের শাস্ত্রের কথা বলছি; তা আপনি গীতা পড়ুন, উপনিষদ পড়ুন, শঙ্করাচার্যকে পড়ুন, ঠাকুরকে পড়ুন; সবাই সেই একই কথা বলছেন। আসলে আমি আর তুমি বলে কিছু নেই। তাহলে কি আছে? একমাত্র তিনিই আছেন; তিনিই 'তুমি' হয়েছেন, তিনিই 'আমি' হয়েছেন –অহং ব্রহ্মাস্মি।

অহং ব্রহ্মাস্মি মানে এই না যে, আমরা বাচ্চা অবস্থায় বলতাম, উনি আমার বাবা, আমি ওনার ছেলে, আমিই ওনার ছেলে। ঠিক তেমনি, অহং ব্রহ্মাস্মিও মানে এই না যে, ব্রহ্ম বলে কেউ একজন আছেন, যিনি স্বর্গে বা কোথাও বসে আছেন, যাঁর দাড়ি-গোঁফ আছে, আমি কিন্তু সেই। ভেবে দেখবেন, বেশির ভাগই যাঁরা অহং ব্রহ্মাস্মি বলেন, তাঁরা এই ভেবেই বলেন। আপনার মনে হতে পারে, আমি এটা নিন্দার সুরে বলছি। একবার আমি এক জায়গায় ভাগবতের উপর বলতে গিয়ে অদ্বৈত নিয়ে কিছু কথা বললাম; ব্যাখ্যা করে বললাম, কিভাবে অদ্বৈত মানে শূন্য নয়, এক নয়। ওখানে আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট একজন খুব পপুলার মহারাজ ছিলেন। উনিও পরে আমাকে বললেন, আরে আমি তো এতদিন অদ্বৈত মানে এক ভাবতাম। আমি আর ওনাকে কিছু বললাম না, কি আর বলব। অদ্বৈত যখন বলছেন, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, তখন বলতে চাইছেন –আমি নেই, তুমি নেই, তিনি নেই; যা আছে মুখে বলা যাবে না –এটাই অদ্বৈত।

যতক্ষণ অদ্বৈতের এই জ্ঞান না আসে, ততক্ষণ আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে পৌত্তলিক। কারণ হয় আপনি বেদকে মানবেন, না হয় অন্য কোন শাস্ত্রকে মানবেন। গীতাতেও ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, কারণ বেদ তিনটে গুণে, সত্ত্ব, রজো ও তমোতে বাঁধা। শুধু বেদ না, প্রত্যেক শাস্ত্রই সত্ত্ব, রজো ও তমোতে বাঁধা। তাহলেই তো হয়ে গেল পৌত্তলিকতা। এবার আপনি ঠিক করুন, পৌত্তিলিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনি কোন সংস্থাকে মানবেন, কোন গুরুকে মানবেন? তাহলে অদ্বৈত কি সঙ্ঘ, গুরু, ইষ্ট এসব কোন কিছুই মানবেন না? পুরোদমে মানেন। অদ্বৈত সব মানে, গুরুকে মানে, শাস্ত্রকে মানে, মন্দিরকে মানে। তাহলে তফাৎ কি? অদ্বৈত জানেন, এগুলোর সাহায্যে আমাকে ওই অবস্থায় পৌঁছাতে হবে, যে অবস্থায় গিয়ে আমি দেখব, সব তিনিই হয়েছেন। এই কথা কোন ধর্ম বলবে না, আর কোন শাস্ত্র অদ্বৈত ছাড়া বলবে না; আর যতদিন না বলছে, ততদিন তারা পৌত্তলিক –*অন্ধেনৈব নিয়ামানা যথান্ধাঃ*। একবার যখন আপনি অদ্বৈতবাদী হয়ে গেলেন, তখন কি হবে? কি আর হবে; দূর্গাপূজাতে খুব করে ঢাক বাজাবেন, কোন অসুবিধা নেই। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেলে গঙ্গায় খুব করে ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করবেন। আমাকে অনেকে বলেন, আপনি এগুলো মানেন? আগে মানতাম, এখন রাত্রে গঙ্গায় স্নান করলে ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে করি না, কিন্তু কোনটাকেই আমি নাকচ করি না।

এখানে আপনারা যদি এই প্রশ্নটাকে বুঝতে চান, এই প্রশ্নের উত্তরে এত কথা বলা হল। যেমনি আপনি মনে করছেন, আমি সংসারী, আমি গৃহস্থ, আমার দ্বারা কি হবে, আমার কি করা উচিত; এর অর্থ হল আপনি এখনও ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছেন, একেবারে ডুবে আছেন। সংসারী যিনি, গৃহস্থ যিনি, তিনিও ধর্মসাধন করেন, ধর্ম পালন করেন; আগেকার দিনে মানুষ আরও বেশি করতেন। এখন প্রশ্ন

হল, আমরা তো গৃহস্থধর্ম পালন করছি, এখানে থেকে কি মুক্তির দিকে, মোক্ষের দিকে এগোন যায়? ঠাকুর বলবেন, খুব কঠিন। কারণ যাঁরা মুক্তির পথে যাবেন, মোক্ষের পথে যাবেন, তাঁদের ট্রেনিং, তাঁদের বেসিক প্রস্তুতিটাই আলাদা। এখানে ঠাকুর হ্যাঁ বা না কোনটাই বলছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁকে জেনে –একহাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর-একহাতে সংসারের কার্য কর। 'তাঁকে জেনে', এটাই মূল কথা। ঠাকুরের এই কথাগুলো অত্যন্ত গভীর বিষয়। আচার্য শঙ্করের যে গীতার ভাষ্য, সেই গীতা ভাষ্যের যে ভূমিকা, যাকে উপোদ্‌ঘাৎ বলা হয়, সেখানে তিনি বলছেন, গীতার উদ্দেশ্য কি? *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। এটাই উদ্দেশ্য, আমার শরণে এসো। কিভাবে শরণে আসা যাবে? এখানে দুটি ভাব নিয়ে আসছেন –প্রথম হল, যে কর্মগুলো করছেন সব কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করে করছেন, এই বুদ্ধিতে করা –*ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা*, আর তা নাহলে অনাসক্তি; এটাই ধর্ম, এর বাইরে আর কিছু নেই।

ঈশোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন; প্রথমে বলছেন, ত্যাগীরা কিভাবে থাকবেন, বৈরাগীরা কিভাবে থাকবেন। কিন্তু যাঁরা এটা পারবেন না, *কুর্বন্নেবহ কর্মাণি*, তোমরা অনাসক্ত হয়ে কাজ কর। উপনিষদে সেভাবে ভক্তির কথা পাওয়া যাবে না, কিন্তু গীতাতে ভক্তির কথা পুরোদমে আসে। কিন্তু কথামৃতে সব কিছুই আসে। ঠাকুর অনেকবার অনাসক্তির কথাও বলছেন; কিন্তু গৃহস্থরা বুঝতেই পারবেন না, অনাসক্তি কি। সেইজন্য দ্বিতীয় পথ, গীতাতে যে পথের কথা বলা হয়েছেন –*ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা*। প্রথমে ঈশ্বরকে কর্মফল অর্পণ করা, তারপর কর্মকে অর্পণ করা। প্রথমেই কর্মকে অর্পণ করা যায় না, কর্ম অর্পণ করতে সময় লাগে।

এই অংশটা সাংঘাতিক, প্রতিবেশী বৈকুণ্ঠ প্রশ্ন করছেন, আর ঠাকুর উত্তরের মাধ্যমে ধর্মতত্ত্বকে পরিষ্কার করে আমাদের সামনে রেখে দিচ্ছেন। ধর্ম জীবনের উদ্দেশ্য ত্যাগ। ত্যাগ প্রত্যেক মানুষকেই করতে হয়। কিন্তু মানুষ ত্যাগ করা শিখতে চায়না, সেইজন্য মৃত্যুর সময় যমরাজ এসে সবার সূক্ষ্ম শরীরটাকে টেনে বার করে নিয়ে চলে যান, আর আপনার এই স্থূল শরীরটা পড়ে থেকে যায়। প্রত্যেক জন্মে আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পুরোটা শিখি না বলে, যমরাজ প্রত্যেকবার এসে টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে যান। চোখের সামনে আপনার বাবা-মাকে মরতে দেখছেন, আপনার কাকা-জ্যেঠাদের মরতে দেখছেন, আপনার দাদু-ঠাকুরমাদের মরতে দেখছেন। ইদানিং কি হয়েছে, বিদেশীদের নকল করে সব হচ্ছে কিনা। একবার আমার কাছে এসে একজন খুব শোকার্ত হয়ে বলছে, তার ঠাকুরদা মারা গিয়েছিল, সেটা নাকি তার জীবনের বিরাট দুঃখের ব্যাপার, ঠাকুরদা কি কোন দিন মারা যাবেন না? যতসব আলতুফালতু কথা!

হিন্দুদের কাছে মৃত্যু এক স্বাভাবিক জিনিস। আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের উল্টোপাল্টা কথা শেখাবেন না। আমাদের এখানে বাচ্চা বয়স থেকে শেখানো হয় –*বাসাংসি জীর্ণানি*, দেহকে যেমন বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়, ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম শরীরের উপর এই স্থূল শরীরটা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। প্রকৃতি প্রতি ক্ষণে আমাদের বৈরাগ্যের শিক্ষা দেয়। কেন? কারণ ত্যাগ হল মানবজীবনের শেষ অবস্থা। উপনিষদ আমাদের এই মহান্ শিক্ষা দিচ্ছেন, ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে, এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু ত্যাগ করতে তো আপনারা পারবেন না, আমরা সন্ন্যাসীরাই পারছি না, আপনারা কি করে পারবেন। পূর্ণ ত্যাগ হয় না, সেইজন্য ধাপে ধাপে যেতে হয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান খুব সুন্দর করে এই ধাপে ধাপে কিভাবে ত্যাগ হয় শিক্ষা দিচ্ছেন।

প্রথমে বলছেন, ত্যাগ যদি না হয় তাহলে তোমার কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ কর। এই করতে করতে ঈশ্বরে ফলত্যাগ করাটা অভ্যাস হয়ে যাবে, এটাও করে করে মন যখন তৈরী হয়ে যাবে, তখন সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করে দাও। সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাটাও যখন অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন হবে কর্মত্যাগ। কর্মফল অর্পণ বা কর্মফল ত্যাগ, সেখান থেকে কর্ম অর্পণ, শেষে হবে কর্মত্যাগ।

কর্মত্যাগের পর সম্পূর্ণ রূপে সমস্ত কিছু ত্যাগ। সমাধি অবস্থাতে মনে যখন সব ত্যাগ হয়ে গেল, তখন হবে আত্মজ্ঞান। সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হয়, সবাই যাবেও। কিন্তু সংসারে তো সবাইকেই কাজ করতে হবে। কাজ ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না। আপনার আশেপাশে যা কিছু আছে, সব কিছুকে ত্যাগ করে, অর্থাৎ এই স্থূল জগৎকে ত্যাগ করে আপনি যদি ঘরে চুপ করে বসে থাকেন, তখন দেখবেন আপনার মনের জগৎ ঘোড়ার মত দৌড়াতে থাকবে।

মনের জগৎ কি আর, সব কিছু স্থূল জগৎ নিয়েই তো মনের জগৎ তৈরী হয়েছে। সেইজন্য মনের জগতে বাস করলে মন ঘোড়ার মত দৌড়াতে থাকবে, কিন্তু স্থূল জগতে থাকলে মন অত দৌড়াবে না, যতটুকু আছে আপনি ততটুকুই করবেন। বাড়িতে মায়েরা রান্নাবান্না করছেন, মন তাদের তত দৌড়ায় না। কিন্তু কোন কাজ না করে একা যদি বসে যান, মনকে আর ধরে রাখা যাবে না, একেবারে দৌড়াতে শুরু করে দেবে। মাঝে মাঝে কাজকর্ম না থাকলে ঘরে চুপচাপ বসে থাকি, আর দেখতে থাকি কিভাবে মনটা ছটফট করে। ব্যক্তিগত জীবনে আমার এত বেশি কাজ যে, চুপচাপ বসার সুযোগ হয় না; কিন্তু যেমনি একটু ফাঁকা হয় তখন মন নিজের মত দৌড়াতে শুরু করে। বেশি কাজ করলে লোকেরা তাকে বলে, একটু বিশ্রাম নিন। বিশ্রামেও তারা কিছু না কিছু করতে থাকবে।

যদি কাউকে বলা হয় চুপচাপ বসে থাকতে; মোবাইল নেই, টেলিভিশন নেই, কোন বই, ম্যাগাজিন, পেপার কিছু নেই; পারবে না থাকতে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই জিনিসটাকে ভগবান বিস্তারে বলছেন। ভগবান নিজেও সব সময় কাজ করছেন। ভগবান নিজেই বলছেন, আমি যদি কাজ না করি, সংসারের স্থিতিই থাকবে না। আমাদের সবাইকেও কাজ করতে হয়। কি ভাবে কাজ করবে? ঠাকুর বলছেন, তাঁকে জেনে। এই 'জানা' জিনিসটাকে বুঝতে হয়। ঠাকুর কথামৃতে এই কথা অনেকবার বলেছেন। লোকেরা অনেক সময় এই জিনিসটাকে ভুল বোঝেন, এমনকি মাস্টারমশাই নিজেও একটা সময় ভুল বুঝতেন। যার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথমের দিকে এই নিয়ে খুব অশান্তিও হয়েছিল, শ্রীশ্রীমাকে চিঠিপত্রাদি পাঠিয়ে এই বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হত।

জ্ঞান তিন স্তরে হয়। প্রথম জ্ঞান হল, প্রত্যক্ষ জ্ঞান; যেদিক থেকেই যান, আত্মার দিক থেকেই যান, ঈশ্বরের দিক থেকেই যান; প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, বা সাধনা করে করে আত্মজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করা। যেহেতু আত্মজ্ঞানে 'আমি' থাকে না, সেইজন্য আত্মজ্ঞান মানে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। আত্মার সঙ্গে এক হয়ে জেনে গেলেন চৈতন্যই আছেন, আর কিছু নেই; ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই; এটাই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য। এই জেনে যাওয়াটা কখন কারু কারু কদাচিৎ হয়। পুরো বিশ্বে একশ বছরে যদি একজনেরও হয়, সেটাই অনেক।

দ্বিতীয় স্তর হল, সাধুসঙ্গ করে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, চিন্তন করে একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আত্মাই সত্য, ঈশ্বরই সত্য। এই বিশ্বাস হয়ে যাওয়ার পর তার অনুরূপ আপনার আচরণ হবে। ধরুন আপনি ঠাকুরের ভক্ত আর আপনার যদি ঠাকুরের দর্শন হয়, তাহলে কি রকম হবে? যেমন ঠাকুর মা কালিকে দর্শন করলেন, তারপর ঠাকুরের যেমন জীবন, পরিষ্কার দেখছেন সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে; ভালোটাও তাঁর, মন্দটাও তাঁর; সুখ তিনিই দিচ্ছেন, দুঃখও তিনিই দিচ্ছেন। তাঁর মানে, এই জানাতে জীবনে একটা স্থৈর্য এসে যায়। দৃঢ় বিশ্বাসেও এই জিনিস হয়।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান আর দৃঢ় বিশ্বাস; এই দুটো জিনিস সাধারণ লোকের হয় না, যদিও লোকেরা মনে করে বা মুখেও বলে আমার বিশ্বাস দৃঢ়। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার জন্য সাধককে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। কি কি করতে হয়? শাস্ত্র অধ্যয়ন আপনাকে প্রচুর করতে হবে, প্রচুর সাধুসঙ্গ করতে হবে, চিন্তন অনেক বেশি করতে হবে। এগুলো করে করে ভাব পাকা করতে হবে; প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়ত হয়নি, কিন্তু ভাব পুরো পাকা। তার সাথে আপনার প্রতিটি কার্য, প্রত্যেকটি চিন্তা-ভাবনা ওই ভাবের অনুরূপ হতে হবে। আপনি হয়ত বললেন, আপনার আশীর্বাদে আমি ওই জায়গায় পৌঁছে গেছি, যেখানে আমার ভাব

পুরো পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু একটা-দুটো কথা বলতে গিয়ে দু-মিনিটেই বোঝা যাবে আপনার ভাব পাকা হয়েছে কি হয়নি।

একটা ঘটনা বলি, ছেলেমানুষী ঘটনা, কিন্তু সত্য। আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে অনেক বছর ছিলাম। ক্লাশ ফাইভের একটা বাচ্চা, মহা দুষ্টু। একদিন মন্দিরে আরতি হয়েছে, সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করে যে যার ঘরে চলে যাবে। হঠাৎ এই ছেলেটি প্রণাম করেই ঠাকুরের ভাবে 'মা মা মা' বলতে বলতে বেহঁশ হয়ে পড়ে গেছে। যা হয়ে থাকে, বাচ্চাদের মধ্যে হুলুস্থুলু শুরু হয়ে গেছে। বেশির ভাগ বাচ্চা ভাবছে, তাদের সহপাঠীর বিরাট কিছু হয়ে গেছে, ঠাকুরের দর্শন হয়ে গেল। বিদ্যাপীঠের ক্যাম্পাসে ইনহাউস ডিসপেন্সারি আছে, সেখানে ডাক্তারও থাকেন কম্পাউণ্ডরও থাকেন। কয়েকজন মিলে ওকে চ্যাংদোলা করে ডিসপেন্সারি নিয়ে গেল। ওকে স্মেলিং সল্ট ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। বাচ্চাদের মধ্যে বিরাট হৈচৈ, কি হল কি হল, মা মা বলে বেহুঁশ হয়ে গেছে। ওকে স্মেলিং সল্ট দিচ্ছে, বাচ্চাটির হুঁশ আর আসছে না। কম্পাউণ্ডর এসব ব্যাপারে বিচক্ষণ লোক, ডাক্তার সব ব্যাপার জানতেন না বলে বিভিন্ন রকম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কম্পাউণ্ড ডাক্তারের নজর এড়িয়ে একটা পিন তুলে নিল, নিয়ে হাল্কা করে ছেলেটির পিছনে ফুটিয়েছে। যেমনি পিনটা ফুটিয়েছে ছেলেটি চিৎকার করে মা গো করে উঠেছে। মা মা থেকে মা গো-তে নেমে এসেছে। বেশির ভাগ ভক্তই হল, এই মা মা থেকে মা গো-তে নেমে আসা। আমার নিজের চোখে দেখা সত্যিকারের ঘটনা। যে-কজন ভাবপাকা লোক আছে, পিন ফুটিয়ে দিন, মা মা থেকে মা গো-তে নেমে আসবে।

তৃতীয় স্তর হল আস্থা। আস্থা দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরেরই, তবে ওই স্তরে নেই, কিন্তু দৃঢ় আস্থা, একটা ভরসা আছে। তাহলে কি তিনটিকেই বলা হবে, ঈশ্বরকে জেনে? হ্যাঁ বলা হবে। ঠাকুর যখন বলছেন, তাঁকে জেনে; তাঁকে জেনেই যদি গেলেন, তাহলে কর্ম কেন করতে হবে? তার মানেই বুঝতে হবে, এখানে একটা কিছু আছে। গীতা ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন, কাম আর ক্রোধ *জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা*, আচার্য সেখানে ব্যাখ্যা করছেন –জ্ঞানীদের কি করে বৈরী হবে, যিনি আত্মজ্ঞানী হয়ে গেছেন তাঁকে কাম-ক্রোধ কি করতে পারবে, তিনি তো এগুলো পেরিয়ে এসেছেন। তখন বলছেন, যাঁরা জ্ঞানের পথ ধরে নিয়েছেন, তাঁরাও জ্ঞানী। যে বাচ্চাটি সবে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে সেও ছাত্র, আবার যে পিএইচডি করছে, সেও ছাত্র। পিএইচিডিকেও স্কলার বলা হয়, স্কুলে যারা নূতন নূতন যাচ্ছে তাদেরও স্কলার বলা হয়। স্কলারশিপ স্কুলের বাচ্চাকেও দেওয়া হয়, স্কলার বলেই স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে। যদিও স্কলার বলতে বিদ্যার্জনের একটা বিশেষ লেভেলকে বোঝায়। এখানে ঠাকুর, যাদের ভাব পাকা হয়ে গেছে, দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে, তাঁদের কথাও বলছেন না, সাধারণ লোকেদেরই কথা বলছেন, যাদের আস্থা আছে। এই আস্থাটুকুও যদি থাকে যে, ঈশ্বর আছেন, তিনি অন্তর্যামী, সুখ-দুঃখ সব তাঁর থেকেই, আর আমি দাস রূপে, সন্তান রূপে তাঁর সাথে এক।

অনেক কম বয়সে একটা ঘটনা দেখেছিলাম। একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালবাসত। কিন্তু কিভাবে ওদের ভালবাসার মধ্যে ভাঙন ধরে গেল। ছেলেটি তখুন কেঁদে কেঁদে বলছে –ঠিক আছে, অন্য কিছু না হোক, আমরা দুজন বন্ধু হয়ে তো থাকতে পারি। সেইদিন আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজকে আর হাসি পাবে না। ছেলেটি বলতে চাইছে, তোমার সাথে আমি জুড়ে থাকতে চাইছি। উদ্দেশ্য হল, ভগবানের সাথে জুড়ে থাকা –তাঁর ভৃত্য রূপে, তাঁর সন্তান রূপে, যেভাবেই হোক। গীতা কি সুন্দর বলছেন –*পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, তিনিই বাবা, তিনিই মা, তিনিই ঠাকুরদা। কারণ প্রকৃতি হলেন সবারই মা, আর ভগবান প্রকৃতিরও বাবা, ভগবান সেইজন্য ঠাকুরদা। তবে আপনার গুরু আপনাকে আপনার ভাব কি বলে দিয়েছেন। গুরু আপনাকে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছেন, ইষ্টকে কি রূপে দেখবেন, সেটাও বলে দিয়েছেন, আর কোন রূপে ধ্যান করবেন সেটাও বলে দিয়েছেন। এই কথাগুলো শুধু সেখানে জোগান দিচ্ছে, আপনি নিজে থেকে কিছু পাল্টাতে যাবেন না।

অদ্বৈত, দ্বৈত, জ্ঞান, ভক্তি নিয়ে যত কথা শুনছেন, এগুলো আপনার ভাবকে আরও জোড়ালো করছে। সাধনা আপনার একমাত্র সেটাই হবে, যেটা আপনার গুরু বলে দিয়েছেন। পাঁচজনকে দেখে হোক, বা শুনে শুনে হোক, চিন্তন করে হোক আপনার যখন সত্যিকারের একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল; যদিও দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া খুব মুশকিল; যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক, এটা তাঁদেরই হয়। যাঁদের প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে, তাঁরা সিদ্ধ; কিন্তু যাঁদের বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে গেছে, তাঁরা উচ্চমানের সাধক। আমরা হলাম মধ্যম, নিম্ন তো কেউই নন। নিম্ন সাধক হয় না, নিম্ন সাধক জিনিসটাকে উল্টো বোঝে। নিম্ন সাধক একবার এখানে দৌড়াচ্ছে, একবার ওখানে দৌড়াচ্ছে, আরও ভাল কিছু যদি পাওয়া যায় এই আশায়।

উত্তরকাশীর ওদিকে অন্নছত্র থেকে সাধুদের ডাল, রুটি ও সবজী দেওয়া হয়। সাধুরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ডাল-রুটি নেওয়ার জন্য। হঠাৎ একজন সাধু এসে বলল, 'আরে ওঁহা লাড্ডু ভি মিল রহা হ্যায়'। সঙ্গে সঙ্গে অন্নছত্রে সাধুদের লাইন ফাঁকা হয়ে গেল। সব সাধু বাবাজীরা ওই অন্নছত্র ছেড়ে অন্য অন্নছত্রের দিকে দৌড় দিল, যেখানে লাড্ডু দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এখানেও সব এই রকম, সব নিম্ন মানের সাধক, এরা সাধকই না। বাকি সব সাধক হলেন মধ্যম সাধক। আচার্য শঙ্কর উপনিষদের ভাষ্যে বারবার এই মধ্যম সাধকের কথা বলছেন। আমরা সবাই কিন্তু মধ্যম সাধক। এনাদের বারবার বোঝাতে হয়। বাড়ির লোকেদের কাছে আপনারা এই কথা হয়ত শুনে থাকবেন –কি একই কথা বারবার শুনছ। কিন্তু এটাই সঠিক পথ আমাদের মত মধ্যম সাধকদের জন্য; বারবার শুনতে হবে। উচ্চ সাধক হলে এক বছরের মধ্যেই দৃঢ় বিশ্বাস এসে যাবে আর প্রত্যক্ষ তো একমাত্র সিদ্ধদের হবে।

বৈকুণ্ঠ আবার প্রশ্ন করছেন। খুব সুন্দর প্রশ্ন। যে প্রশ্নগুলো প্রায়ই আমাদের মনের মধ্যে ওঠে। ঠাকুরও খুব পরিষ্কার উত্তর দিচ্ছেন। এর আগে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন –আমরা সংসারী, আমাদের কিছু বলুন। ঠাকুর বলেছিলেন, তাঁকে জেনে –একহাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর-একহাতে সংসারের কার্য কর। এতক্ষণ আমরা 'তাঁকে জেনে' এই কথার ব্যাখ্যা করলাম।

বৈকুণ্ঠ –মহাশয়, সংসার কি মিথ্যা?

এই দুটি জিনিস খুব প্রচলিত –একটা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। যাঁরা ভগবানের ব্যাপারে কিছুই জানেন না, কিছুই পড়াশোনা করেননি, কিন্তু রাসলীলা সবাই জানেন। আর একটা হল –রমতা যোগীরা ছিলেন, এই সাধুরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন; ঘুরে ঘুরে এনারা সংসার মিথ্যা এই জিনিসটাকে খুব পপুলার করে দিয়েছেন। যেমন বিজ্ঞানের আপনি কিছু না জেনে থাকতে পারেন, কিন্তু আইনস্টাইনের নাম সবাই জানে; ঠিক তেমনি সংসার মিথ্যা, সবাই জানে। অন্য দিকে আবার আমাদের বেদান্ত শাস্ত্রে প্রকরণ গ্রন্থ রূপে আমাদের অনেকগুলো ছোট ছোট বই আছে। সেখানে জোর দিয়ে এটাই শেখানো হচ্ছে, সংসার মিথ্যা। কারণ সংসার মিথ্যা যদি না বলা হয়, অদ্বৈত দর্শন একটু এলেমেলো হয়ে যায়। এই জিনিসটার উপর ব্যাখ্যা করার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য হল, ঈশ্বরই আছেন, তাঁকে জানাই জীবনের উদ্দেশ্য। উপায় কি? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। সেখান থেকে ধীরে ধীরে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগটাই হয়ে গেছে মূল। ছেলে মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না, বিশেষ করে মেয়েরা, বিয়ে করলেও সন্তান নিতে চায় না, কি না এগুলো বেকার, সন্তান নেওয়া মানেই ঝামেলার অন্ত নেই। নিজের মত ব্যাখ্যা করে বুঝে নিয়েছে। ঠিক তেমনি উপনিষদ, বেদান্ত, আচার্য শঙ্কর, এনারা হলেন ব্রহ্মবাদিন্। নামই হল ব্রহ্মবাদিন্, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু পরে পরে যাঁরা এলেন, তাঁরা বানিয়ে দিলেন –সংসার মিথ্যা হ্যায়। এটা শুনতেও বেশ ভাল লাগে। ঠাকুরও পরে যেটা বলবেন, আমরাও যেটা দিনরাত অনুভব করছি –যাকে ভালবাসলেন সেই চলে গেল। স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে, মায়ের সন্তান, সন্তানের মা; সবাই চলে যাচ্ছে। যেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন, সেটাই ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সংসার মিথ্যা, সংসার একটা মায়া; এটা না ভাবলে মন আরও ভেঙে যাবে। তখন মনে হবে জগতের সব সুখ সবাই ভোগ করছে, আমিই

হলাম এক অভাগা। তুলসীদাস খুব সুন্দর বলে গেলেন সকল পদারথ্ এহি জগমানি, করম্হিন নর পাব নাহি; ভোগের যত জিনিস সব এখানেই আছে, কিন্তু অভাগা পায়না। তখন মনে হয়, আমিই সেই এক অভাগা; যেটা আরও বাজে অবস্থা। তার থেকে সংসার মিথ্যা বলে দেওয়াটা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ করে হৃদয় যদি এমন ভাবে ভাঙে, যেটাতে অল্প একটু থেকে গেছে; বিশেষ করে ছেলেমেয়ের ভালবাসায়, তখন এটা আরও বেশি করে বেরোয়। এবার ঠাকুর বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে মানুষ 'আমার আমার' করে, মায়ায় বদ্ধ হয়ে কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে আরও ডোবে। মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না।

এখানে আমি একটা কথা বলি, আমি কোন বক্তৃতা দিচ্ছি না, ব্যাখ্যাও করছি না, শাস্ত্রে যেমনটি আছে তেমনটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করাই আমার কাজ। ব্যাখ্যা বলতে ব্যাখ্যা করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি, প্রবন্ধ লেখার মত, তাও না। ব্যাখ্যাগুলো খুব টাইট থাকে। সেইজন্য যদি সম্ভব হয় তাহলে কাগজ-কলম নিয়ে মূল কথাগুল যদি লিখে রাখেন, বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে। কাগজ-কলম নিয়ে লেখার পর সেটাকে যদি চিন্তন করেন, তারপর আপনি নিজে যেটা বুঝেছেন সেটাকে যদি এক প্যারাগ্রাফ লেখেন, তাতে আপনাদের বিশেষ ভাল হবে। এই জিনিসটাকে ঠিক ঠিক যদি আপনাকে বুঝতে হয় –সংসারকে কেন মিথ্যা বলা হয়, মিথ্যা বলতে কি; তাহলে আপনারা মাণ্ডুক্যকারিকার উপর আমাদের বিস্তারে ব্যাখ্যা আছে, সেটাকে শুনতে পারেন। ওখানে মিথ্যাও বলছেন না, বলছেন সৃষ্টি বলে আদৌ কিছু হয়নি, অজাতবাদ। মাণ্ডুক্যকারিকা অতি উচ্চমানের গ্রন্থ্। আগ্রহ যদি থাকে শুনবেন।

পাশ্চাত্য দর্শনে কি হয়, ওদের ফিলজফি হল, দার্শনিকদের মনে যে চিন্তা-ভাবনাগুলো এলো সেটাকে তিনি লিখে চলে গেলেন। তুমি নিজের মনের মত চিন্তা করছ, সেটাকে লিখছ, বলছ; ভারতবর্ষে এই ধরণের অনুমতি নেই। তুমি নিজের মত চিন্তা করে, কল্পনা করে যত খুশি কবিতা লেখ, উপন্যাস লেখ; সেখানে কেউ তোমাকে কিছু বলতে যাবে না। আপনার লেখা পড়ে কেউ আপনাকে কবি বলবে, কেউ মহাকবি বলবে, কেউ ঋষি বলবে। কিন্তু তুমি যদি তত্ত্বকথা বলতে চাও, যেটাকে আমরা দর্শন বলছি; তাহলে তোমাকে বেদ, উপনিষদকে আধার করে বলতে হবে। কারণ তুমি যত বড় জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রতিভাবান, শ্রুতিধর হয়ে থাকো না কেন, তোমার মনকে আমরা ভরসা করতে পারি না। তাই যত বড়ই আপনি হয়ে থাকুন, আপনার কথাকে শেষ তত্ত্ব কথা বলে মেনে নিতে পারব না, কারণ আপনার চিন্তা-ভাবনা কিছু দিন পরে পাল্টে যাবে।

ভারতবর্ষের একজন খুব নামকরা চিন্তক, কবিকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার লেখার সবচেয়ে বড় শক্তি কি? উনি বলছেন –inconsistency, এখানেই তিনি পাল্টে যাচ্ছেন। নানী পাল্কিওয়ালা ভারতবর্ষের সংবিধানের খুব নামকরা আইনজ্ঞ ছিলেন; বলা হয় যে, ওনার মত আইনজ্ঞ নাকি ভারতবর্ষে আর হয়নি। উনি একবার সুপ্রিম কোর্টে ব্যাখ্যা করে প্রমাণিত করছেন, এই কলমটা কলম না, এটা পেন্সিল। আর সত্যিই প্রমাণিত করে দিলেন, এত তুখোড় আইনজ্ঞ ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নামজাদা কয়েকজন বিচারকদের বেঞ্চ রায় দিয়ে দিলেন। কপাল এমন যে, ঠিক পাঁচ বছর পর অন্য একটা কেসে তাঁকে এর উল্টোটা প্রমাণিত করতে হবে, অর্থাৎ এবার প্রমাণিত করতে হবে এটা পেন্সিল না, এটা কলম। আর তিনি প্রমাণিত করে দিলেন এটা কলম; সত্যিকারের ঘটনা। একজন বিচারক বাধ্য হয়ে বললেন, 'পাল্কিওয়ালাজী, পাঁচ বছর আগে আপনি বলেছিলেন, এটা পেন্সিল আর আজকে বলছেন এটা কলম, আমরা কোনটা নেব?' সঙ্গে সঙ্গে পাল্কিওয়ালা বলছেন, with time my mind has been matured, sir। কিচ্ছু ম্যাচিওর করেনি, এটা হল উকিলের আইনি বুদ্ধি। কিন্তু এটা ঘটনা যে, বিচারকরা হেসে মানতে বাধ্য হলেন। এই মানের উকিল তিনি ছিলেন, ওনার যুক্তিতর্কের সামনে কারুর দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না।

তত্ত্বের ব্যাপারে আমরা কোন চিন্তক, মনীষির কথাকে শেষ কথা বলে নেব না, যতক্ষণ তাঁর কথা বেদ, উপনিষদে আধারিত না থাকে। সেইজন্য এই কথাগুলো, সংসার মিথ্যা না সত্য, এগুলো কেউ চিন্তা-ভাবনা করে, যুক্তিতর্ক দিয়ে দিচ্ছেন না। যুক্তিতর্ক হয়ত লাগাচ্ছেন, ব্যাখ্যা করার জন্য। আত্মজ্ঞানী যিনি, তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, জীবনকে সচ্চরিত্র করে, গুরুর সান্নিধ্যে থেকে বছরের পর বছর সাধনা করে একটার পর একটা উপলব্ধি করে করে এবং শেষে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। ঠাকুরের জীবনে আমরা যেটা দেখতে পাই; আর ঠাকুর তো উদাহরণ মাত্র, ঠাকুর তো আর সাধক নন, তিনি হলেন অবতার; এই ধরণের বেশির ভাগ সিদ্ধপুরুষরা নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর জগতে আর ফেরেন না। কদাচিৎ যদি কেউ ফিরে আসেন, তখন তিনি জগৎটাকে কেমন দেখেন? আমরা যখন ঘুমোতে গিয়ে গভীর নিদ্রাতে চলে যাই, ঘুম ভাঙার পর জগৎকে যেমনটি গভীর নিদ্রার আগে ছেড়ে ছিলাম, ঘুম ভাঙার পর ঠিক তেমনটিই পাই।

নির্বিকল্প সমাধিতে যাঁরা যান, সমাধি থেকে নেমে এসে তাঁরা জগৎকে অন্য রকম দেখেন। কি দেখেন? তিনি দেখেন সেই আত্মাই কেবল আছেন, বাকি সব নাম আর রূপের খেলা। অর্থাৎ এই কলমটা কলম নয়, শুদ্ধ চৈতন্যের ঢেউ; উপরে নামরূপের খেলা। সমাধিতে তাঁরা দেখেন সমরস চৈতন্য, চৈতন্যের এক মহাসমুদ্র। সমাধির পরেও দেখেন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ, সৃষ্টিটা হল সমুদ্রের ঢেউএর মত চৈতন্যের ঢেউ। কথামৃতে পরে আমরা দেখব, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, যা কিছু দেখছি সব চৈতন্যের ঢেউ, আর বাইরেরটা খোলস যেন। তার মানে জ্ঞানীরা দেখেন শুধু চৈতন্যই আছেন, সংসার বলে কিছু নেই। সংসার রূপে আমরা যেটা জানি, যেটা দেখছি, আসলে সেটা চৈতন্যই।

সংসারীরা দেখে, আমরা সবাই সংসারী, সংসারটা সত্য, চৈতন্য হয় মিথ্যা, নয় অর্দ্ধ মিথ্যা, নয় এক তৃতীয়াংশ মিথ্যা। আবার সাধুদের সঙ্গে থাকলে, কথামৃত পড়লে সংসারকে মিথ্যা বলে বোধ হয়। দুঃখ-কষ্ট এলে সংসার মিথ্যা বলে বোধ হয়। সব ঠিকঠাক চললে, সংসারকে সত্য বলে মনে হয়। অর্থাৎ সংসার এতটাই সত্য যে, যতটুকু পাওয়া যায় একেবারে খিমচে-টিমচে খেয়ে নিতে চায়। জগৎটা হল ভোগের জায়গা, বেড়াল যেমন আঁচড়ায়, সেই রকম আঁচড়ে খিমচে ভোগ করে যেতে চায়। একটা দিন, একটা ঘন্টা, একটা মিনিট, একটা সেকেণ্ড যেন বৃথা না যায়, লুটেপুটে ভোগ করা চাই। কারণ আমি সত্য, জগৎ সত্য, ভোগ সত্য।

কিন্তু আমি আপনি পুরোপুরি সংসারীও না, কারণ শাস্ত্র শুনছি, ঠাকুরকেও মানি, হিন্দু ধর্মে জন্ম নিয়ে আমি গর্বিত, এই বোধটাও আছে। সেইজন্য হিন্দু ধর্মের আচার আচরাণাদিও নিষ্ঠাপূর্বক অনুষ্ঠান করি। অনেক শ্রোতারা এসে বলেন, মহারাজ পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা শুনে এখন রোজ আমরা করি, শুনে ভাল লাগে। এনারা সাধনাও করেন। বাবা-মা হোক, স্বামী-স্ত্রী হোক, সন্তানাদি হোক, সব নিয়ে একটা সংসারও তাঁদের আছে। এই ছোট্ট সংসার, পরিবার, বাড়ি; এর বাইরে যে একটা সংসার, সেই সংসারও আছে। পাড়া-প্রতিবেশী, নিজের শহর বা গ্রাম, নিজের রাজ্য আছে। সাধনা করার সময় যতটুকু না করলে নয়, সেইটুকু করে বাকিটাকে মিথ্যা বলে ছেড়ে দিতে হয়। অর্থাৎ খবরকাগজ পড়ছেন, পড়ুন, কিন্তু কোনটাতে জড়িয়ে যাবেন না। টিভি সিরিয়াল দেখছেন, সিনেমা দেখছেন, দেখুন; জড়িয়ে যাবেন না। জানবেন, এগুলো জগতের খেলা, এ–কিছু না। নিজের যতটুকু দায়ীত্ব আছে; বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানাদির প্রতি যতটা দায়ীত্ব আছে পালন করলেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে এনে মিনিমাম দায়ীত্বে সীমাবদ্ধ করে দিলেন।

একটা কি হয় জানেন, বয়স যখন কম থাকে, বিশেষ করে কুড়ি কি তিরিশ-পয়ত্রিশ, হদ্দ চল্লিশ, তার বেশি না; রজোগুণ এই বয়সে ভিতরে এমন উৎপাত করে যে, মানুষ তখন এক সেকেণ্ড কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। আর আমি যখন এই কথাগুলো বলি, সব নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি। আমার কুড়ি থেকে চল্লিশ বয়সে একটা দিন যদি কাজ ছাড়া থাকতে হত, তখন মনে হত নিজের শরীর, মনে যেন আগুন লেগে গেছে।

আপনারা সংসারে আছেন, আপনার বাড়িতে, আপনার অফিসে যেখানে কাজ করছেন, সেখানে সব সময় কিছু না কিছু ঘটছে; এর একটা খুব সুন্দর শব্দ হল নয়েজ্। এই নয়েজ্ আপনার চোখ দিয়ে আসছে, কান দিয়ে আসছে, এটা হল ইন্দ্রিয় সমূহের ধ্বণি। শুধু কান দিয়ে না, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আসছে। মন কোন না কোন ভাবে ব্যস্ত থাকে। কোন কাজ না থাকলে মানুষ এটা ওটা নিয়ে, বাচ্চাকে নিয়ে, টিভি নিয়ে, মোবাইল নিয়ে, কিছু না কিছু নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলে। সন্ন্যাসীদের এসব কিছু থাকে না, ফলে একটা ব্যস্ততা না থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। কুড়ি থেকে চল্লিশের পর রজোগুণ ধীরে ধীরে কমতে শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু যিনি সাধনার পথ নিয়ে নিয়েছেন, এই রজোগুণকে বার করার জন্য তাঁর উচিত কাজ করা। রজোগুণকে বার করার কাজের বাইরে যে কাজ, সেটাকে মিথ্যা বলে ছেড়ে দিতে হয়। *মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ,* তুমি নূতন করে কোন কর্ম সৃষ্টি করবে না, যে কর্ম আর-একটা নূতন কর্ম সৃষ্টি করবে; শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। কর্ম কর্মকে জন্ম দেয়, সেই সময় যদি মিথ্যা বোধ না রাখা হয়, অনেক কিছুতে সে জড়িয়ে যাবে। কম বয়সে যখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম, সবাইকে বলতাম, আপনাদের যা কাজ আছে আমাকে দিয়ে দিন। ওনারাও খুব খুশি হয়ে বলতেন, ও তুমি করে দেবে, খুব ভাল, তুমিই কর। ওই বয়সে যার যা কাজ থাকত সবটাই আমি একা হাতে করে দিতাম। সমাজেও তাই হয়। এখন নূতন একটা ড্রাগ বেরিয়ে গেছে যার নাম মোবাইল ফোন, ড্রাগ এডিকশানের মত এখন ফোন এডিকসান হয়ে সবাই এখন ফোনের মধ্যে ঢুকে আছে। মেসেজ দেখছে, মেসেজ বানাচ্ছে, রীল দেখছে, রীল বানাচ্ছে; এটাও একই জিনিস। আগে তাও দুটো লোকের কাজে, লোকের জীবনে জড়িয়ে পড়ত; কিন্তু এখন শুধু রীল দেখা আর রীল বানানোতেই মানুষ জড়িয়ে আছে।

আপনি যদি সত্যিকারের সাধনা করতে চান, তাহলে মিথ্যা বোধ করে জগতের প্রতি যে আকর্ষণ, জগতে যে নিজের রজোগুণের প্রকাশ, সেটাকে আটকানো খুব দরকার। আমি চাকরি করছি, চাকরি করে কটি টাকা উপার্জন করছি, এই টাকা দিয়ে আমার সংসার চলে, দুটো ভাল কাজ হয়, তার বেশি পা এগিয়ে কাজ করার দরকার নেই; কম বয়সে ওসব করা হয়ে গেছে। বিশেষ করে সাধনার সময় এটা খুব দরকার। কারণ বাচ্চা বয়স থেকে আপনি সংসারকে সত্য বলে মেনে এসেছেন। পড়াশোনা, পরীক্ষা, রেজাল্ট, ক্যারিয়ার, বাড়ির লোকজন সবটাই সত্য। এত সত্য হয়ে হয়ে সাধনা যখন করছেন, তখন জগৎ যদি সত্য বলে বোধ হয়, তাহলে চোখ বন্ধ করে আপনি কি করে ঈশ্বরের ধ্যান করবেন? একেবারেই সম্ভব না। এখন এই বয়সে এসে আমার যে কার্যক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, তা নয়। কিন্তু তাই বলে কখন যদি কোন একটা এক্সট্রা কাজ সামনে আসে, আমি তো হাত জোড় করে বলে দিই, আমাকে ছেড়ে দিন।

হয়ত কোন সেন্টার থেকে আমাকে ডাকল ঠাকুরের কথা বলার জন্য; আমি হাত জোর করে বলে দিই –আমাকে ছেড়ে দিন। এক ঘন্টা হয়ত বলতে হবে, ঠিক আছে। কিন্তু তার জন্য আসা-যাওয়া, তার প্রস্তুতি; মাথা খারাপ হয়ে যাবে। যাঁরা করছেন করুন। কেউ দায়ীত্ব রূপে করছেন, কেউ লোকসংগ্রহ রূপে করছেন, তাঁরা করুন। আমার কাছে মিথ্যা ওই অর্থে না, কিন্তু রজোগুণের যে তোড় ছিল, সেটা শেষ হয়ে গেছে। সাধনার সময় সংসারকে মিথ্যা বলে মনে করতে হয়; অর্থাৎ, সংসার আছে তো আছে, কিন্তু জড়াতে নেই। সাধনার সময় এই বোধ যদি না থাকে, খুব মুশকিল।

মুক্তির পথে যদি যান, তাহলে এই ভাবকে দৃঢ় করুন –এই জগৎটা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রূপ, জগৎটা মিথ্যা নয়; ঠাকুর নিজেই সব কিছু হয়েছেন। আপনার যিনি ইষ্ট, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন। এখানে ইষ্টই সত্য, সব কিছু সত্য নয়, আত্মা সত্য, নামরূপ সত্য না; যেমন সমুদ্র সত্য, ঢেউ না। সাধনার সময় সংসারকে যদি অসার বলে বোধ না করেন, পরিষ্কার ভাবে আপনি যদি নিজেকে অনাসক্ত না করেন, সংসার থেকে যদি নিজেকে সরিয়ে না নিয়ে আসেন, তাহলে কিন্তু সাধনা করতে

গিয়ে এমন ফেঁসে যাবেন, কল্পনাই করতে পারবেন না। কথামৃতের প্রথম দিকেই আছে, মাস্টারমশাই প্রতিমা পূজা নিয়ে বলছেন, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়। ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে গেলেন, যাঁর সংসার তিনি বুঝাবেন, তোমার এত দরকার কিসের। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, গত হয়ে গেছেন; তিনি বলতেন, দয়া থেকে মায়া হয়; দয়া কেন হয়, আপনি তাকে করুণা করছেন। কারুর প্রতি করুণা কেন হয়? কারণ আপনি ওটাকে সত্য বলে নিচ্ছেন। কাউকে দেখলেন উনি খুব কষ্টে আছেন, ওর কষ্টটাকে আপনার সত্য বলে মনে হল আর আপনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিন্দিতে প্রবাদ আছে, নেইকি কর, দরিয়া মে ডাল; অর্থাৎ ভাল কর, ওটাকে নদীতে ফেলে এগিয়ে যাও। জড়াতে নেই, জড়ানোর অর্থই হয় আপনি জগৎকে সত্য বলে নিচ্ছেন। কতজনকে দেখেছি ফেঁসে যেতে, অজান্তায় ফেঁসে যাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতেও পারছেন না যে জগৎকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছেন, আর ফেঁসে যাচ্ছেন।

মূল হল, সংসার হল দায়ীত্ব পালন, এর বেশি না। দায়ীত্ব পালন যদি না করা হয়, সেখানেও ফেঁসে যাবেন, ঘোর তমোগুণী হয়ে যাবেন। আর জড়িয়ে যদি যান, রজোগুণী হয়ে যাবেন। দায়ীত্বটুকু পালন করে ঈশ্বরে যদি মনে দেওয়া হয়, তবেই সত্ত্বগুণ থাকবে, না হলে থাকবে না। সব সময় উদ্দেশ্যটা হল সংসার থেকে, জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা; বিশেষ করে সাধনার সময়। তারপর তিনি নিজেই আপনাকে দেখিয়ে দেবেন, তিনি কেমন, জগৎ কি, জগতের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক। তখন আর এই শাস্ত্রের দরকার পড়বে না। সাধনার সময় শাস্ত্রের দরকার পড়ে, সিদ্ধির পর আর কিসের শাস্ত্র। সিদ্ধি হয়ে গেছে, তাঁর আবার শাস্ত্রের কি প্রয়োজন। আর কাকেই বা ভালবাসবেন, কাকেই বা ভরসা করবেন। আমরাও একটা বয়স হয়েছে, সন্ন্যাস জীবনের পঁয়তাল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ মিশনে ভাল সাধু প্রচুর আছেন; এনাদের বাদে ভরসা করার মত যোগ্য কেউ না। নিজের উপর যখন আসে, সব স্বার্থপর হয়ে যায়। আর কখন কার মন যে পাল্টে যাবে, যার জন্য আপনি অনেক কিছু করলেন, সেই আপনাকে ডুবিয়ে দেবে।

জগতের এমন ভালবাসার মধ্যে আছেটা কি; সত্যিই তাই তো ঠাকুর বলছেন, আমড়া আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল। সংসারকে সত্য বলে কেন মনে হয়? ঈশ্বরের শক্তি, মায়ার জন্য। এটাই মায়া, লাগ ভেলকি লাগ বলে এমন করে দেন যে, যেটা মিথ্যা সেটাকেই সত্য বলে বোধ হয়। আপনি গায়ের জোরে এটাকে যদি মিথ্যা মিথ্যা করতে যান, তমোগুণী হয়ে যাবেন আপনি। কাজ করা বন্ধ করে দেবেন, আপনি কাজ করতে চাইবেন না। সেখান থেকে ধীরে ধীরে ঘোর তমোগুণী হয়ে যাবেন, বুঝতেও পারবেন না যে, আপনি তমোগুণী হয়ে যাচ্ছেন। সংসার কতটুকু সত্য? দায়ীত্ব পালন অব্দি, সাধনভূমিতে পা রাখা অব্দি। দায়ীত্ব পালন আর সাধন, এই দুটিতে ফাঁকিবাজি নয়। একবার সিদ্ধি যখন হয়ে গেল তখন নিজেই বুঝবেন সত্য কি মিথ্যা কি। ঠাকুর একটা গান করছেন –এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে, ইত্যাদি। খুব সুন্দর গান।

তোমরা তো নিজে নিজে দেখছ, এই দেখ না কেন? কত লোক এল গেল! সংসার যদি সত্য হত, কোন কিছুই পাল্টাতো না। পরিবর্তনটাই যদি আপনার কাছে সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তো আর কিছু বলার নেই। এই পরিবর্তনশীল জগতে, যেখানে সব কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে; লোকের কাছে বিজ্ঞান সত্য বলে মনে হয়, নিজের যুক্তিকে সত্য বলে মনে হয়, সব কিছুকে খণ্ডন করাটাকে সত্য বলে মনে হয়। **কত জন্মালো কত দেহত্যাগ করলে! সংসার এই আছে এই নাই। অনিত্য!** ঠাকুর এই কথা আমাদের দৃষ্টিতে, চোখের সামনে আমরা যেটা দেখছি, সেটাকে নিয়েই বলছেন। এই বলে সেই একই শব্দ বলছেন –অনিত্য।

আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা, নিজে যেটা বুঝেছি, সেটাকেই আধার করি বলছি। আমি নিজে যেটা পড়িনি; আগে বলছিলাম, নিজের চিন্তা-ভাবনা করে যদি কিছু বেরোয়, সেখান ভুল হওয়ার সম্ভবনা থাকেই। কিন্তু এটা ভুল হওয়ার সম্ভবনা কম। কারণ এই জিনিসটাকে নিয়ে তিরিশ বছর ধরে চিন্তা-

ভাবনা করে আসছি, আর প্রত্যেকবার একটাই উত্তর আসে। শাস্ত্রে বলেছেন, স্বামীজীও বলছেন; জগৎ আর ঈশ্বর; ঈশ্বর হলেন Absolute, জগৎ হল Relative। এই দুটোর মাঝখানে একটা রেখা আছে, যেটা দুটোকে বিভাজিত করে। যেটাকে মায়া বলে, শক্তি বলে, দেশ বলে, প্রকৃতি বলে। এই মায়া, শক্তি, প্রকৃতি শব্দগুলোকেই বলে –Time, Space, Enargy and Matter । নিউটনের সব এগুলো আলাদা ছিল। আইনস্টাইন এসে দেখালেন কিভাবে ম্যাটার আর এনার্জি এক, আর Time, Space, Matter are continum।

কিন্তু টাইম, আমাদের ভাষায় কাল হল এই সৃষ্টির এক অন্যতম অত্যন্ত আবশ্যক উপাদান। বিদেশীরা টাইমকে নিয়ে টুকটাক কাজ করেছেন; একজন বৃটিশ ফিলজফার external time, internal time নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন, অথচ আমাদের বেদেই রয়েছে কালসূক্তম্, আশ্চর্য। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের, যে জাতি আমাদের বেদ দিয়েছেন, তাঁরা এখন এই রকম অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত? আজকে যদি বর্তমান হিন্দু ধর্মকে পরিভাষিত করতে হয়, তাহলে বলতে হয়, এটা হল অজ্ঞানের মনুমেন্ট। আর এই হিন্দু ধর্মের পূর্বপুরষরা দিয়ে গেছে কালসূক্তম্। কিন্তু একটা জিনিস যেটাকে কোথাও ফোকাস করা হয়নি, মানে আমি যতটুকু শাস্ত্র দেখেছি, কোথাও পাইনি। তিরিশ বছর আগে আমি একটা কাজ করেছিলাম, বিষয়টা ছিল –Maya presents mind as eternity, বর্তমানটাই অনন্ত, এই বোধটাই মায়া। মায়া মিথ্যাও না, মায়া সত্যও না; বর্তমানকে অনন্ত মনে করা; এটাই মায়া। তবে আমি এটা কোথাও পড়িনি, কোন শাস্ত্রেও পাইনি; কিন্তু আমি জানি এটা সত্য, এর মধ্যে কোন ম্যাজিক নেই।

আসলে আমাদের যে মন, এই মন কয়েকটা জিনিসকে তফাৎ করতে পারে না। যেমন শব্দ আর বস্তু, নাম আর নামী মন তফাৎ করতে পারে না, তফাৎ করার জন্য ওকে আরও কিছু জিনিস দিতে হয়। যেমন ধরুন তেঁতুল, তেঁতুল নাম শুনলেই আমাদের যদিও জিভ দিয়ে জল পড়ে, রসগোল্লা বললেও নাকি জিভে জল আসে। কারণ মন তফাৎ করতে পারে না, এটা শব্দ না বস্তু। ওটাকে তফাৎ করানোর জন্য আরও কিছু ইনপুটস্ নিতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার সময় স্ত্রী হয়ত কোন কটূ কথা বলল; স্বামী পরে খুব করুণ হয়ে বলবে, 'তুমি সত্যিই আমার ব্যাপারে এই রকম ভাব?' স্ত্রীরা এই রকমই বলবেন, আর কোন দিন ভুলবেও না, কুড়ি বছর পর বলবে, 'আমার মনে নেই ভাবছ, তুমি ওই সময় আমাকে এই কথা বলেছিলে, আমি ভুলিনি।' অর্থাৎ ভেরিফিকেশান হচ্ছে। কিন্তু সময়ের ব্যাপার যখন আসে, তখন মন একমাত্র বর্তমানটাকেই জানে; কারণ ওটাকে কট্‌কট্‌ করে নিয়ে যাচ্ছে। যে জিনিসটা ভূতকালে চলে গেল, ওটাকে পরে মনে করার সময় যেমন কিছু বিশেষণ লাগিয়ে দেওয়া হয়, লাগিয়ে বহু কষ্টে টানে। যার জন্য, মানসিক সমস্যা যাদের আছে, বা বাচ্চারা এই জিনিসটার তফাৎ করতে পারেনা। মন স্বপ্ন আর জাগ্রতকে তফাৎ করতে পারেনা।

আমরা সবাই জানি, ভবিষ্যত বলে কিছু একটা আছে। বিশেষ করে আমরা যদি একটু পিছনের দিকে চলে যাই, যখন আমরা ক্লাশ সিক্স ফাইভে পড়তাম, সেখান থেকে যদি তাকাই তাহলে ভবিষ্যত বলে যে একটা কিছু আছে বলে বোধ হয়। কিন্তু মন এমন একটা আশ্চর্য যে, বর্তমান ছাড়া সে কিছু বোঝে না। যার জন্য অনেক প্রচলিত প্রবাদ আছে, যেমন, past is gone, future is yet to come, present is everything ইত্যাদি। আর বর্তমানকালে ভোগবাদীরা এত বেশি বর্তমান, বর্তমান করছে যে, একেই এটা রোগে জর্জরিত, আমাদের মন রোগে জর্জরিত; কি রোগ? বর্তমানই শেষ কথা। তার মধ্যে আরও বলে যাচ্ছে –বর্তমানই সব। সন্তানকে সব সময় মনে করিয়ে দিতে হয় – মন দিয়ে পড়, না হলে পরীক্ষা পাশ করতে পারবি না।

মানুষের জীবন কি একটা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে নাকি? আমি তো ক্লাশ নাইনের বায়োলজিতে পঞ্চাশে মাইনাস দুই পেয়েছিলাম, আর বায়োলজির সব পরীক্ষাতে আমি ফেল করতাম। আঁকার পরীক্ষায় আমি জীবনে সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলাম পঁচিশে দুই। চিরদিন আমার এই রকমই রেজাল্ট হত, তাতে কি হল। এখনও বায়োলজি পড়তে গিয়ে অনেক কিছু গুলিয়ে যায়, তাতে কি হল।

আমার ছাত্রাবস্থায় বর্তমান সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ওনাকে এখনও মাঝে মাঝে এই কথাগুলো বললেই উনি, 'তাই নাকি, তুই এই রকম নম্বর পেতিস?' এই বলে ওনার হাসি আর থামতে চায় না।

এই বর্তমানকে যদি আপনি অনন্ত মনে করেন, তাহলে এই সমস্ত সমস্যাগুলো কেন হয় বুঝতে পারবেন। যখনই আপনার কোন আপনজনকে মারা গেছেন দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার মধ্যে বৈরাগ্য এসে যাবে। তখন তাঁর যে ভূতকাল, তাঁর ভবিষ্যত, এটা মাথায় থাকে না। মনে হয় আর আমি জীবনে খুশি হতে পারব না। কেন খুশি হতে পারবেন না? আপনি আগেও এক সময় খুশি ছিলেন, পরেও এক সময় খুশি হবেন। আর যেমনি জীবনের সব কিছু ঠিক হয়ে গেল, তখন মনে হবে এটাই হওয়ার ছিল। একবার জামসেদপুর থেকে আমি ট্রেনে আসছিলাম। চেয়ারকার ছিল। পাশে দেখি এক নব দম্পতি। আমি এদিকে একা ছিলাম। হঠাৎ আমার চোখটা ওদের দিকে ঘুরে গেল। দেখছি ছেলেটি মেয়েটিকে একটু ছুঁতে চাইছে। মেয়েটি এক চড় মেরে ছেলেটিকে থামিয়ে দিল। ছেলেটি কাচুমাচু হয়ে সরে গেল। কারণ ওর কাছে এখন present as eternity। ওর মনে হচ্ছে যেটা হচ্ছে এটাই সত্য। তারপর দেখছি, কিছুক্ষণ পরে মেয়েটাই ছেলেটির হাত টানছে। আবার ছুঁতে যাচ্ছে, আবার চড়। হাঁ করে আমি তাকাচ্ছি না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল কি হচ্ছে। সারাটা রাস্থা চার ঘন্টার মত এক জিনিস চলল। ছেলেটি যখন আদর খাচ্ছে, তার মনে হচ্ছে আমি স্বর্গে আছি, সেখানে থাকতে চাইছে। মেয়েটি চড় মেরে দিচ্ছে, ক্যাঁ ক্যাঁ করে সে সরে যাচ্ছে; আশ্চর্য। এটাই বাস্তব পুরুষ প্রকৃতির খেলা; কিন্তু তার থেকে বেশি যেটা, সেটা হল present as eternity।

আমার মনে প্রথম মনে প্রশ্ন উঠেছিল, গীতাতে যখন ভগবান অর্জুনকে বলছেন, জন্মের আগেও তুমি অব্যক্ত ছিলে, মৃত্যুর পরেও তুমি অব্যক্ত হয়ে যাবে, মাঝখানে কয়েকটা বছরের জন্য কেন এত চিন্তা-ভাবনা করা, *তত্র কা পরিদেবনা*। সেখানে আমার এই প্রশ্ন মনে এসেছিল, কেন মানুষ এত চিন্তা-ভাবনা করে? এই কারণে করে, কারণ তার কাছে বর্তমান হল অনন্ত, কিছুতে আমরা এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। ঠিক এই কারণেই ঋষিদের বলা হয় ক্রান্তদর্শি। ক্রান্তদর্শি কে? যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে এক সঙ্গে দেখতে পান। অর্থাৎ ওনার কাছে বর্তমান আর অনন্ত থাকে না, উনি বুঝতে পারেন এটা কালের খেলা। আপনার চোখে ঠুলি দেওয়া, চোখে ঠুলি দিয়ে আপনি একটা একটা করে ঘর দেখছেন, আর যখন যে ঘরটা দেখেছেন তখন সেই ঘরটাই আপনার চোখে সত্য। চোখের ঠুলি যদি খুলে ফেলে দেওয়া হয়, পুরো ছবি আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আত্মজ্ঞানী মানে যিনি পুরোটা এক সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন। সংসারী মানে চোখে ঠুলি দিয়ে একটা একটা করে ঘর দেখছে, তার কাছে এটাই সত্য।

সবচেয়ে বড় ঠুলি হল present as eternity। Present as eternity যখন হয় তখন দুঃখের সময় মনে হয় জগৎ পুরো অনিত্য। ছেলেরা দুষ্টুমি করলে খুব করে কান মুলে দিলে বলবে, স্যার আর কোন দিন দুষ্টুমি করব না, আর কোন দিন হাসব না, এদিক সেদিক কোন দিন আর তাকাব না, পরীক্ষায় টোকাটুকি আর কোন দিন করব না, ইত্যাদি। কিন্তু পরের দিন সেটাই করবে, যেটা কোন দিন করব না বলেছিল। তখন মনে হয়ে এই পরিস্থিতিটা আমার কাছে শেষ সত্য। সুইসাইডা যারা করে তাদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়। মনে হয় যে, আমার বর্তমান যেটা ডুবে গেল, চিরদিন এই অবস্থাটাই চলতে থাকবে। সেইজন্য বেঁচে থেকে আমার লাভ নেই। তার বিপরীত আমাদের হয়, এই যে সুখে আছি, এটা আর কোন দিন পাল্টাবে না।

কিন্তু যিনি সাধক, ঠাকুর এখানে সাধনার কথা বলছেন, তাঁর কাছে সুখ-দুঃখ দুটোই অনিত্য। কারণ ওনার যখন জ্ঞান হবে, উনি ক্রান্তদর্শি হয়ে যাবেন, ঋষি হয়ে যাবেন; তিনি তখন বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত তিনটেকে এক সঙ্গে দেখবেন। তখন বর্তমান তাঁর কাছে আর অনন্ত থাকবে না, কাল অনন্ত হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য, ত্রিগুণাতীত হওয়া, ত্রিকালাতীত হওয়া। ত্রিগুণাতিত হওয়া মানেই ত্রিকালাতীত, তিন

কালের অতীত। বর্তমান, যেটা অনন্ত বলে বোধ হয়; সেটাকে ফেলে দিয়ে বাস্তব যেটা অনন্ত, সেই অনন্তটা অনন্ত রূপে বোধ হবে। ফলে সমস্ত কিছু পাল্টে যায়।

যেটাতে সিদ্ধি হবে, সাধনা সেটা দিয়েই শুরু হয়। ফলে সাধনা শুরু হবে অনিত্য বোধ দিয়ে। অনিত্য বোধ করা মানে, বর্তমান অনন্ত নয়; বর্তমান ভবিষ্যতের দ্বার, বর্তমান অনন্তের কণা মাত্র। বর্তমান কখনই শেষ কথা নয়। এই জিনিসটাকেই ঠাকুর এখানে বলছেন –কত জন্মালো কত দেহত্যাগ করল। আমরা সবই জানি, কিন্তু মন এটা নিতে পারে না। কারণ নিতে পারলে তো সে ঋষি হয়ে যেত। এই জগতে কি সবাই থোরাই ঋষি হবেন; তাহলে তো প্রকৃতির খেলা একদিনেই শেষ হয়ে যাবে।

ঠাকুর বলে যাচ্ছেন –**যাদের এত 'আমার আমার' করছ চোখ বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না**। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, জীবনে একবার কোন একটা তীর্থে তীর্থযাত্রী হয়ে যান। হোটেলেই থাকুন, কিন্তু একা যাবেন। তীর্থে গিয়ে দানধ্যান করবেন, কারুর সঙ্গে দরদাম করবেন না, কারুর সঙ্গে কথা বলবেন না। হরিনাম করতে করতে যাবেন, হরিনাম করতে করতে থাকবেন, হরিনাম করতে করতে ফিরবেন। ফিরে এসে আবার যেমন ছিলেন তেমন করতে থাকুন। বলছেন, **আমার হারুর কি হবে**। যাওয়ার সময় হারুকে নিয়ে যায়, আর সারাটা সময় ঈশ্বর চিন্তন না করে, হারু, হারু করে হারুর চিন্তন করতে থাকবে। **'গতায়তের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে!' 'গুটিপোকা আপন নালে আপনি মরে।' এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য**। জগৎটা অনিত্য, আমরাই ওটাকেই নিত্য বানিয়ে দিই। কেন? কারণ আমরা দেখি, বর্তমানটাই অনন্ত। প্রতিবেশী তখন খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন।

প্রতিবেশী –মহাশয়, একহাত ঈশ্বরে আর-একহাত সংসারে রাখব কেন? যদি সংসার অনিত্য, একহাতই বা সংসারে দিব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়। এখানে তাঁকে জানা মানে প্রত্যক্ষ না, যাঁর প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে তিনি সংসার করবেনই বা কেন। এখানে তাঁকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানা মানে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করে, গুরুসঙ্গ করে, তার থেকেও বেশি, নিজের চিন্তা-ভাবনা গভীর করে, ঈশ্বর পুরো সত্য আর এই জগৎ তাঁরই প্রকাশ, এই বোধটা দৃঢ় করা। এই বোধ হয়ে গেলে, কাজকর্ম যখন করছেন তখন ওই কাজকর্ম অন্য ধরণের হয়ে যায়। কাজকর্ম তখন হয় দায়ীত্ব পালন, আর কাজকর্ম ঈশ্বরের সেবা রূপে করা হয়। এই কথা বলার পর ঠাকুর গান শোনাচ্ছেন –**মন রে কৃষি-কাজ জান না**।

প্রতিবেশীরা যে প্রশ্নগুলো করছেন, প্রশ্নগুলি খুব ভাল। এই ধরণের প্রশ্নে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, সংসার কি মিথ্যা? এই বিষয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যেতে পারে –বেদের সময় থেকে ঋষিরা জগতের ব্যাপারে দুটি কথা বলে এসেছেন –প্রথম যেটা বলেন, তা হল, আত্মাই আছেন, যাবতীয় যা কিছু দেখছি, এটা শুধু নামরূপের খেলা; সচ্চিদানন্দই আছেন। যাঁদের মধ্যে ভক্তিভাব তাঁরা বলেন, ভালমন্দ যা কিছু হয়েছে, ঈশ্বরই সব হয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যেভাবে সংসারকে দেখি, ভক্তের দৃষ্টিতে সংসার সে-রকমটা নয়; বস্তু রূপে, ব্যক্তি রূপে সংসার নয়। আপনি ব্যক্তি রূপে দেখুন, বস্তু রূপে দেখুন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তাতে সুখ যেমন আসবে, দুঃখটাও তেমনই আসবে, তেমনই শোক আর মোহ আসবে। ওনারা বলতে চাইছেন, সমুদ্র আর ঢেউ; ঢেউ দেখতে দেখতে তাতে এমন মজে গেছি যে, সমুদ্র আর দেখতে পারছি না। ঋষিরা এই কথাই বলছেন –ঢেউ উপরে যায়, নিচে যায়; ঢেউ ছোট হয়, বড় হয় কিন্তু সমুদ্র অনন্ত, সমুদ্রে কোন বিক্ষোভ হয় না।

এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য স্বাভাবিক ভাবে দুটি পথের কথা বলা হয় –নেতি নেতি করে সংসারকে ত্যাগ করা, যা কিনা বেদান্তবাদীরা করে, কিন্তু অভ্যাস করা খুব মুশকিল। রাজযোগে যে যোগ

সাধনার কথা বলা হয়, ওটাও কিন্তু নেতি নেতি সাধনা, নেতি নেতি করে বৃত্তিগুলিকে ত্যাগ করা। যার জন্য রাজযোগের দর্শন জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারল না। আমরা সংসারী মানুষ, সংসারকে ভালবাসি। আমাদেরও আপনজন আছেন, গুরুজনরা আছেন। সবারই স্বামী আছে, স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, সংসারে সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা আছে। এনারা কি করে নেতি নেতি করবেন। যাঁরা আপনাদের নেতি নেতি শিক্ষা দেন, বুঝবেন তাঁরা বেদান্ত বোঝেন না, তাই ওনাদের কথা শুনতে যাবেন না। সেইজন্য ঋষিরা আমাদের পরিষ্কার করে বলে দিলেন; আসলে যখন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, সচ্চিদানন্দ বৈ কিছু নেই; তোমার দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টে নাও। তাহলে কি হবে?

এটাই দ্বিতীয় পথ –যেটা ভোগ সেটাই যোগ হয়ে যাবে। খুব আশ্চর্য লাগছে, তাই না। যেটাকে আপনি ভোগের জিনিস মনে করছেন, সেটাই যোগ হয়ে যাবে। কি করতে হবে? দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে। যখন দেখছেন তিনিই সব হয়েছেন, তখন জানবেন ভালোটাও তিনি, মন্দটাও তিনি; দুষ্টরূপী নারায়ণ, লুচ্চররূপী নারায়াণ; চোর, ডাকাত, বদমাইশ সব নারায়ণেরই রূপ। এভাবে দেখাটা সত্যিই খুব মুশকিল; কিন্তু এটাই সত্য। সাধনার গভীরে যাঁরা ঢুকে যান, তাঁরা এভাবেই সব কিছু দেখেন। আর সিদ্ধির শেষ অবস্থায় এটাই দেখেন। এসব কথা শুনতে সবারই ভাল লাগে; মনে হয় সকাল-বিকাল ঠাকুরের নাম করছি, তিনিই দেখবেন। জিনিসটা ঠিক এভাবে হয় না।

একটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস সবারই বোঝা দরকার। ঈশোপনিষদে শেষের দিকে ঋষি বলছেন, তিনি সারা জীবন সংসারধর্ম পালন করে জীবনের শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, তাঁর অঙ্গগুলি সব অসহায় হয়ে গেছে, তখন তিনি মনে মনে মাথা নুইয়ে তাঁর ইষ্টকে প্রণাম করছেন। আমাদের ভাষায়, কোন চালাকি না করেই তাঁর অন্তরের কথাগুলো বলছেন। আপনি বিচার করে দেখুন মৃত্যুর সময় আপনি কি চাইছেন, আপনার শেষ চিন্তা কি আসছে। কাউকে বলার কিছু নেই, নিজেই বিচার করুন। আপনার যে শেষ চিন্তা আসবে, আপনি কি চান; যেটা চান এখন থেকে আপনি পুরোপুরি সেই অনুরূপ নিজেকে সাজিয়ে নিন। আপনি যদি চান, অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই আমার শেষ চিন্তা; তাহলে দেহ এল কি গেল, তাতে কিছু আসে যায় না। এই চিন্তন নিয়েই আপনাকে বাকি জীবনটা অতিবাহিত করতে হবে। যদি চান, শেষ সময়ে আমি ঠাকুরের দর্শন পেতে চাই। তাহলে আপনাকে দেখতে হবে, জগতে যা কিছু আছে, সব কিছু ঠাকুর নিজেই হয়েছেন। এই ভাব সদা-সর্বদা আপনাকে ভিতরে জাগিয়ে রাখতে হবে।

মনে রাখবেন, শেষ সময়ে নূতন করে কিছু হয় না। ভক্তিপথের লোকেদের প্রচলিত একটাই কথা –তিনি এসে শেষ সময়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তার জন্য আগে আপনাকে দেখতে হবে যে তিনি এসেছেন। সারা জীবন ভোগের মধ্যে থাকলাম, আর আশা করছি শেষ সময় অন্য রকম হবে, তা কখন হয় না। বেদ থেকে শুরু করে কথামৃত পর্যন্ত যত শাস্ত্র আছে, সবাই এই একই কথা বলেন। এরপর আমরা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে যাচ্ছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহস্থাশ্রমে ঈশ্বরলাভ –উপায়

ঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, **গান শুনলে**, মনরে কৃষি-কাজ জান না। অর্থাৎ সংসারে মজে যেও না। **কালীনামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না। ঈশ্বরে শরণাগত হও, সব পাবে**। এইসব বলে বলে বলছেন –**তাঁকে যদি লাভ করতে পার, সংসার অসার বলে বোধ হবে না**। এটাই হল শেষ কথা। ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এই কথাগুলো আমাদের কাছে মনে হতে পারে এগুলো শুধু কথার কথা।

অনেকে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসেন, হঠাৎ ঠাকুরের একটা কথা, স্বামীজীর কোন একটা কথা বা উপনিষদ ও গীতার কোন কথা বলে বলবেন, এই আপনি যে কথা বললেন, এটা তো মিলছে

না। মিলছে না যে, আমি কি সেটা জানি না? কিন্তু তার থেকে যেটা বেশি, আমরা যে ধর্মের কথা বলি, বেশির ভাগই হল আমাদের মুখের কথা, মনের কথা না। কারণ মনের কথা যদি হয়, তাহলে চব্বিশ ঘন্টা আমার মন ওর মধ্যেই ঘুরবে আর আমার শরীর মন সেই অনুরূপ হয়ে যাবে। মুখে আপনি ধর্মের কথা বলবেন, কিন্তু আপনার পরিষ্কার কোন জীবনদর্শন নেই, আর সেই জীবনদর্শন অনুরূপ আপনি চলছেন না, তার মানেই ওটা আপনার মুখের কথা।

ঠাকুর বলছেন, **যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীবজগৎ সে তিনিই হয়েছেন**। কারণ তিনি যদি সব কিছু না হন, তাহলে আর-একটি সত্তা এসে যাবে। বাচ্চা বয়সে আমাদের খুব সুন্দর ফিলজফি অফ লাইফ ছিল, ঈশ্বর যখন আমাদের রচনা করলেন, তিনি তখন মাটি থেকে এক-একটা রূপ তৈরী করে দিলেন। পাঁচ-ছয় বছরের বয়সে এই জিনিসটাকে ভেবে আমার খুব মজা লাগত। আমি দেখেছি যাঁরা মাটির কাজ করেন, তাঁরা কিভাবে সব কিছু তৈরী করে। ওই দেখে ভাবতুম, ভগবান এইভাবে মাটি দিয়ে সব কিছু তৈরী করে যাচ্ছেন। এর বেশি ভাবার ক্ষমতা ছিল না যে, এত মানুষ তৈরী করতে তাঁর কত সময় লাগবে। জিনিসটা তা নয়। তিনি আলাদা, মাটি আলাদা, তা নয়। তিনি মাটি দিয়েও যদি করে থাকেন, তাহলে ওই মাটিটাও তিনি। সূর্য আর তার রশ্মি যেমন আলাদা হয় না; ঠিক তেমনি ভগবান আর সৃষ্টির মাটি আলাদা হয় না।

ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। মায়েরা এটা পারে না, ঠাকুরমারা পারেন। ঠাকুরমাদের বয়স হয়ে গেছে, বয়সের সাথে সাথে ম্যাচিউরিটি এসে যায়, সবচেয়ে বড়, স্বার্থপরতা চলে যায়। মায়েদের একটা অধিকার বোধ থাকে, কারণ সন্তান তার অঙ্গ কিনা। সন্তান তার শরীর থেকে বেরিয়েছে, সন্তান তার অঙ্গ, তাই মায়ের একটা অধিকার বোধ থাকে। ঠাকুরমা, দিদিমা, এনাদের এই জিনিসটা থাকে না। এখানে কে পারে, কে পারে না, সেটা জরুরী না। ভাগবতে খুব সুন্দর দেখিয়েছেন, মা যশোদা কিভাবে কৃষ্ণকে বড় করছেন। কৃষ্ণকে যে ভয় দেখাচ্ছেন, তা না; দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে যে বাঁধতে যাচ্ছেন, তা না; অপূর্ব বর্ণনা ভাগবতের।

পিতা মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। শুধু মা-বাবাকেই না, সবাইকে। সেইজন্য ভাগবত আদিতে যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পাই, পরে পরে যে চরিত্র সব রূপে বিস্তার পেয়েছে। শিশু রূপে, বালক রূপে, প্রেমিক রূপে, স্বামী রূপে, যোদ্ধা রূপে, আচার্য রূপে; সমস্ত রূপে এই বিস্তার।

তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। 'তাঁকে জেনে', ঠাকুর আগের দিকেও বলছেন, এর উপর আমরা বিস্তারে বলেছি। ঈশ্বরজ্ঞানের সেই অবস্থা তো সবার হয় না, তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তবে দৃঢ় বিশ্বাসটাও যদি হয়ে যায়, তবে তো অনেকটাই হয়ে গেল। **দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দুজনে করে**।

হিন্দুদের মধ্যে এই ভাব খুব জোরাল। শুনতে হয়ত খারাপ লাগবে, হিন্দুদের বাদে অন্যান্য ধর্মে এই ভাব সম্ভব না। কারণ যখনই এক ঈশ্বর আসবে, আমার ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর, এই দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে আসবে সেখানে এই ভাব আসা অসম্ভব। কিছু দিন আগে খবরে দেখছিলাম, আমেরিকার কোন এক পলিটিসিয়ান দেওয়ালীর দিনে হিন্দুদের নামে বলছে –They (Hindus) worship all false Gods। এখনও এরা ফলস্ গড, মাই গড, এই গড, সেই গড নিয়ে পড়ে আছে; কারণ ধর্ম এবং ধর্ম শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব এরা বোঝে না কিনা। ওরা শুধু বোঝে ক্ষমতার জোর। মাঝে মাঝে অন্যান্য ধর্মের লোকেদের মুখে ওদের কথাগুলো অবশ্যই শুনবেন; কিন্তু যেখানেই আমি-তুমি এসে যাবে, বুঝবেন সেখানে পুরো বিশ্ব একটি পরিবার, এই ভাব সেখানে নেই। *বসুধৈব কুটুম্বকম্*, পুরো বিশ্ব আমরা এক; এই ভাবকে নিয়ে চলতে একমাত্র হিন্দুরাই পারে, অন্য কেউ পারে না।

প্রতিবেশী –মহাশয়, এরূপ স্ত্রী-পুরুষ তো দেখা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আছে, অতি বিরল। বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারে না। তবে এরূপটি হতে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। খুব মুশকিল, দীক্ষাও যদি একসাথে এক জায়গা থেকে নিয়ে থাকেন, তাও মুশকিল। **দুজনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তাহলেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। না হলে সর্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়**।

শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, গত হয়ে গেছেন; আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ১৯৮৫ থেকে মহারাজের শরীর যাওয়া পর্যন্ত ওনার সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। প্রায়ই আমি ওনার কাছে যেতাম, সুযোগ থাকলে এক ঘন্টার কমে ওনার সঙ্গে থাকতাম না। একদিন তিনি ঠিক এই কথাই বলছিলেন, 'জপ করতে করতে যদি একবার জপ করার রস পেয়ে যাও, তখন জপ করা ছাড়তে চাইবে না'। এই মুহুর্তে অনলাইনে আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন ঠাকুরের নামে রস পান, আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় আছেন ধ্যানে রস পান। যদি এই রস একবার পেতে শুরু করেন, তখন দেখবেন অন্য রস আর ভাল লাগবে না। ঠাকুরের নাম করতে, ঠাকুরের ধ্যান করতে মন বসতে চায় না কেন? কারণ সেই আনন্দটা এখনও পাননি, এখনও জপধ্যান করাটা আপনার কাছে গতানুগতিক রুটিন মাফিক। তবে দয়া করে কক্ষণ জোর করে ধ্যানজপ করতে যাবেন না; মাথাটা বিগড়ে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, জপধ্যানের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের আনন্দ পাওয়া। এই আনন্দ স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই পেতে হবে, তাহলেই এটা সম্ভব; ঠাকুরও বলছেন, এরজন্য ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। এই জায়গাতে দুজনেরই খুব কঠিন হয়ে যায়, কারণ ভগবান কারুকে কৃপা করেন, কারুর উপর কৃপা করেন না। কার উপর তিনি কৃপা করবেন, সত্যি বলা খুব মুশকিল। তুলসীদাস এত বড় ভক্ত, তিনিও বলছেন –বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হঈ, রামকৃপা বিনু সাজন সঈ। সৎসঙ্গ ছাড়া ভক্তি হয় না, রামকৃপা ছাড়া সৎসঙ্গ হয় না। আমরা তো জানি না, ঠাকুর কার উপর কৃপা করবেন, কার উপর কৃপা করবেন না; আমরা জানি আমাদেরটা। আমাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তুমি কৃপা কর আর নাই কর, তুমি ভালবাস আর ভাল নাই বাস, আমি তোমার দাস। মীরাবাঈএর মত কথা বলতে হয়, হো গঈ আপ হি দাসী; কৃপা করলে খুব ভাল, কৃপা না করলে লোকে তোমারই দুর্নাম করবে। আগেকার দিনের স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক ছিল, সেখানে স্বামী যদি স্ত্রীকে ঠিক ঠিক না দেখত, তখন সেই স্বামীর নিন্দা, সেই পরিবারের নিন্দা হত। ভগবান যদি তাঁর ভক্তকে না দেখেন, নিন্দা হবে ভগবানের। তাই তিনি আমাকে ভালবাসলেন কি বাসলেন না, অত শত আমার ভাবার কি আছে।

তবে আপনাদের আবার বলে দিই, জপধ্যান জোর করে করতে যাবেন না। নিয়ম হল, গুরু যেমনটি বলে দিয়েছেন, সেই অনুসারে সকাল-সন্ধ্যা জপধ্যান করবেন। তিনি যেমন বিধি বলে দিয়েছেন, সেই বিধি অনুসারে পূজা-অর্চনা করবেন। আর আমি যেটা বলছি, যেটা আপনার গুরুও বলে দিয়েছেন, গীতা নিয়মিত পাঠ, চণ্ডী নিয়মিত পাঠ, বিষ্ণুসহস্রনাম নিয়মিত পাঠ, কথামৃত নিয়মিত পাঠ, এর বাইরে যে গ্রন্থ আপনার ভাল লাগে নিয়মিত পাঠ করবেন। হিন্দিভাষী এলাকায় লোকেরা রামচরিতমানস নিয়মিত পাঠ করেন। আপনিও আপনার নিজের ইচ্ছামত চৈতন্যচরিতামৃত, ভাগবত যে কোন একটা কি দুটো গ্রন্থ রোজ পাঠ করুন; একদিকে আপনার পড়াশোনাও হল, অনেক কিছু জানাও হল। কিন্তু জানবেন এগুলো হল নিত্যপাঠের বিষয়।

যদি না মিল হয়, তাহলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, 'বাবা কেন এখানে বিয়ে দিলে! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম; না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না! তুমি আমায় কি সুখে রেখেছো! চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন! ও-সব পাগলামি ছাড়ো!'

আমি বাস্তবিক এ-রকম দেখেছি। রেলের একজন বড় অফিসার, খুব ভক্ত মানুষ। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান ভদ্রলোককে ছেড়েই দিল শুধু এই একটি কারণে। এত রাগ যে, ভদ্রলোক যা মাইনে পেতেন সেখান থেকে দিতে গেলে ওরা নিত না, এত রাগ! কিন্তু দেখুন, এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও অনেকেই সত্যিকারের একজন ভক্ত হচ্ছেন, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের এখনও জন্ম হচ্ছে। আপনি মনে করবেন, বত্রিশ দাঁতের মাঝখানে যেমন জিহ্বা থাকে, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ যেমন ছিলেন, আপনিও তেমন আছেন। ইদানিং কালে ভালবাসার নামে ভারতবর্ষ যেভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে, কত রকমের নোংরামি চোখে দেখা থাক, কানে শুনতেও মন চায় না। কিন্তু একটা জিনিস যেটা পরিষ্কার দেখা যায়, যখনই কেউ কাউকে ভালবাসে, তা যেভাবেই হোক, আমরা ওর বর্ণনাতে যাচ্ছি না, তখন তারা কারুর কথা শুনবে না। আর যখন ভেঙে যায়, যেটা বেশি দিন চলেও না, তখনও তারা কারুর কথা শুনতে চাইবে না। আর-একটা হয়, যারা একটু অর্থোডক্স; অনেকেই অর্থোডক্স পরিবারের আছেন, তাঁদের অনেকেই দাম্পত্য জীবনে আছেন, কিন্তু ভালবেসেছেন অন্য কাউকে। সেটা প্রকাশ করবেন না, নিজের মনের ভিতরে রেখে সযত্নে কল্পনার জাল বুনে লালন-পালন করবেন। তখনও কিন্তু ওইটাই হয়, আশপাশে যারা যা করছে সবই মানবে, সবই করবে; কিন্তু যাকে ভালবেসেছে তাকেই ভালবাসবে। হয়ত কোন দিন প্রকাশ করল না, যাকে ভালবেসেছে তাকেও হয়ত বলল না। কিন্তু ভগবান তো তা নন, তিনি তো অন্তর্যামী; তিনি জানেন আপনি কাকে ভালবাসেন।

ভক্ত –এ-সব প্রতিবন্ধক আছে, আবার হয়তো ছেলেরা অবাধ্য। তারপর কত আপদ আছে। তবে, মহাশয় উপায় কি? এখানে দেখুন, ঠাকুর একেবারে পরিষ্কার কিভাবে বলে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। মনে রাখবেন, ঠাকুর যখন বলছেন, সংসারে থেকে কিভাবে সাধন-ভজন হয়, শুনতে আপনার যে-রকমই মনে হক, মন্দের ভাল এটা। কোথাও তো একটা শুরু করতে হবে। নেতি নেতি বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আবার নদীতে, পুকুরে স্নানের সময় যেভাবে মানুষ ঝাঁপ মারে, সেভাবে সংসারে ভোগের জন্য ঝাঁপও মারতে পারবে না। সেইজন্য মোর ফেরাতে হয়। কি রকম মোর ফেরানো? স্ত্রী যদি ওই রকম হয়, স্ত্রীকে মা কালীর মূর্তি মনে করতে হবে। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন, মা কালী শিবের বুকে পা রেখেছেন। আপনিও ভাববেন, আমি শিব হয়ে গেছি, মা কালী আমার বুকে পা রেখেছেন। দু-দিনের মধ্যে আপনি শান্ত হয়ে যাবেন, বড় অশান্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন।

ভাগ্যিস মা কালীর ছবিটা উল্টো হয়নি, তাহলে তো অশান্তির আগুন লেগে যেত। এমনিতেই লিবারালরা হিন্দুদের গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছে। মনে রাখবেন, একমাত্র হিন্দু যেখানে, সেখানে সেই মা কালীর পূজা হয়, যিনি স্বামীর বুকের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরেও বলে আমরা হিন্দুরা নাকি নারী বিরোধী। যাই হোক, ঠাকুর স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। কারণ সংসারে অনেক দায়ীত্ব আছে, দায়ীত্বকে আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

ঠাকুর বলছেন, (সংসারে) **অনেক ব্যাঘাত। তা আর তোমাদের বলতে হবে না –রোগ-শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই, ছেলে অবাধ্য, মুর্খ, গোঁয়ার**। ভেবে দেখুন, আপনার সংসারে যদি এগুলো থাকে, কি করবেন আপনি? সংসারে যদি সব সময় কারুর না কারুর অসুখ লেগে থাকে, টাকা-পয়সার অভাব যদি থাকে, স্ত্রীর সঙ্গে যদি মিল না থাকে, আর সন্তান যদি অবাধ্য, বিদ্যাবুদ্ধিহীন হয়, সেই সংসারে কিসের ঈশ্বরচিন্তন হবে! স্ত্রীরা কিন্তু বেশির ভাগই, সবাই হয়ত পারে না, নিজের মত করে সাধনা করে নেন। যে ছেলে বাবাকে বলে, বাবা, তুমি তোমার সাধনা কর, তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি সংসার সামলে নেব; ধন্য সেই ছেলে, ধন্য সেই ছেলের বাবা। রামায়ণে শ্রবণ কুমারের কাহিনী আছে। তার বাবা দায়ীত্ব থেকে অব্যহতি নিয়ে নিলেন, ছেলে শ্রবণ কুমার সেই দায়ীত্ব মাথায় তুলে নিল, তার সাথে মায়ের দায়ীত্বটাও নিচ্ছে। এই রকম সন্তান যদি কারুর হয়, সে তো ধন্য; বুঝতে হবে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা আছে সেখানে।

তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

আর কিছু হোক না হোক, স্বপ্নে তো ঈশ্বরদর্শন পাবেন। পতঞ্জলি রাজযোগে বলছেন, স্বপ্নে যদি কোন দর্শন হয়, সেটার উপরেও ধ্যান করা যায়। আমরা অনেকবার বলেছি, গুরু যখন মন্ত্র দেন, তখন একটা ছবি দেখিয়ে বলেন, ইনি তোমার ইষ্ট। সিনেমা, টিভি সিরিয়ালে অনেক সময় দেখে থাকবেন, পুলিসকে কোন একজনের একটা ছবি দিয়ে বলে দেওয়া হয়, এই লোকটি নিখোঁজ, একে খুঁজে বার করে নিয়ে এসো। পুলিশ যদি বলে, 'আমি তো একে কোন দিন দেখিনি, কি করে খুঁজে বার করব'? সঙ্গে সঙ্গে সেই পুলিশের বিরুদ্ধে কর্মে গাফিলতির জন্য ডিসিপ্লিনারি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ধর্মের নামেও এই ধরণের কথা শুনতে পাবেন। গুরু তো আমাকে ছবি দেখিয়ে দিলেন, আমি তো কোন দিন তাঁকে দেখিনি, কি করে তাঁর কথা চিন্তা করব? রূপ চিন্তন যদি নাও হয়, জপ যদি করে যান, তাতেও তিনি কৃপা করবেন। কৃপা করে কখন হয়ত তিনি আপনাকে স্বপ্নে দর্শন দেবেন। তখন বুঝতে পারবেন, ওই রূপের ধ্যান আপনাকে করতে হবে, ছবি বা বিগ্রহের না; ওই রূপের ধ্যান করতে হবে। এটাও মানুষকে বোঝান যাচ্ছে না।

প্রতিবেশী –বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ –একেবারে নয়। যখন অবসর পাবে, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একদিন-দুদিন থাকবে –যেন কোন সংসারের সঙ্গে (ওই কদিন) সম্বন্ধ না থাকে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের সুবিধা মত ব্যবস্থা করে নিতে হয়। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, আপনাকে জরুরী কাজে বেরোতে হবে, কিভাবে যাবেন? ছাতা নিয়ে যাবেন। ছাতা কি রকম হবে? ফোল্ডিং ছাতা হবে, না আগেকার দিনের ছাতা হবে? না, দাদু যায়, নাতি যায়, ওই রকম ছাতা হবে? নির্ভর করে, আপনি কি রকম ছাতা নেবেন। ট্রেনে বাসে করে যদি যেতে হয়, দাদুর ছাতা নিয়ে যেতে পারবেন না, সেখানে ফোল্ডিং ছাতা নিয়ে যেতে হবে। নিজের মত যখন যাচ্ছেন, তখন বড় ছাতাটা নিয়ে যাবেন। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের ধ্যান করার জন্য অনুকূল অবস্থা আপনাকে নিজের মত করে নিতে হবে। ঠাকুর কথামৃতে যে কথাগুলি বলছেন, মহারাজরা যে ব্যাখ্যাগুলো করেন, এগুলো সবটাই একটা ইঙ্গিত, ইশারা; কিন্তু করতে হবে আপনার নিজের সুবিধামত।

আর বলছেন –**যেন কোন বিষয়ী লোকেদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় লয়ে আলাপ না করতে হয়। হয় নির্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ**। এই কথাটা খুব মজার। আচার্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ে ঠিক এই কথা বলেছেন –হয় একা থাকবেন, নয় সাধুসঙ্গ করবেন। ভক্তগুলো ভাল, একা একা তো থাকতে পারবে না, তাই সাধুসঙ্গই করে। কিন্তু ভক্তরা সাধুদের বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে চলে যায়। একটা-দুটো কথা বলে দু-মিনিটেই শুরু হয়ে যাবে –জানেন মহারাজ, ওইখানে কি হয়েছে, ইত্যাদি। সংসারের বেশির ভাগ খবর আমি সংসারীদের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি। আপনি হয়ত বলবেন, যার যেমন রুচি, সে তাই পেয়ে থাকে। হয়ত তাই হবে।

প্রতিবেশী –সাধু চিনব কেমন করে? আপনার সাধু চেনার কি দরকার; আপনি যেমন, ঠিক তেমন সাধুই পাবেন। প্রসঙ্গ হল, আমি উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন পেতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। আপনি ওই সাধুই পাবেন, যিনি আপনার যোগ্য। গুরুর বিচার যদি করতে থাকেন, এই জীবনে আপনার আর দীক্ষাই নেওয়া হবে না। আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম, ভাল মানুষ, সবই ঠিক আছে; সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু কোন সেন্টারে জয়েন করলে ভাল হয়, ওই বিচার করতে করতে ওনার আর জয়েন করাই হল না। যখন সত্যি সত্যি আধ্যাত্মিকতার ভাব,

ঈশ্বরজ্ঞানলাভের স্পৃহা যখন ঢুকে যাবে, আপনি দেখবেন ধীরে ধীরে আপনি ঠিক তেমন লোকের কাছে পৌঁছে গেছেন, যিনি আপনার মনের যোগ্য। আপনার মন যদি ঈশ্বরেতে ডুবে থাকে, আপনার মন স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কাছে চলে যাবে, আর আপনার মন তাঁকে ধরে রাখবে। যদি আপনি প্রস্তুত না থাকেন, নিজেই আপনি ছিটকে যাবেন তাঁর থেকে। অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন, অনেকে সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাওয়ার জন্য। যাঁরা খোশগপ্প করতে পারেন, আর তাঁদের সঙ্গ যদি আপনি পছন্দ করেন, বুঝতে হবে আপনার ভিতরে ওই ভাবটাই আছে।

যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন, –যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। এনারা হলেন একেবারে উচ্চস্তরের সাধু। **সাধু সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না**। এখানে উদ্দেশ্য হল, শুধু সাধু না, সন্ন্যাসী না; আপনার যাঁরা বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশীরা আছেন, তাঁদের মধ্যে ওই রকম লোকেদের সাথেই আপনি থাকতে চাইবেন যাঁরা বেশির ভাগ সময় ঈশ্বরীয় কথা নিয়ে থাকেন। ধর্ম পথে সবচেয়ে কঠিন হল, ঠিক ঠিক শিক্ষক বা আচার্য পাওয়া। তারপরের কঠিনটা হল –তাঁর শিক্ষার উপযোগী সঙ্গী পাওয়া। দুটি ঈশ্বরীয় কথা, দুটি উচ্চ চিন্তার কথা বলার মত সঙ্গী পাওয়া খুব মুশকিল।

উচ্চস্তরের সাধুদের আর-একটি লক্ষণের কথা ঠাকুর বলছেন –**আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ**। গীতা বারবার বলছেন –*সর্বভূত হিতে রতাঃ*। কেন *সর্বভূত হিতে রতাঃ*? ইদানিং কালে রাস্তার কুকুরকে খাওয়ানো ফ্যাশান হয়েছে। এদের ডগ-লাভার বা পশুপ্রেমী বলতে পারেন, কিন্তু সাধুরা যে ভাব নিয়ে পশুপক্ষীদের খাওয়ান সেটা এদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাধুরা যদি খাওয়াই দেবেন, এই জেনেই দেবেন যে, তাঁর ভিতরেও সেই ঈশ্বরই আছেন।

প্রতিবেশী –নির্জনে বরাবর থাকতে হবে? কারণ, ঠাকুর এখানে দুটি কথা বললেন, প্রথম নির্জন, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ। এরপর ঠাকুর ফুটপাতের চারাগাছের উপমা দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ফুটপাতের গাছ দেখেছ? যতদিন চারা, ততদিন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। না হলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতি বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙবে না। গুঁড়ি যদি করে নিতে পার আর ভাবনা কি, ভয় কি? বিবেক লাভ করবার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ, হাতে আঠা জড়াবে না।

কতদিন নির্জন বাস? যতদিন আপনার ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারে ভালবাসা না জন্মায়। একবার যখন সত্যিকারের ভালবাসা জন্মে গেল, তখন আর নির্জনবাস অত দরকার পড়ে না। কারণ আপনি যেখানেই থাকুন, আপনি আপনার মত করে ঈশ্বরের আরাধনা করে নেবেন। শুধু তাই না, ভগবানও তখন আপনাকে সাহায্য করবেন, আপনার আশেপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের মনটা একটু পাল্টে দেবেন।

প্রতিবেশী –বিবেক কাহাকে বলে? বিবেক-বৈরাগ্য খুব প্রচলিত শব্দ কিনা, সেখান থেকে বিবেক কি, প্রতিবেশী জানতে চাইছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ –এই বিচার। সৎ মানে নিত্য। অসৎ –অনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভালবাসলে –যেমন দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা –এই সব ভালবাসলে –ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছে হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে।

কি বিবেক? ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ। সৎ মানে যেটা চিরদিন আছে, আর অসৎ মানে যেটা পরিবর্তনশীল, আজ আছে কাল নেই। বাংলাতে আমরা সৎ ও অসৎ বলতে যেটা বুঝি, জিনিসটা তা নয়। বেদন্তের অর্থে সৎ মানে যার সত্তা আছে, যে সত্তা দেশ-কাল-বস্তুতে সীমিত নয়; এটাই একমাত্র

ঈশ্বর বা আত্মা, বাকি সব অসৎ। কি রূপে? নামরূপের খেলা রূপে, মূর্ত রূপে, ব্যক্তি রূপে যেটা দেখা দিচ্ছে, সামনে যা আসছে; এটা মিথ্যা। চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই, এটাই বিচার। ঠাকুরও বলছেন, সৎ মানে নিত্য, অসৎ মানে অনিত্য। নিত্য বলতে, যেমন ধরুন এই কলম আছে, এই কলম মাইক্রোফোনে নেই, মাইক্রোফোন কলমে নেই। কলম রূপে মাইক্রোফোনে নেই, তার মানে কলম অনিত্য। তার মানে কলমকে ভালবাসার কোন কারণ নেই। কলমের কাজ লেখা, লেখা যে কোন কলম দিয়ে হয়ে যাবে। আমার বয়স যখন কম ছিল, তখন বিশেষ কিছু কলমের প্রতি আসক্তি ছিল, খুব ভাল লাগার ব্যাপারটা থাকত; এখন যে কোন কলম হলেই হল, লিখতে পারলেই হল।

যার বিবেক হয়েছে সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বাস্তবিক জানেন ঈশ্বরই বস্তু, মুখের কথা না। এই ধরণের বিবেকবান পুরুষরা মুখেও কাউকে বলতে যাবেন না। বলছেন মানেই, ঢেকুর উঠছে। যখনই কেউ এসে বলে, মহারাজ আমি তো ভাল মানুষ, কখন কোন গোলমাল করিনি, আমার সঙ্গেই এত অন্যায় কেন? প্রথম কথা হল, যখন আপনি নিজের মুখে বলছেন, আপনি ভাল মানুষ, তার মানেই আপনি ভাল মানুষ নন। বাজে কিছু করার আপনার দম নেই, তাই নিজেকে ভাল মনে করছেন, নিজেকে ভাল মানুষ বলছেন। যিনি সত্যিকারের ভাল মানুষ তিনি বলে বেড়ান না যে, আমি ভাল মানুষ। সত্যিকারের যাঁরা বড় মানুষ, ভাল মানুষ, তাঁরা নিজের কথা বলেন না। রহিমন হীরা কম কহে, লাখ টাকা নিরমল। হীরে কখন বলে না যে, আমার লাখ টাকা দাম। আপনি বলবেন, এখন তো জিনিসের গায়ে দাম লাগানো থাকে। আগে ভাবটা বুঝুন, জিনিসটা কি বলতে চাইছেন। যে ভাল মানুষ, কক্ষণ সে বলে না যে, আমি ভাল মানুষ। যে বীরপুরুষ, সে কক্ষণ বলে না যে, আমি বীরপুরুষ। যারা ভালর মুখোশ, সতের মুখোশ, সতীর মুখোশ ধারণ করেছে, তারাই এসব কথা বলে। যেমনি কেউ বলবে, আমি পতিব্রতা, আমি সতী, বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। যে সত্যিকারের পতিব্রতা, সে কখনই বলবে না যে, আমি পতিব্রতা, তার ব্যক্তিত্বই বলে দেবে সে কি।

বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। আপনি ঈশ্বরকে জানতে চাইছেন, তার মানে আপনার বিবেক উদয় হয়েছে। যখনই আপনি মুখে বলছেন, আমি ঈশ্বরকে পেতে চাই; তার মানে কিছু গোলমাল আছে। অনেক আগেকার ঘটনা, বাচ্চা বয়সে শুনেছিলাম। বেলুড় মঠে একজন ভক্ত এসে এক মহারাজকে জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা মহারাজ আপনার কি ঈশ্বরদর্শন হয়েছে'? মহারাজ খুব সুন্দর বলছেন –'শুনুন, আপনি নরেন নন, আর আমিও রামকৃষ্ণ পরমহংস নই। এই ধরণের কথা আপনার মুখে সাজে না'। ঠাকুর বলে যাচ্ছেন।

মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হলে তত্ত্ব-কথা মনে উঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, ঠাকুর গান করছেন –**কালী কল্পতরুমূলে। সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে –অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে –ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ। তাঁকে পেলে ধর্ম, অর্থ, কাম যা সংসারীর দরকার তাও হয় –যদি কেউ চায়**।

প্রতিবেশী –তবে সংসার মায়া বলে কেন? যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, ঠিক ওই জায়গাতে আবার প্রশ্ন এল, সংসারকে কেন মায়া বলে। আমরা যদিও ব্যাখ্যা করে দিয়েছি, এই প্রসঙ্গ আবার আসবে, সেখানে আমরা আবার ব্যাখ্যা করব, কারণ ঠাকুর বলেছেন কিনা। আর এই জিনিসগুলো শুনতে শুনতে একটু বোধ হয়, ধারণা হয়; তাই বারবার শুনতে হয়।

আমরা এর আগে যে আলোচনা করলাম, তাতে একটা খুব জরুরী বিষয় ছিল, এই যে নেতি নেতি বলা হয়, বিচার করতে বলা হয়; তার অর্থটা আসলে কি? আর বেদান্ত বলতে যেটা বলা হয় সেটা কি? আসলে বেদান্ত পুরোটাই নেয়। ঠাকুর বেদান্তবাদী, তিনি পুরোটাই নেন। অনেক সময় দেখেছি, আমাদেরই কোন কোন মহারাজরা সেখানে নিয়ে আসেন শাক্ত বেদান্ত। শাক্ত বেদান্তের কোন অর্থই হয় না, বেদান্ত বেদান্ত। এরপর কোনটা শাক্ত বেদান্ত, কোনটা বিজ্ঞান বেদান্ত, কোনটা জ্ঞান বেদান্ত, কোনটা

ভক্তি বেদান্ত, এগুলোর কোন মানেই হয় না –বেদান্ত বেদান্ত। এখানে যে প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে, খুব সুন্দর প্রশ্ন। কারণ এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে আমাদের মনে প্রায়শই যে প্রশ্নগুলি জাগে, সেগুলোর সব উত্তর আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি।

চোখের সামনে আমরা যে সংসার দেখছি, ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁরা ঠিক ঠিক সাধনা করেন, প্রথমে তাঁরা সংসারের এই সংসার বোধ থেকে বেরিয়ে আসেন। কারণ সংসার থেকে বেরিয়ে এলেও সংসার বোধ চলে যায় না। আমাদের একজন সিনিয়র মহারাজ খুব সুন্দর বলতেন, দেখ ভাই, সংসার ছেড়ে এসেছ, কিন্তু এক সংসার ছেড়ে আর-এক সংসার পেতে বসো না। বলতে চাইছেন, সংসার বোধ যেন তোমার না থাকে। সংসারে কারুর প্রতি যদি আপনার বিশেষ ভালবাসা থাকে, তাহলে আপনাকে দেখতে হবে ওই বিশেষ ভালবাসা যেন সবারই প্রতি হয়, শুধু একজনের প্রতি সীমাবদ্ধ না হয়ে থাকে। এমনকি সাপ, বিছের প্রতিও ওই ভালবাসা থাকবে। তবেই গিয়ে আপনি বলতে পারবেন আমি সবাইকে ভালবাসি।

প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করছেন, তবে সংসারকে মায়া বলা হয় কেন? মাণ্ডুক্য কারিকাতে মায়া একটা বিশেষ বিষয়। আপনারা যাঁরা নিত্য আমাদের ক্লাশগুলো শুনে থাকেন, আপনারা নিশ্চয় এই বিষয়ের উপর অনেকবার আমাদের আলোচনা শুনেছেন। খুব সংক্ষেপে আবার বলা যেতে পারে। যে কোন জিনিস দেশ, কাল ও বস্তু, এই তিনটেতে যদি বাঁধা থাকে, তাহলে ওই জিনিসটাকে অনিত্য বলা হবে। এই যে কলম দেখছেন, এই কলমটা বস্তুতে বাঁধা, দেশে বাঁধা, কালে বাঁধা। কলমটা যেদিন তৈরী হয়েছে তার আগে সে ছিল না, এই কলমের নাশ হয়ে গেলে কলমটা এই কলম রূপে আর থাকবে না। অর্থাৎ এই কলমটা অনিত্য। কিন্তু আমি বোধ করছি এটা নিত্য ও সত্য। অনিত্য জিনিসকে সত্য বলে যে বোধ করায়, এটাই মায়া। মায়ার অসম্ভব ক্ষমতা। আর যেটা সত্য, আত্মাই সত্য, যেটা দেশ, কাল, বস্তুতে বাধিত নয়; অথচ এটাকেই সবার মিথ্যা বলে বোধ হয়।

এখানে একটা কথা বলার আছে, আপনারা অনেকেই হয়ত কথাটা শুনে অসন্তুষ্ট হবেন। প্রায়ই আমাদের পরিচিতদের অনেককেই দেখি; ইদানিং কালে খুব বেশি দেখা যায় –বাবা-মা বয়স হয়েছে, কোন কঠিন রোগ হয়েছে, মৃত্যুর দিকে যাচ্ছেন, সেই নিয়ে হা-হুতাশ করতে থাকেন। অনেকে সময় দেখা যায়, যিনি রোগী তিনি বলছেন, আমার এসব কিছু আর লাগবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়রা মোহবশতঃ বলতে থাকেন, এই করতে হবে, সেই করতে হবে। কেন নিজে অস্থির হচ্ছেন, রোগীকেও ব্যতিব্যস্ত করছেন? দেহের মধ্যে যে জীব আবদ্ধ হয়ে আছে, সেই জীব এখন দেহ থেকে বেরিয়ে নূতন দেহ পেতে চাইছে। এটাকে নিয়ে এত হৈচৈ করা কেন? আর যাঁরা সেলিব্রেটি, ফিল্মে আছেন, স্পোর্টস আদিতে আছেন, তাঁদের শারীরিক কিছু হলে তাঁকে নিয়ে সবাই কত নাচানাচি, কত হৈহৈ করবেন। সব কিছু চুকে যাওয়ার দুদিন পর আবার যে যার নিজের মত জীবন চালাবে।

ভারতবর্ষ মৃত্যুকে ওইভাবে নিত, যেভাবে জীবনকে সে নেয়। এটা কোথা থেকে এসেছে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে; এক হতে পারে ভোগবাদ থেকে আসতে পারে, অন্য একটা হতে পারে পাশ্চাত্য প্রভাবে, যেখানে You live only ones, জীবনটা শুধু একবারের জন্য। আসলে মানুষ মনে করে, আমি যার সঙ্গে আছি, সে চিরদিন আমার সাথেই থাকবে। এই ভাবটা যে কত বোকা বোকা ভাব, এই নিয়ে কেউ কোন চিন্তা-ভাবনাও করে না। মায়ার এটাই ব্যাখ্যা, নিত্যকে অনিত্য রূপে দেখায়; অনিত্যকে নিত্য রূপে দেখায়।

ঠাকুর সাধনার দৃষ্টিতে বলছেন **–যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ "নেতি নেতি" করে ত্যাগ করতে হয়**। বস্তু রূপে ত্যাগ। আমাদের মন কাঁচা, এই কাঁচা মনের জন্য কি হয়; যখন ত্যাগের কথা বলা হয়, তখন আমরা মনে করছি যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছু নেই, লোকজন নেই। আসলে তা না, সবই থাকে। মনে করুন, ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধিতে গেলেন। সমাধিতে ফিরে এসে কি বলছেন, জগৎ

নেই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নেই, তুমি নেই, আমি নেই? অথচ কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করে বলছেন, ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়; ঠাকুর এখানে তাঁর ত্যাগী ভক্তদের কথা বলছেন –আমার ত্যাগী ভক্তজন, যাঁদের তিনি নারায়ণ দেখছেন, সেটাই সত্য। কাঁচা মনে তা হয় কি? না, তা হয় না। আসলে যেটা হয়, তা হল, জগৎ বাস্তব রূপে আমাকে যে বেঁধে রেখেছে, সংসার, আত্মীয়-স্বজনরা যে তাঁকে বেঁধে রেখেছে; এটা থেকে মুক্তি হয়ে যায়। মুক্তি মানে –তিনি তখন দেখেন *সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ*, কৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন, কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নেই।

তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে, যে তিনিই সব হয়েছেন। আমাদের পাশ্চাত্য যে দেশগুলি, সেখানে জহুদি, খ্রীশ্চান, ইসলাম ও পার্সি এই চারটি ধর্ম পাই। চারটি ধর্মে দেখবেন খুব মজার জিনিস, তাঁদের প্রবর্তকরা যে কথাগুলো বলছেন, তার আগে কেউ বলেননি। যার জন্য জহুদিদের প্রচুর কষ্ট সহ্য করতে হল। জরথ্রুষ্ট প্রচুর নূতন কথা বলতে শুরু করলেন, তাঁকেও অনেক কষ্ট সহ্য করতে হল। যীশুকে তো ক্রুশিফাই করে দেওয়া হল। প্রফেট মহম্মদকে কত দিক থেকে আক্রমণ করা হল; যার জন্য কতবার তাঁকে এখান ওখান থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল; মক্কা ছেড়ে তাঁকে শেষে মদিনায় পালিয়ে আসতে হল। অর্থাৎ, তাঁরা এমন কিছু বলছেন, যেটা ওই সমাজের সংস্কৃতিতে, ধর্মে, অধ্যাত্মে নেই। এই জিনিস ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না। ঠাকুর বলছেন, তাঁরা জানেন তিনিই সব হয়েছেন। আর আমাদের সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম সেই উপনিষদের যুগ থেকে চলে আসছে। তুলসীদাস বলে গেলেন –সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু; এই ভাব আমাদের কাছে নূতন কিছু না।

আচার্য শঙ্কর সেইজন্য গীতাভাষ্যে বলছেন, বেদের যে ধর্ম, আজ যাকে আমরা সনাতন ধর্ম বলি বা হিন্দু ধর্ম বলি; কালের গতিতে চলতে চলতে এই ভাবগুলো একটু শিথিল হয়ে যায়। যাঁরা এই ভাব পালন করবেন, সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঢিলেমি এসে যায়। ভগবানকে তখন তাই আসতে হয়, এসে তিনি আবার ধর্মে জোয়ার নিয়ে আসেন। আমি আপনাদের কথা জানিনা, কিন্তু আমার হয়ে বলতে পারি –ঠাকুর, মা, স্বামীজী যদি না আসতেন, তাহলে এখনও হয়ত আমরা হিন্দুদের রীতি-রেওয়াজগুলোই পালন করতাম। গীতা, উপনিষদ হয়ত পড়তাম, পড়ে মনে করতাম, আহা, কি সুন্দর সুন্দর কথা। আজ ঠাকুরের জন্য বেদ, গীতা, উপনিষদের সব কথাকে সত্য বলে বোধ হয়। উপলব্ধি হয়ত করতে পারিনি, কিন্তু আজ হোক, কাল হোক উপলব্ধি হতে বাধ্য। জগতের প্রতি যার কোন আকর্ষণ নেই; আজ হোক, কাল হোক তার উপলব্ধি হতে বাধ্য। ঠাকুর অবতার, স্বামীজী এবং ঠাকুরের সন্তানরা সবাই তাঁকে জেনেছিলেন, নিজের মুখে তাঁরা এই কথা বলে গেছেন।

অবতার আসেন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে। ঋষিদের দেওয়া সনাতন ধর্ম, এই ধর্মে ঠাকুর আর-একবার প্রাণ ঢেলে দিলেন। ঠিক ঠিক সনাতন ধর্ম, কোন যে একদিক তা না; বেদ বলুন, উপনিষদ বলুন, গীতা বলুন, তন্ত্র বলুন, ভাগবত বলুন, সব কটা শাস্ত্রকে ঠাকুর সত্য প্রমাণিত করে দিলেন। সনাতন ধর্মের প্রদীপের আলো, যেটাকে মনে হচ্ছিল নিভে যাচ্ছে; ঠাকুরের আগমনে সেটাই এখন দাবানলের মত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। এই যে ঠাকুরের অবদান, এর যে সন্ধিক্ষণের ইতিহাস, আমরা এখন এই ইতিহাসের খুব কাছে। আমরা এখান থেকে বুঝতেও পারব না, ঠাকুর কি করে দিয়ে গেছেন। এটা বুঝতে সময় লাগবে, কম করে চারশ-পাঁচশ বছর তো লাগবে।

মায়াকে ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন –নেতি নেতি করে যখন ত্যাগ করা হচ্ছে, কারণ তখন দেখছেন সব মায়া। পরে দেখছেন যে, আরে তাই তো, তিনিই তো সব কিছু হয়েছেন; **তখন বোধ হয় –ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ**। জীব-জগৎ সত্য। পিঁপড়েটাও তিনি, ব্যাঘ্রও তিনি, তিনিই সব হয়েছেন। ঠাকুর এবার তাঁর খুব নামকরা উদাহরণ দিচ্ছেন। নামকরা উদাহরণ হলেও লোকেরা এটাকে একটু ভুল বোঝেন, সেইজন্য এর ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বিচি আলাদা করা যায়, আর একজন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখ তো, তুমি কি খোলা বিচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না; ওজন করতে হলে খোলা বিচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এত ওজনে ছিল। খোলটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বিচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বিচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়।

ঠাকুর একটা উদাহরণ দিচ্ছেন –শাঁসটা যেন আত্মতত্ত্ব, বিচি যেন জীবজগৎ আর খোলটা যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই উদাহরণটাকে আমি আমাদের মহারাজদেরও দেখেছি, এনারা এটাকে পুরো আক্ষরিক ভাবে নেন। ঠাকুরের সেটা বক্তব্য না। বেদান্তই একমাত্র পুরোটা নেয়। আমি, আপনি যখন কেউ সাধনা করি, তখন আমাদের মনে হয়, এই জগৎ আছে, আমরা আছি আর ভগবান যেন এর বাইরে। সাধনার সময় এই ভাব হওয়াটা স্বাভাবিক। দীক্ষার সময় আপনার গুরু বলে দিয়েছেন, হৃদপদ্মে ধ্যান করতে। অর্থাৎ বাকি যে জগৎ রয়েছে, এই দেহ রয়েছে, অন্যান্য অঙ্গ যেগুলি রয়েছে; এগুলোকে ছেড়ে হৃদয়ে, একটা স্থান বিশেষে ধ্যান করার কথা বলছেন। তার মানে দাঁড়ায়, ঈশ্বরকে জানার জন্য মনকে অন্যান্য জায়গা থেকে সরিয়ে এনে একটা জায়গায় কেন্দ্রিত করতে বলা হচ্ছে।

আপনি যদি সমুদ্রের উদাহরণও নেন; সমুদ্র আছে, সমুদ্রের উপর দিয়ে ছোট ছোট বরফের চাঁই ভেসে যাচ্ছে। তখন যেন আপনার কাছে স্পষ্ট মনে হবে, বরফের চাঁইগুলো আলাদা, সমুদ্র আলাদা। চৈতন্যকে জানতে গেলে আমাকে চাঁই থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনি যত চেষ্টাই করুন, সাধনার সময় চৈতন্যকে এইরূপ ভাবাটাই স্বাভাবিক। সবাই এইভাবেই ভাবেন। অর্থাৎ বেলের যে শাঁস, সেটার দিকে সবার দৃষ্টি। পাকা আম খাওয়ার ইচ্ছা হলে, সবাই আমের শাঁসটুকুই নেবেন। কিন্তু আম কেনার সময় আম খোসা, আঁটি সমেতই কিনতে হয়। একবার যখন কাজ হয়ে গেল, আত্মজ্ঞান যখন হয়ে গেল; তখন ফিরে তাকিয়ে দেখবেন, চৈতন্যই সব কিছু হয়েছেন।

এখানে অনেকে মনে করেন যে, অদ্বৈত যেন শাঁসটুকুই নেয়, বিশিষ্টাদ্বৈত আবার বিচিটাও নেয় ইত্যাদি। কিন্তু তা নয়; ঠিক ঠিক অদ্বৈত সবটাই নেয়। সমস্যাটা হয় দ্বৈত আদিকে নিয়ে। দেখুন বইয়ে কি লিখেছেন, তর্কে কি বলছেন সেটা জরুরী না, জরুরী হচ্ছে কমন্ পারসেপশান তাদের কি। যাঁরা ভক্তি পথে সাধনা করছেন তাঁরাও খোলা-বিচি ফেলেন, জ্ঞানমার্গের সাধকরাও ফেলেন, সবাই ফেলবেন। যখন ফেরত আসেন তখন কি করবেন? জ্ঞান যখন হয়ে গেল, ভক্তি লাভ যখন হয়ে গেল, তখন কি হবে? ভক্তি পথের সাধক দেখেন বৈকুণ্ঠধাম, যেটা সংসারের আবর্জনার পারে অবস্থিত। বেদান্তীরা ওই রকম দেখেন না, অদ্বৈতবাদীরা দেখেন চৈতন্যই সব কিছু হয়েছেন।

এটা খুব সুন্দর বোঝা যায়, নরেনকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বর যদি তোকে বলেন, তুমি কি চাও, তুই কি চাইবি? স্বামীজী বলছেন, আমি চাইব আমি যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকি। ঠাকুর তখন বলছেন, ওরে তারও উপরের অবস্থা আছে, সব কিছুই চৈতন্য, সব কিছুই তিনি। স্বামীজীর মত মানুষকে ঠাকুর এই কথা বলবেন, আমাদের মত লোকেদের কখন তিনি বলবেন না। কেন বলবেন না? কারণ আমরা হলাম ছোট্ট পিঁপড়ে, এক দানা হলেই আমাদের হয়ে যায়। স্বামীজী পুরো জগৎকে শিক্ষা দেবেন, ঠাকুরকে তাই তাঁকে সব দিক থেকে তৈরী করতে হচ্ছে। আবার তত্ত্বের দিক থেকে যদি দেখেন তখনও এটাই আসবে –*সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ* বা *সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ*; যাঁর যাঁর ইষ্টকে তিনি এইভাবেই দেখবেন, কেউ বলবেন বিষ্ণুময়ং, কেউ বলবেন, কৃষ্ণময়ং, কেউ বলবেন রামময়ং।

আর বোধ হয়, যে সত্ত্বাতে শাঁস, সেই সত্ত্বাত দিয়েই বেলের খোলা আর বিচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

অনুলোম বিলোম। এই কথাগুলো কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার এনেছেন। **ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে**। অনাত্মা মানে –পদার্থ, দেহ। অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় যখন আমরা পরিষ্কার ভাবছি, সংসার আলাদা তিনি আলাদা, তাতে দোষের কিছু নেই ঠিকই আছে। একবার যখন ঈশ্বরকে পেয়ে গেলেন, তারপরে বলা যে, জগৎ নহি হ্যায়; জগৎ হ্যায়, কিন্তু এই জগৎটা ঈশ্বর নিজে হয়েছেন।

যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা (Phenomenal)। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute)। যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন – বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভাল-মন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।

এখানে আমাদের একটি অতি সহজ জিনিস বুঝতে হবে। ঠাকুর এখানে খুব সুন্দর বলছেন – যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। জগৎ তাঁরই লীলা এইটুকু বলেই ঠাকুর যদি থেমে যেতেন, আমাদের চোখে সব কিছু সহজ হয়ে যেত। ঠাকুর তা না বলে বলছেন, যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। কথাটা একটু সুক্ষ্ম। ভক্তরা সচরাচর যখন বর্ণনা করেন, যেমন কৃষ্ণভক্তরা বর্ণনা করবেন, এমনকি কিছু কিছু বড় ভাষ্যকাররা, সেখান থেকে তাঁদের যে মতাবলম্বীরা আছেন, তাঁরা বলছেন, এই যে সচ্চিদানন্দ, যিনি অনন্ত, এটা ঈশ্বরেরই রূপ। আবার গীতা আদি গ্রন্থে দেখাচ্ছেন, সচ্চিদানন্দই কিভাবে ঈশ্বর হন। কোনটা ঠিক? ঈশ্বরের যে সবিকল্প রূপ, রূপ-গুণ দিয়ে যিনি ঈশ্বর, তাঁরই কি অনন্ত? নাকি যিনি অনন্ত, তাঁরই এই সবিকল্প রূপ?

ঠাকুর বিভিন্ন জায়গায় অনেক ধরণের কথা বলেছেন। সেই রকমই এক জায়গায় তিনি বলছেন – রূপটুপ সব উড়ে যায়। ঠাকুর পরিষ্কার তাহলে বলতে পারতেন, যিনি নিত্য তাঁরই লীলা। ঠাকুর এখানে 'যিনি' বলছেন না, বলছেন 'যাঁর'। এটা হল সতর্কীকরণ, আমরা ভুলে যেন কোন জিনিসকে পদার্থিকরণ (obejectification) না করে দিই। দয়া করে একটু এই জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করুন। কারণ এটার উপরেই নির্ভর করে সনাতন ধর্মের আধ্যত্মিক সত্য। ঈশ্বরকে আপনি সগুণ-সাকার রূপে দেখুন, নির্গুণ-নিরাকার রূপে দেখুন, সচ্চিদানন্দ সাগর রূপে দেখুন; কিন্তু কখনই এটা ভাবা যাবে না বা বলা যাবে না যে, এটাই শেষ সত্য। আর এইসব কথা, ঈশ্বরের এক রূপ হলেন ব্রহ্ম; এগুলো শব্দের খেলা, যে কথাগুলোর কোন দাম নেই।

বেদের নাসদীয়সূক্ত আপনারা শুনে থাকবেন। যাঁরা শোনেনি, তাঁরা অবশ্যই প্লে লিস্ট থেকে আমাদের বেদের উপর ক্লাশগুলোতে নাসদীয়সূক্ত শুনবেন। সেখানে সূক্তে বলছেন –*নাসদ্ আসীৎ ন সদ্ আসীদ্*, সৃষ্টির আগে সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না। সৃষ্টি কবে হল? যখন ব্রহ্মার জন্ম হল, পদার্থবিজ্ঞানের মতে পনেরশ কোটি বছর আগে। না, এভাবে সৃষ্টি হয়নি। ঠাকুর যখন নির্বিকল্প সমাধিতে গেলেন, সৃষ্টিও তখন মুছে গেল। আমরা রোজ রাত্রিবেলা গভীর নিদ্রায় যখন যাই, তখনও সৃষ্টি মুছে যায়। গভীর নিদ্রা থেকে বেরিয়ে আসার পর সৃষ্টি আবার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিতে সৃষ্টি নেই, দেশ-কাল নেই। সমাধিতে থেকে নেমে এলেন, সব কিছু আবার ফেরত চলে এলো। তাহলে সৃষ্টি কখন হয়? সেটা আপনার উপর নির্ভর করে, আপনি ঠিক করুন কবে হয়।

যখন আমি-তুমি বোধ নেই, নির্বিকল্প সমাধিতে আমি-তুমি বোধ থাকে না। আমি ঈশ্বরের ভক্ত, নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় এই বোধটাও চলে যায়। তখন কি থাকে? আমরা আমাদের অবস্থা থেকে বলছি, ওটা আত্মা, ওটা ব্রহ্ম; কিন্তু অজান্তায় আত্মাকে, ব্রহ্মকে আমরা পদার্থিকরণ করে দিচ্ছি। যারা নিজেদের ধর্মের ঈশ্বরকে কোন একটা নাম দেয়, তাঁর এই নাম, সেই নাম; আর বলে আমরা পৌত্তিলকতার বিরোধী। আরে ভাই, ঈশ্বরের তুমি একটা নাম দিয়ে নিজের ধর্মকেই পৌত্তলিক বানিয়ে নিলে। অবশ্য, সেটা বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। যখন আপনি বলছেন, রামই সত্য, কৃষ্ণই সত্য,

শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র সত্য; অজান্তায় ঈশ্বরকে আপনি এক বস্তু বানিয়ে দিলেন। অজান্তায় আমরা আত্মাকে, ব্রহ্মকে বস্তু বানিয়ে দিই। সেই যে পরম সত্তা, যাঁর ব্যাপারে *অবাঙমনসোগোচরম্* বলা হয়, মাঝখান থেকে ওইটাও একটা বস্তু হয়ে যাবে। যাঁকে *অবাঙমনসোগোচরম্* বলা হচ্ছে, তাঁর নাম হতে পারে না। রূপ, গুণের পারে তিনি। সচ্চিদানন্দও তিনি, কৃষ্ণও তিনি। সেইজন্য সবটাই তাঁর, এই যে জগৎ এটাও তাঁর। ফলে নিত্যটাও তাঁর, লীলাটাও তাঁর।

আপনি কোনটা চাইছেন? জগতে আপনাদের মত আরও কয়েকজন বাদে সবাই লীলাটাই চাইবেন। সবাই টাকা চায়, সম্পদ চায়, নাম চায়, যশ চায়, স্বামী চায়, স্ত্রী চায়, সন্তান চায়; অর্থাৎ সবাই লীলা চাইছে। ঈশ্বরের বাইরে কখন কেউ কিছু চাইতে পারে না। যাঁরা রসিক লোক, তাঁরা বলবেন, মহারাজ আজ আপনি কি সুন্দর কথা বলেছেন, প্রাণ জুড়িয়ে গেল; এবার থেকে প্রার্থনা করব, হে ঈশ্বর! তোমার টাকারূপটাই আমাকে দেখাও। ঠিকই বলছেন। সেইজন্য আমাদের ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্যের দেবী হলেন লক্ষ্মী, শ্রী; নিত্য যিনি ভগবান বিষ্ণুর সাথে বাস করেন; তাই এটাও তাঁর একটা রূপ। কিন্তু যদি শ্রী চান, তাহলে শ্রীমানকে পাবেন না। ভিতর থেকে যদি লক্ষ্মীকে চান, লক্ষ্মীর উপাসনা করেন; লক্ষ্মীপতিকে আর পাবেন না। নিত্যকে চাইলে লীলা পাওয়া যাবে না; লীলা চাইলে নিত্যকে পাওয়া যাবে না। যাঁরা বলেন, ঈশ্বরের ভজনা কর, সব পেয়ে যাবে। এগুলো বলা শুধু মানুষকে একটু ঈশ্বরাভিমুখী করার জন্য। কিন্তু যিনি সত্যিকারের নিত্যকে চাইছেন, তিনি কখন লীলাকে চাইবেনই না, প্রশ্নই নেই। ঈশ্বরের ভজনা করা একটা অন্য জিনিস।

গীতাতে চার রকম ভক্তের বর্ণনা করা হয়েছে, আর্ত, অর্থার্থী, জীজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। ভগবান বলছেন, এই চারজনই আমার ভক্ত। কিন্তু আর্ত, অর্থার্থীরা যখন ঈশ্বরের ভজনা করেন, তখন তাঁরা নিত্যকে চান না। সেখানে তাঁরা প্রার্থনা করছেন, হে প্রভু, আমার এই এই চাই; অর্থাৎ হে প্রভু, তোমার লীলারূপ আমার চাই। আমি বিপদে পড়ে গেছি, হে প্রভু, আমাকে বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই, জীবনকে ভোগ করতে চাই; পরিষ্কার, এখানে লীলাকে চাইছেন। হে প্রভু, আমার সাম্রাজ্য চাই, আমার টাকা-পয়সা চাই, লীলা চাইছে। যিনি মন থেকে নিত্যকে চাইছেন, তিনি কখন স্বপ্নেও, ঘুনাক্ষরেও লীলা চাইবেন না, প্রশ্নই নেই। ভগবান যদি দিতে আসেন? এগুলো হল কথার খেলা। ভগবান কেন দিতে আসবেন, কেন আপনাকে জোর করতে চাইবেন, প্রশ্নই নেই।

জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। নিত্যকে যিনি চান, তিনি তো জ্ঞানী। নিত্যকে যিনি বোধ করেছেন, থিয়োরেটিক্যালিই হোক, তিনি তো ভগবানের আত্মা। ভগবান নিজের আত্মাকে কেন সরাতে যাবেন। আর ইতিহাসেও আমরা কোথাও জানিনা, যিনি নিত্যকে চেয়েছেন, পরে আবার লীলাকে নিয়েছেন। আমরা এখানে ফাঁদে পড়া, প্রলোভনে পড়া, এই শব্দগুলো ব্যবহার করছি না, কারণ এগুলোর কোন অর্থ হয় না। প্রভু আর তাঁর ঐশ্বর্য; যিনি ঐশ্বর্য চান, তিনি আর প্রভুর দিকে তাকাবেন না; কিন্তু যিনি প্রভুকে চান, প্রভুর ঐশ্বর্যে তাঁর ভারি বয়ে গেছে।

যদি বলেন ব্রহ্ম কি? সবটাই ব্রহ্ম। তখন কিন্তু জীব, জগৎ সমস্ত কিছু এসে যাবে, কোনটাকেই বাদ দেওয়া যাবে না। ঠাকুর এখানে বেলফলের উদাহরণ এই অর্থেই বলছেন। লোকেদের একটা ভুল ধারণা যে, বেদান্ত, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্ত শুধু মাত্র চৈতন্যকেই নেয়। যখন এটা বলা হয়, তখন এটা ধরে নেওয়া হয়, চৈতন্যকে জগৎ থেকে আলাদা দেখে। সাধনার সময় সবাই আলাদাই দেখে। কিন্তু ঠিক ঠিক সিদ্ধ অবস্থায় এই দুটোকে আলাদা কিছু বলে বোধ হয় না। চৈতন্যেরই স্থূল এই জগৎ, স্থূল আর চৈতন্য মিলিয়ে এই জীব, জগৎ, বিশুদ্ধ চৈতন্য, ভগবান। যখন জড় আর চৈতন্য মিলে একটা কাদা তৈরী হয়ে গেল, তখন মানুষ বলছি। কাদা ছাড়া যিনি, সেটাই চৈতন্য, তিনিই ভগবান। সৃষ্টি থাকলে জীব থাকবে, ভগবান থাকবেন। সেইজন্যই ঠাকুর এখানে বলছেন –যে জেনেছে সে দেখে যে, তিনিই সব হয়েছেন –বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী জীবজন্তু ভাল-মন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।

স্বাভাবিক ভাবে তখন প্রশ্ন হবে, যারা পাপী, দস্যু তারাও ভগবান? অবশ্যই ভগবান। ভাগবতে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণুর যাঁরা পার্ষদ, ভগবানের যাঁরা বিশেষ ভক্ত; তাঁরাই কেউ পরে হিরণ্যাক্ষ হলেন, কেউ হিরণ্যকশ্যপু হলেন। অর্থাৎ ভাল-মন্দ দুটোই ভগবান। বরাহবতার, নৃসিংহ অবতার যখন হিরণ্যাক্ষকে বধ করছেন, যখন হিরণ্যকশ্যপুকে বধ করছেন; তখন কাকে মারছেন ভগবান? নিজের আপনজনকে। কেন? যাতে আমার কাছে শীঘ্র ফেরত চলে আসতে পারে। ডাক্তার ছুরি-কাচি দিয়ে রোগীকে কাটা-ছেঁড়া করে অপারেশন করেন, কেন? যাতে রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। আর তাছাড়া ভগবানের কাছে কেউ পর নয়।

প্রতিবেশী –তবে পাপা-পূণ্য নাই?

খুব মজার প্রশ্ন। আমি যখন খুব কম বয়সের ছিলাম, কিছুতেই পাপ-পূণ্য এই জিনিসটা বুঝতে পারতাম না। স্বাভাবিক ভাবে আপনাদের মনেও প্রশ্ন উঠবে, পাপ-পূণ্য কি, ভাল-মন্দ কি। ঠাকুর এখানে যে কথাগুলো বলেছেন, এই কটি কথা বুঝতে পারলে সবটাই পরিষ্কার হয়ে হবে। দেখুন ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব, (Ego) রেখে দেন, তাহলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ-পূণ্যও রেখে দেন।

আপনাদের আমি অনুরোধ করছি, এই জায়গাটা একটু মন দিয়ে শুনবেন। অহংতত্ত্ব অর্থাৎ ‘আমি’ যদি রেখে দেন তাহলে ভেদবুদ্ধিও তিনি রেখে দেন; ঠাকুর বলছেন রেখে দেন; কিন্তু আসলে থাকবে। ‘আমি’ বোধ থাকলে ভেদবুদ্ধি থাকবেই। আমি বুদ্ধি কার থাকে? সবারই থাকে। যিনি খুব উচ্চমানের ভক্ত, তাঁরও ‘আমি’ বোধ থাকে। ফলে ভেদবুদ্ধিও থাকবে। এখানে বলা হচ্ছে, তিনি রেখে দেন; কিন্তু আসলে আমিত্ব থাকা মানে যেখানে দ্বন্দ্ব বোধের সমস্ত কিছু স্বাভাবিক ভাবে এসে যায়। গীতাতে দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ হল বিপরীত দুই শব্দ, যেমন –আলো-অন্ধকার, পাপ-পূণ্য, ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, সমস্তটা এক সঙ্গে আসে। জন্ম থাকলে মৃত্যু থাকবে, মৃত্যু থাকলে জন্ম থাকবে; ভাল থাকলে মন্দ থাকবে, মন্দ থাকলে ভাল থাকবে; এর পুরোটাই আমিত্ব থেকে হয়।

তিনি দু-একজনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন –তারা পাপ-পূণ্য ভাল-মন্দের পার হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন না, এই দু-একজন কত বছর পর হয়। ধর্মের ইতিহাসে কদাচিৎ কখন এই রকম কোন সিদ্ধপুরুষ হন, যাঁর পাপ-পূণ্য মিটে গেছে। কারণ বাকিদের জ্ঞান হলেও আমিত্বটুকু থেকে যায়। কারণ তাঁরা ঈশ্বরের লীলা আস্বাদন করতে চান, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকে তাঁরা আস্বাদ করতে চান; এনারা চিনি চাখতে চান, চিনি হতে চান না। এনাদের পাপ-পূণ্য, ভাল-মন্দের বোধ থাকবেই, কিছু করার নেই। যার জন্য দেখা যায়, যেখানে খুব বেশি রিচুয়ালস্, তিলক কাটছে, শিখা রাখছে, পৈতা পরছে, এগুলোতে বেশ বোঝা যায় যে ভেদবুদ্ধি আছে। রিচুয়ালস্ থাকা মানেই ভেদবুদ্ধি। সেইজন্য সন্ন্যাসীদের কোন রিচুয়ালস্ থাকে না। সন্ন্যাসের সময় ওনারা যে হোম করেন, সেই হোমাগ্নিতে তাঁরা সব রিচুয়ালস্ আহুতি দিয়ে দেন। আপনি নিজের মত কিছু করছেন, সেটা অন্য ব্যাপার। যেমন আমাদের অনেক মহারাজরা আটকে প্রসাদ খান, গঙ্গাজল পান করেন; আমিও করি। কিন্তু ওটা আমাদের জন্য বাধ্য কিছু না। অকরণে প্রত্যবায়, না করলে পাপ, সেটা আমাদের হবে না। আমি করি, ভালবাসি তাই করছি। আমি বেশ কয়েকজন মহারাজের দেখেছি, তাঁদের ঘরে ঠাকুরের কোন ছবি পর্যন্ত নেই। প্রথম প্রথম বুকে কেমন একটু ব্যাথা লাগত, এখনও লাগে। কারণ তাঁরা পাপ-পূণ্য, ভাল-মন্দের পারে। শুধু নিজের ব্যাপারে না, অপরের ব্যাপারেও।

ঈশ্বরদর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পার, আমার পাপ-পূণ্য সমান হয়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি। কল্পনা করতে পারবেন না, আমাদের ভক্তরা কিভাবে এই দু-নম্বরীটা করে –কথায় কথায় বলা চাই, তাঁর ইচ্ছায়

করছি। তা কি কখন হয় নাকি। যে বলে আমি সব তাঁর ইচ্ছায় করছি, তাদের জিজ্ঞেস করতে হয়, আপনার কি ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন? ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়ে আপনাকে কি বলেছেন, এই কর, সেই কর?

একটা মজার কথা বলি। একবার আমাদের দুজন মহারাজের মধ্যে কোন কাজ নিয়ে অশান্তি লেগেছিল। যাঁর ক্ষমতা ছিল, তিনি বলছেন –মেনে নিন এটা ঠাকুরের ইচ্ছা। অন্য মহারাজ তখন বলছেন, ঠাকুরের ইচ্ছা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় কি আছে। আমি তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, ঘটনাটা শুনে আমার হাসি আর থামতে চাইছিল না। এখনও ভাবলে হাসি পেয়ে যায়। ঠাকুর এখানে পরিষ্কার বলছেন, ঈশ্বরদর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে এগুলো সব মুখের কথা। আপনি আপনার দুর্বলতা, আপনার অহংকারকে ঢাকা দেওয়ার জন্য, আপনার ক্ষমতাপ্রিয়তাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু অন্তরে জান যে, ও-সব কথা মাত্র; মন্দ কাজটি করলেই মন ধুকধুক করবে। এটাই হল শেষমেশ। ক্রিমিনালদেরও এসবের কোন বোধ থাকে না, নোংরা ঘাটতে ঘাটতে ওদের ঘেন্নাটাই চলে গেছে, এরা অন্য জিনিস, এদের কথা বলা হচ্ছে না। **ঈশ্বরদর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি "দাস আমি" রেখে দেন**। যিনি 'দাস আমি' রেখে দিলেন, তাঁরও কিন্তু এই ভেদবুদ্ধি থাকবে। সেই চৈতন্য, যাঁর নিত্য যাঁর লীলা, সিদ্ধির পর কাকে কেমন তিনি রাখবেন বলা অসম্ভব। ভেদবুদ্ধি তিনি মুছে দিতে পারেন বা ভেদবুদ্ধি রাখতেও পারেন। আচার্য শঙ্করের জ্ঞানের পরেও ভেদবুদ্ধি ছিল, যার জন্য বলছেন –দূরম্ অপসর রে চণ্ডাল। শিব তখন আচার্য শঙ্করকে তাঁর রূপ দেখালেন এবং উপদেশ দিলেন এবং আচার্য শঙ্কর অভেদ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। স্বামীজী মথুরার পথে যাচ্ছেন। একজন রাস্থার পাশে বসে হুঁকো খাচ্ছিল। দেখে স্বামীজীরও হুঁকো খাওয়ার ইচ্ছে হল। স্বামীজী হুঁকো খেতে চাইলেন। লোকটি বলল, ম্যায় তো ভাঙ্গি হু। স্বামীজী সেখান থেকে আবার চলতে শুরু করলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁর ভাবনাতে এলো, আমি তো সন্ন্যাসী, এ কি করছি? সেখান থেকে আবার ফিরে এলেন। দাও, আমাকে, আমি হুঁকো সেবন করব। পরে কেউ বলেনি যে, ওই ভাঙ্গি আসলে শিব ছিলেন, কি কৃষ্ণ ছিলেন। কিন্তু ওখানেই ভেদবুদ্ধির মাথায় বজ্রাঘাত।

সে অবস্থায় ভক্ত বলে –আমি দাস, তুমি প্রভু। সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে; ঈশ্বরবিমুখ লোককে ভাল লাগে না; ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হল, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন। অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি যাওয়ার নয়। যিনি উচ্চমানের ভক্ত, তাঁর এই ভেদবুদ্ধিতে কিছু আসে যায় না।

প্রতিবেশী –মহাশয় বলছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কর। তাঁকে কি জানা যায়?

এখানে দুটি প্রশ্ন। এক, সংসার করা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, ঈশ্বরকে কি জানা যায়? এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, যাঁর ঠিক ঠিক ঈশ্বরজ্ঞান হয়েছে তিনি কেন আর সংসার করতে যাবেন? সংসারে তিনি আচার্য রূপে থাকতে পারেন, কিন্তু এই থাকাটাকে ঠিক সংসার করা বলা যায় না। একটা যদি বোধ হয়ে যায় যে, ঈশ্বর বলতে এই, আর ঈশ্বরই সত্য। এই সংসার হল আমার ভিতরে যে সীমাবদ্ধতা, আমার ভিতরে যে কামিনী-কাঞ্চন ভোগের ইচ্ছা, এগুলোকে চুকিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি নিজেকে উপরে নিয়ে যেতে পারা যায়। এই বোধটা যদি এসে যায়, তাহলে কিন্তু অতটা সে সংসারের বন্ধনে পড়বে না। বন্ধনে পড়বে, কিন্তু ওই বন্ধনটা খুব হাল্কা; এই বন্ধন থেকে এই জন্মে হোক বা দুই-এক জন্ম পরে বেরিয়ে আসা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উপর আগে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি, সেইজন্য এর মধ্যে আমরা আর যাচ্ছি না। তাঁকে কি জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এ-মনের দ্বারা জানা যায় না। যে-মনে বিষয়বাসনা নেই সেই শুদ্ধমনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

ঠাকুরের এই কথাগুলো নিশ্চয় আপনারা আপনাদের মত বুঝে রেখেছেন; আমার মন যদি শুদ্ধ হয়ে যায়, আমি দেখতে পারব। আমরাও কম বয়সে এই ভাবেই ভাবতাম। কিন্তু জিনিসটা একেবারেই তা নয়। এই জগৎকে জানা, ঈশ্বরকে জানা; একটু যদি এটাকে বুঝে নেওয়া যায়, তখন ধর্মগ্রন্থ পড়তে সুবিধা হয়, বুঝতে সুবিধা হয়; কিন্তু তার থেকেও বেশি হল, সংসার করতে অনেক সুবিধা হয়, সংসারে জ্বালাযন্ত্রণাগুলোও বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। আমাদের ধারণা হল এই জগৎটা বাইরে আছে, আমি এই জগৎকে গ্রহণ করছি। ধরুন এই কলম আছে, আমরা সবাই মানছি এই কলমটা আছে। এই কলমটি যেভাবেই হোক আমার কাছে এর আলো আসছে; চোখ সেই আলো গ্রহণ করছে। মন ধারণা করে বলছে, এটি কলম, এই কলম এই এই কাজে লাগবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুকে আমরা এভাবেই দেখি।

খুব ভাল উদাহরণ হল চাঁদ। একজন প্রেমিক চাঁদে তার প্রেয়সীর মুখ দেখে, একজন বিদ্রোহী কবি দেখেন চাঁদ যেন এক ঝলসানো রুটি, একজন বৈজ্ঞানিক চাঁদের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে বোঝার চেষ্টা করেন, আবার মহাকাশচারীর কাছে চাঁদ একটা অন্য জিনিস আর বাচ্চাদের কাছে সেই চাঁদ হল মামা, চাঁদমামা। দেখুন একই বস্তু বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন ভাবে হাজির হচ্ছে। অথচ প্রত্যেক মানুষের মনে সেই একই চাঁদের ছবি যাচ্ছে। সেখান থেকে আমরা আমাদের মনের মত করে চাঁদকে গ্রহণ করছি, নিজের কাজে লাগাচ্ছি; সবটা তখনই সম্ভব যখন বাইরে চাঁদ আছে, যাকে আমরা চোখ দিয়ে দেখছি এবং পরে মনে দিয়ে নিচ্ছি।

ঠিক একই ভাবে আমরা সবাই মনে করি এটাই আমাদের জগৎ। মৃত্যুতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে, ইন্দ্রিয়ের কার্য স্তব্ধ হয়ে যাবে, আমিও শেষ। কিন্তু আমরা যদি একটু বিচার করে দেখি, দেখব যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সব আমাদের মনের ভিতরে হচ্ছে। কথায় কথায় আমরা বলি everything is in mind, ভালবাসা জিনিসটা মনের ভিতরে, অপছন্দ করা জিনিসটা মনের ভিতরে, রাগ-দ্বেষ মনের ভিতরে, জগৎটাও মনের ভিতরে। অতি সাধারণ একটা ঘটনার কথা বলি, আপনারা হয়ত অনেকেই জানবেন। কিছু দিন ধরে আমার দুটো চোখেই সমস্যা চলছিল। মাঝখানে একটা সময় থেকে কিছুই দেখতে পারছিলাম না। ক্লাশগুলো নিচ্ছিলাম আন্দাজে; এতদিন ধরে যে জ্ঞানযোগে রয়েছি তার জোরে। চোখ দিয়ে কোন লেখা একেবারেই পড়তে পারছিলাম না। অথচ ডাক্তারবাবু আমাকে বারবার বলে যাচ্ছেন কোন সমস্যা নেই, চিন্তার কিছু নেই। তারপর শেষে একদিন তিনিও বললেন, না, সমস্যা আছে। আর সেই সমস্যা তিরিশ সেকেণ্ডে সমাধান করে দিলেন। দুটো চোখেই একটা লেজার দিলেন, ফুটো করলেন। এক মিনিট আগে ডাক্তারবাবুকে এবং পুরো ঘরটা যে রকম দেখছিলাম, পুরোটাই পালটে গেল।

মজার জিনিস হল, একটা ছুঁচ, ওই ছুঁচেরও হাজার গুণ ছোট একটা ছিদ্র; আমাদের চোখের যে আসল কাজ, ওই অত ছোট্ট একটা ছিদ্র করছে। এই যে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ওই ছোট্ট একটা ছিদ্র দিয়ে ভিতরে যাচ্ছে আর আমার মনের জগৎকে পুরো তোলপাড় করে মাচিয়ে দিচ্ছে। এত বড় একটা কলম, এখন যে সাইজে দেখছি বা যা কিছু আমরা সামনে দেখছি, যার ছবি আমার ভিতরে যাচ্ছে, সব কিছুর বোধ একমাত্র মনই করছে। কলমটা এতটা বড়, এই তার রঙ, এই পুরো ব্যাপারটা মনের ভিতরে আগে থেকে যদি না থাকে, কখনই আমরা কোন জিনিসকে জানতে পারব না। স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, external world is a mere suggestion, বহির্বিশ্ব থেকে শুধু সিগনাল আসে, বাকি কাজ মনই করে।

এটা খুব ভাল বোঝা যায়, আমাদের স্মৃতিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে। জীবনে কোন দুঃখ যদি পেয়ে থাকেন, কোন ভালবাসা যদি পেয়ে থাকেন, আনন্দের কণা যদি থেকে থাকে, দেখবেন স্মৃতিতে ওটা কত পাওয়ারফুলি আসে, আশ্চর্য। বাস্তবে জিনিসটা পেলে অত আনন্দ হয় না। কিন্তু শুধু স্মৃতিতে যেটা থাকে, ওটা আরও বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যায়। ভয়ের যে স্মৃতি, বা একটা পূর্ব কল্পনা, ভয়

আসছে, সেটা বাস্তবের থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। জগৎ ওটাকে একটা রিয়েলিটি চেক দিয়ে ঠিকঠাক করে দেয়; কিন্তু মনের ভিতরে থাকলে, মনে ভেবে ভেবে মানুষ পুরো পাগল হয়ে যায়।

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে জগৎকে পাই, আর মনের মধ্যে যে স্মৃতি রয়েছে, কল্পনা রয়েছে, মিথ্যা জ্ঞান রয়েছে; যোগশাস্ত্রে যাকে বলছেন, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি; এই পুরোটাই একটা বিশাল জগৎ। নিদ্রাতে অভাব, কোন বোধ থাকে না; স্বপ্নের অবস্থা বলা হচ্ছে না, গভীর নিদ্রার কথা বলা হচ্ছে। আমাদের মনের ভিতরে এই যে পাঁচ রকমের ভাব; বহির্জগৎকে কোন দর্শন বেশি দাম দেন না, বহির্জগৎ থেকে যে টোকাটা আসছে, ওই টোকার জোরে অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মনে এই যে আলোড়ন, তা যেভাবেই হোক, বাইরে থেকে এসে থাকুক, বা মনের স্মৃতি থেকে এসে থাকুক; এটাকেই বলা হয় মনের বৃত্তি, এটাই চিত্তবৃত্তি। আমাদের সমস্ত জ্ঞান হল এই চিত্তবৃত্তি। আমাদের সংসার এটাও একটা চিত্তবৃত্তি। যেটাকে আমরা সংসার বলছি, যেখানে আহার, নিদ্রা, মৈথুন, কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ আদি যা কিছু আছে, সবটাই চিত্তবৃত্তি। এই যে মনে চিত্তবৃত্তির ঢেউ খেলে যাচ্ছে, এটাই আমাদের জ্ঞান, এটাই আমাদের সংসার।

যখনই দেখবেন আপনার মনে অনেক বেশি ভালবাসা, তখন বুঝবেন এটা আপনার মনের ব্যাপার, সামনের লোকের মধ্যে কোন ভালবাসা নেই। আমরা আমাদের ভালবাসাকে সামনে দিয়ে সেটাকে চেটে মনে করি, আহা, এ-কে আমি কত ভালবাসি। মা যে সন্তানকে ভালবাসছেন, সেখানেও এই একই জিনিস হয়। স্নেহ, ভালবাসা সব মায়ের ভিতরে, সেটাকে সে দিয়ে দিচ্ছে নিজের সদ্যোজাত শিশুর উপর। শিশু জানেও না কি হচ্ছে। এইভাবেই মায়ের ভালবাসা সন্তানের উপর বর্ষিত হয়। যার ভিতর যত ভালবাসা, সে তত অপরকে ভালবাসতে পারবে। কারণ সামনের কেউ ভালবাসার যোগ্য না, ভালবাসা আপনার ভিতরে। একবার যদি এই জিনিসটাকে বুঝে নিতে পারা যায়, জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়, শাস্ত্র বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। ফলস্বরূপ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণাও অনেক কমে যাবে। ঠিক তেমনি ক্রোধ কখন কোন মানুষের উপর হয় না, ক্রোধ আপনার ভিতরে রয়েছে বলেই সেটা বেরিয়ে আসছে।

যখন চিত্তবৃত্তিগুলি সব থেমে যায় এবং চিত্তবৃত্তি যখন পুরো থেমে গেল; তখন সংসারও থাকবে না, কোন জ্ঞানও থাকবে না। চিত্তবৃত্তি সব থেমে যাওয়ার পর এতক্ষণ যিনি এই বৃত্তিগুলিকে জানছিলেন, এরপরে শুধু তিনিই থেকে যান। সহজ উদাহরণ হল সমুদ্র আর তার ঢেউ। ঢেউ ওঠা বন্ধ হয়ে গেল, এখন রইল শুধু শান্ত সমুদ্র। সমুদ্র কখন যায় না, ঢেউ আসা-যাওয়া করে। সমস্ত বৃত্তি শেষ, বৃত্তি শেষ মানে, চিত্ত শান্ত। এই শান্ত চিত্ত যেটা, আসলে এটাই সেই শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁকে আত্মা বলা হয়, ব্রহ্ম বলা হয়, নির্গুণ-নিরাকার ঈশ্বর বলা হয়; যেভাবেই আপনি বলুন কোন অসুবিধা নেই, একই জিনিস।

এতক্ষণ তাহলে কি হচ্ছিল? এই যে শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁকে আত্মা বলা হয়, ব্রহ্ম বলা হয়; তাঁর যে নিজস্ব ক্ষমতা, যেটাকে আমরা মায়া বলি; এই মায়া মাত্র দুটি কাজই করতে পারে –আবরণ আর বিক্ষেপ। আবরণ মানে ঢেকে দেওয়া, আর বিক্ষেপ মানে সামনে একটা জিনিসকে দেখিয়ে দেওয়া। জাদুকররা যেমন দেখান, একটা জিনিসকে অন্য একটা জিনিস রূপে দেখিয়ে দেন। মায়াকে তাই অনেক সময় জাদু বলা হয়। শুদ্ধ চৈতন্যকে ঢেকে দিল, ঢেকে দিয়ে সেখানে দেখাতে শুরু করল সংসার। এটাই আবার দুই ভাগে চলে যায় –এক ভাগ হল মন, দ্বিতীয় ভাগ হল সংসার। সবটাই কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য। আসলে সত্যিকারের কোন বিভাজন হয় না। চৈতন্যের যে শক্তি, যেটিকে মায়া বলা হয়, প্রকৃতি বলা হয়, শক্তি বলা হয়, যেভাবেই বলুন; দূর্গা, পার্বতী; কালী যাই বলুন; চৈতন্য মানে জ্ঞানশক্তি।

যেমন ধরুন আপনি ঘুমোচ্ছেন আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নে আপনার মন আপনার সামনে এক পরিচিতকে দাঁড় করিয়ে দেয়, আপনাকেও দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বপ্নে আপনি তাঁকে বলছেন,

'আরে ভাই আপনি! অনেকদিন আপনার সাথে দেখা হয়নি'। তিনিও বললেন, 'সত্যিই, অনেকদিন দেখা হয়নি'। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যেই দেখছেন, সেই লোক অন্য কিছু একটা হয়ে গেল। যদি তিনি আপনার পছন্দের না হয়, তিনি সাপ, বিছে কিছু একটা হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি সাপ হয়ে গেলেন কি করে? স্বপ্নে এই রকম উদ্ভট্টি জিনিসগুলো চলতে থাকে। তারপর আপনি ভাবছেন, এটা মিলছে না তো। তারপর স্বপ্নেই মেলানো শুরু হয়ে যায়। স্বপ্নে মন একটা জগৎ সৃষ্টি করে দেয়, ওই জগতে আপনিও প্রবেশ করে যাচ্ছেন। দুই হয়ে যাচ্ছে –কর্তা, ভোক্তা; সাবজেক্ট, অবজেক্ট। বহির্জগতে এই শক্তিকে মায়া বলা হয়।

একই জিনিস চৈতন্যও করে। চৈতন্য যখন চিন্তন করছেন, এই চিন্তাতে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এক জগৎ, আর জগতের এক ভোক্তা, যেটা আমি আপনি সবাই। তাহলে কি বাস্তব সত্তা আছে? যতক্ষণ মনে করছেন আছে, ততক্ষণ আছে। যখন নেই, তখন নেই। স্বপ্নে তো কখন মনে হয় না যে, আমি স্বপ্ন দেখছি। কদাচিৎ কখন মনে হয়, কিন্তু ওটা সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। শুদ্ধ চৈতন্যই মন আর জগৎ এই দুটি রূপে ভাসতে থাকে। মন আর জগৎ, এই দুটি জিনিস ভাসছে, কি আশ্চর্য। এই জগৎকে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করে; আবার সরাসরিও গ্রহণ করতে পারে, স্মৃতি আদিতে সরাসরি গ্রহণ করে। কিন্তু জ্ঞান যেটা হয়, যেটা আগে বলা হল, যে জ্ঞানটা হয় এটাকে বৃত্তি বলা হয়। যার জন্য যোগশাস্ত্রে বলা হয় – চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

যদি কেউ নিজের অবস্থায় যেতে চান, অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন করতে চান, বা আত্মজ্ঞান পেতে চান, তার জন্য তাঁকে আগে এই মায়াকে নাশ করতে হবে। মায়াকে নাশ করা মানে, আমি-তুমি যে বোধ, এই বোধকে নাশ করতে হবে আর জগৎকে উড়িয়ে দিতে হবে। আর মন যেটা দিয়ে সব কিছু জানা যায়, তাকেও উড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এই সব কিছুর নাশ হয় চিত্তবৃত্তি নিরোধে। যেমনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেল, ঢেউএর ওঠা-নামা বন্ধ হয়ে গেল, কোথাও আর কিছু নেই। এই যে এতক্ষণ কত রকমের ঢেউ, বড় ঢেউ, ছোট ঢেউ, ধীরে চলা ঢেউ, জোরে চলা ঢেউ; সব বন্ধ হয়ে গেল, সব কিছু শেষ হয়ে গেল, থেকে গেল এক সমুদ্র। আগেও তো সেই একই সমুদ্র ছিল। তখন মনে হচ্ছিল – সমুদ্র গর্জন করছে, সমুদ্রের কত পরিবর্তন হচ্ছিল। এই উদাহরণগুলো বোঝানোর জন্য বলা হচ্ছে, আক্ষরিক ভাবে সব কিছু বিচার করতে যাবেন না। ঈশ্বরজ্ঞান মানে, ইন্দ্রিয় নেই, মন নেই, জগৎ নেই, মায়া বা প্রকৃতিও নেই। ঠাকুর যতবার বলছেন, শুদ্ধ মন দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায়, পুরোপুরি তিনি এই অর্থেই বলছেন।

আর-একটা হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ দিয়েই সব কিছু হয়েছে। কেউ যদি নিজের মনকে একেবার শুদ্ধ করে নেয়, অর্থাৎ শুদ্ধ সাত্ত্বিক করে নেয়। কোথাও তার কোন ধরণের স্বার্থ নেই, কামিনী-কাঞ্চনের লেশমাত্র নেই, সমগ্র জগতের প্রতি তার সমান ভালোবাসা, তখন তার মনে বেশি বৃত্তি থাকে না। বিশেষ করে যখন তিনি ধ্যানে বসেন, ওনার বৃত্তি কমে যায়, এক বৃত্তি থাকে। তখন এই চৈতন্য, তিনি ওই শুদ্ধ মনে ঈশ্বর রূপে তাঁকে দর্শন দিতে পারেন। এর বাইরে যত রকমের কথা আমরা শুনে থাকি –তার ওই অনুভূতি হচ্ছে, ওই দর্শন হচ্ছে; বুঝবেন এগুলো সব তার মনের ভ্রান্তি, আর যে শুনছে সে হল ঠাকুর যেমন বলছেন, ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা। ঈশ্বরের যে কোন জ্ঞানে যদি বোধ হয়, মন চলছে আর আমি দেখছি, বুঝবেন এটা কোন জ্ঞান না, সবটাই মনের ভুল। যার জন্য শ্রীশ্রীমা এক জায়গায় বলছেন, খোলা চোখে কে তাঁকে দেখেছে। সে এক অবতার দেখতে পারেন, সাধারণ লোকেরা পারে না।

আমাদের সমস্ত দর্শন ভাবে হয়, ধ্যানের গভীরে হয়। সেখান থেকে যে অনুভূতিগুলো হয়, তাও ভাবের মধ্যেই হয়। বাকি লোকেরা যেসব অনুভূতির কথা, দর্শনের কথা বলে, সব মনের ভুল। আমাদের কাছেও এই ধরণের লোক অনেকেই এসে বলেন, কারুর এই দর্শন, সেই দর্শন হয়েছে। অনেক সময় আবার চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন। আগে আমার মনটা অপরিপক্ক ছিল, তাই

বলে দিতাম, কোন পাগলা ডাক্তারকে দেখান। এখন বলি না, তার বদলে বলি, ভাল করে জপধ্যান করুন, মন শান্ত করুন আর খাওয়া-দাওয়াটা একটু ভাল করে করুন। আসলে এগুলো হল দুর্বল মনের লক্ষণ। একমাত্র যাঁর বিশুদ্ধ মন, আর তিনি যদি কৃপা করেন, তাঁকে তিনি দর্শন দিতে পারেন।

কিন্তু ঠিক ঠিক ঈশ্বরদর্শন আমরা যে অর্থে বলছি, এই দর্শনের পর জীবনে কোথাও কোন রকম আর চাঞ্চল্য থাকবে না। শুধু একটি বৃত্তি থাকে, একটি ঢেউ, ঈশ্বররূপী ঢেউ। কিভাবে হয়? ধ্যান যখন করা হয়, আপনার ইষ্টকে নিয়েই যখন চিন্তন করছেন, তখন বাকি সমস্ত ঢেউ, ছোট, বড়, মাঝারি সব ঢেউ শেষ হয়ে ওর মধ্যে এসে মিশে যায়। তখন এই শুদ্ধ চৈতন্য তাঁকে ঈশ্বর রূপে দর্শন দেন। বাকি সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দর্শন দিচ্ছেন। এমন কি এনারা যখন উপদেশাদি দেন, তখনও এনাদের বেশি বৃত্তি হয় না। কারণ একবার ওই জ্ঞান হয়ে গেলে ওই জ্ঞান আর যায় না। যেমন, যে মহূর্তে আপনি জেনে গেলেন আগুন জিনিসটা কি, আগুনের ব্যাপারে কোন দিন আপনার আর কোন ভুল হবে না, ঠিক সেই রকম।

ঠাকুর যে বলছেন, যে-মনে বিষয়বাসনা নেই সেই শুদ্ধমনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়, এখানে হল –কোথাও কোন বাসনা নেই, মন পবিত্র, শুদ্ধ সত্ত্ব; তাঁর কৃপায় এই মন দিয়ে তিনি তাঁর দর্শন পেতে পারেন; কিন্তু এই অবস্থা থেকেও তিনি পড়ে যেতে পারেন। ঠাকুর যেমন বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। ঈশ্বরদর্শন হয়ে যাওয়ার পরেও আপনি পড়ে যেতে পারেন; কারণ আপনি এখনও বৃত্তির জগতে বাস করছেন। পড়ে যাওয়ার পর আপনার মনে হবে, আমার কি যেন একটা হয়েছিল। আবার মায়ার জগতের সাথে জড়িয়ে যাবেন। কারণ সত্ত্বগুণ যদি থাকে তাহলে দুদিন পরে রজোগুণও এসে যাবে, আর রজোগুণ থাকলে তমোগুণও এসে যাবে। একবার যদি এই তিনটে গুণের পারে যাওয়া যায়, একবার যদি মনের পারে যাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের পারে যাওয়া যায়; তিনি আর কোন দিন এই তিনটে গুণের মধ্যে পড়বেন না, মায়ার রাজ্যকে তিনি ছাড়িয়ে যাবেন।

প্রতিবেশী –ঈশ্বরকে কে জানতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ –ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হলেই হল। এতক্ষণ যেটা বলা হল, ঠাকুরের এই কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করলে সঙ্গে সঙ্গে পুরো জিনিসটা বুঝে নেবেন। আত্মা অনন্ত, ঈশ্বর অনন্ত। এই অনন্ত বলতে অনন্ত আকাশ, সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি, একেবারেই তা না। অনন্ত বলতে অনন্ত, যার প্রতিটি কণাও অনন্ত। তাহলে কি তাঁর কণা আছে? এটা কথার কথা, বোঝানর জন্য আমাদের ভাষায় বলছি। যেখানেই আপনি মন দিন, সেটাই পূর্ণ। যেমন পৃথিবী, পৃথিবীর কেন্দ্র কোথায়? যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র। পৃথিবীর যে রূপ, যে আকার; যেখানেই আপনি দাঁড়াবেন সেখানেই পুরো পৃথিবী আপনার পায়ের তলায়। পৃথিবীর কেন্দ্র বাস্তবে আপনি।

চৈতন্যের ক্ষেত্রে ঠিক এটাই হয়; অনন্তের প্রত্যেক কণা বিশুদ্ধ চৈতন্য। প্রত্যেকটি কণা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে। আর সেটাকে জানার জন্য আপনার বৃত্তি তো থাকছে না, সেইজন্য আত্মাকে জানা যাবে না। আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া যায়, আত্মাকে জানা যায় না; এই ব্যাপারে অন্যান্য জায়গায় আমরা বিস্তারে বলেছি। স্বামীজীর দেববাণী বা মাণ্ডুক্যকারিকার ক্লাশগুলোতে আমরা এর উপর বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি। আত্মার সঙ্গে এক হওয়া যায়, কিন্তু আত্মাকে জানা যায় না; কারণ মন নেই কিনা। তাহলে যে ঈশ্বরকে জানতে যাবে, তার কি হবে? যদি মনকে নিয়ে যান, ঈশ্বরকে জানতে পারবেন না। মনকে যদি ছেড়ে দেন, তাও ঈশ্বরকে জানতে পারবেন না। আমার ক্রতু বইতে দেখবেন, ক্রতু একজন সিদ্ধ, কিন্তু তাঁর একটি ইচ্ছা, বন্ধুকে সাহায্য করবে। সেইজন্য অনন্তকে সে জানতে পারছে না, আর সত্যিই কোন দিন জানতে পারল না। অপরের আমি ভাল করব, এই সদিচ্ছা থাকলেও আত্মজ্ঞান হবে না। কারণ মনের মধ্যে একটা বৃত্তি থেকে গেছে।

মন ওইসব বিচার করে না, যেমন ধরুন দাড়িপাল্লা, দাড়িপাল্লায় আপনি সোনা মাপছেন, কি কয়লা মাপছেন, তাতে দাড়িপাল্লার কিছু যায় আসে না, ও শুধু আপনাকে ওজন দেখিয়ে দেবে। আপনার ইচ্ছা সদিচ্ছা কি অসৎ ইচ্ছা, মন ও-সব কিছু বোঝে না; মন শুধু বোঝে চিত্তবৃত্তি। পুকুরের তলদেশে একটা জিনিস পড়ে আছে; ঢেউ থাকলে ওই জিনিসটাকে দেখা যাবে না। একটি ঢেউ থাকলে আবছা দেখা যাবে আর ঢেউ পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেলে পরিষ্কার দেখা যাবে; আত্মজ্ঞান ঠিক এই রকম। আত্মা অনন্ত, এই জ্ঞান লাভ করার জন্য মনকে ত্যাগ করতে হয়। এবার আপনি আত্মার সঙ্গে এক হলেন। এবার যদি তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর কৃপায় ফেরত যদি আসেন, অর্থাৎ আবার যদি মনকে নিয়ে আসেন, তখন এই মন কিন্তু পুরো অন্য মন। এই মনে শুধু একটা স্মৃতি থাকে। কি সেই স্মৃতি? একটা পূর্ণজ্ঞানের বোধ, একটা আনন্দের বোধ আর অনন্তের বোধ। যেমন গভীর নিদ্রা থেকে জাগার পর কিচ্ছু মনে থাকে না ঘুমের মধ্যে কি হয়েছিল, শুধু এইটুকু বোধ থাকে –কি গভীর ঘুমিয়ে ছিলাম, কিছু হুঁশ নেই। অর্থাৎ গভীর নিদ্রাতে কি হচ্ছিল, সেটা জানার কোন পথ নেই, কিন্তু গভীর নিদ্রার ওই স্মৃতিটুকু থেকে যায়। ফলে কি হয়, ঈশ্বরের যে রূপকে নিয়ে যিনি আরাধনা করেন, সিদ্ধিতে তিনি ঈশ্বরের সেই রূপটিই পান।

ঠাকুরের এখানেই বৈশিষ্ট্য। যেমন ধরুন অন্যান্য ধর্মে যাঁরা প্রবর্তক, তাঁরা তাঁদের মত যেটা দেখলেন, তাঁকে দেখলেন, তাঁকে অনন্ত রূপে জানলেন; ঠাকুরও তাই জানলেন। কিন্তু তারপর ঠাকুর বিভিন্ন ধর্মের সাধনা, বিভিন্ন মতের সাধনা, অদ্বৈত সাধনা করে দেখাচ্ছেন, কিভাবে যত দেবদেবীর রূপ, ঈশ্বরের যত রূপ আছে সব রূপ সত্য, সব সেই অনন্তেরই রূপ।

এখানে এসেই হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। একজন খ্রীশ্চান বলবেন, তাঁদের যে গড্, তিনি হলেন অনন্ত; বাকি সব ফলস্ গড্। এই কথা বিদেশীরা আজকের দিনেও বলে যাচ্ছে। আমাদের হিন্দু ধর্মের মূল কথাই হল, *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*, যা সেই বেদের সময় থেকে চলে আসছে। ঠাকুরও সব রকম মত ও ধর্মের সাধনা করে দেখালেন, প্রত্যেক দেবদেবীর রূপ সত্য। ঈশ্বরকে যে যেভাবেই ভজনা করছেন, সেটা সত্য। কারণ সেটা হল অনন্তে যাওয়ার পথ। গীতা, উপনিষদ তাই বললেন, আচার্য শঙ্কর তাই বললেন, ঠাকুরও সেটাই বলছেন। এটা যদি সত্য না হয়, তাহলে ধর্মে ধর্মে মারামারি লেগে যাবে; কারণ খ্রীশ্চানদের কাছে তাদের ঈশ্বর সত্য, মুসলমানদের কাছে তাদের ঈশ্বর সত্য, জুহুদিদের কাছে তাদের ঈশ্বর সত্য, বৈষ্ণব, শৈব সবার কাছে তার তার ঈশ্বরই সত্য, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মারামারি লেগে যাবে। বলবে, ঈশ্বর কি করে এত রকম হতে পারেন, কোন একটা ঠিক করুন। কিভাবে ঠিক করবে? আসুন, যুক্তিতর্ক দিয়ে না, তলোয়ার বার করুন, একবারেই ফয়সালা হয়ে যাক।

কিন্তু আমরা সত্যটা জানি, আমরা এইজন্যই জানি, কারণ আমাদের এখানে কোন একজনের আদেশে বা উপদেশে ধর্ম চলে না। হিন্দু ধর্ম ঋষি পরম্পারার ধর্ম, সনাতন পরম্পরার ধর্ম, অনন্ত পরম্পরা। ইদানিং কালে ঠাকুর এসে একই কথা বললেন –তিনি অনন্ত, তাঁর ভাব অনন্ত, তাঁর রূপ অনন্ত, তাঁকে লাভ করার পথও অনন্ত। আপনি যে ভাব ও রূপকে নিয়ে চলতে চাইছেন, আপনার কাছে সেটাই সত্য।

সেখান থেকে ঠাকুর বলছেন –**ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই হল। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? একঘটি হলেই খুব হল। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গিছল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার? একটা-দুটো দানা হলেই হেউ-ঢেউ হয়**।

অন্য জায়গায় ঠাকুর আবার বলছেন, শুকদেব আদি যেন ডেঁয়ো পিঁপড়ে। এটাই হল ঠিক ঠিক অনন্তের বর্ণনা। আপনার যিনি ইষ্ট, তিনি সেই অনন্তেরই মুখ; আপনার ইষ্ট সেই অনন্তের পথ, আপনার ইষ্ট সেই অনন্ত। তাহলে আমার পাশে যিনি আছেন তাঁর ইষ্ট? তাঁর ইষ্টও তাই। এটা কি করে সম্ভব? একজন মুর্খ সাধু কোন একটা চ্যানেলে ঠাকুরের যত মত তত পথ, এই কথাটা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে

বিশ্রী ভাবে নিন্দা করছিল। আরে ভাই, আপনি এত মুর্খ যে কল্পনা করা যায় না। আমি ধরুন বেলুড় মঠে বসে আছি, এখান থেকে দিল্লী পশ্চিম দিকে। প্রথম কথা, আপনি যদি পূব দিকেও যাত্রা করেন, চলতে চলতে একদিন আপনি দিল্লী পৌঁছে যাবেন, কারণ পৃথিবী গোল।

প্রতিবেশী তখন আবার বলছেন। দ্বিতীয় কথা, এখানে পদার্থ জগতের কোন বর্ণনা হচ্ছে না, কোন বস্তুর বর্ণনা হচ্ছে না; ঈশ্বর কোন বস্তু নন, তিনি অনন্ত। অনন্তকে অনন্ত মানুষ অনন্ত ভাবে দেখবে, তারপর তারা যেটা বলবে সেটাও অনন্ত। এটাই হল সচ্চিদানন্দের ঠিক ঠিক রূপ, এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক অনন্ত। কিন্তু তাঁরা সবাই বলবেন, আমি তাঁকে জানি। হিন্দু পরম্পরায় যদি বড় না হয়ে থাকেন, আপনি বলবেন, একমাত্র আমিই ঠিক। হিন্দু পরম্পরায় যদি আপনি বড় হয়ে থাকেন, আপনি বলবেন, আমি ঠিক, তুমিও ঠিক; তবে তোমার পথ আমার পথ নয়। এই জায়গাতে এসেই অনেকে ভুল করেন। ঠাকুর কখন সব সমান বলছেন না, বলছেন মত পথ। তোমার মত তোমার পথ। আমার পথ সেটাই, যেটা আমার মত।

আমি তখন কলেজে পড়ি। যে কলেজে পড়ি সেই শহরে একবার শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ এসেছিলেন। আমরা তাঁর সেবা আদি করছিলাম। সেবা মানে, ওনাকে এখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া, উনি শহরের কিছু জানতেন না। অনেক আগে থেকেই মহারাজকে খুব শ্রদ্ধা ও সমীহ করতাম। আমি খ্রীশ্চান কলেজে পড়তাম, একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জাস্ট জানার জন্য, 'মহারাজ আপনি খ্রীশ্চান ফাদার কেন হলেন না'? খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন। 'যখন আমার সন্ন্যাসী হয়েছিলাম তখন ওদের ব্যাপারটা আমি জানতাম না, সেইজন্য হইনি। আজকে ওদের ব্যাপারটা জানি, তাই হব না'। সেই সময় মহারাজের উত্তরটা আমি বুঝতে পারিনি, আজকের দিনে আমি বুঝতে পারি। ভাই তোমাদের ব্যাপারটা পুরো জানতাম না, সেইজন্য তোমাদের দিকে গেলাম না; আজকে পুরো ব্যাপারটা জানি বলে যাব না। এই যে হিন্দু ধর্মের উদার ভাব, অনন্তকে ঠিক ঠিক বোঝা; প্রবর্তকের কোন দোষ নেই, দোষ রয়েছে তাদের অনুগামীদের; তাদের একটাই কথা, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর। আমাদের মঠ মিশনে ভক্তরা বলে, উনি আমার গুরু, ধ্যুৎ তোমার গুরু; কোন গুরু কি বলবেন, আমিই একমাত্র সদ্‌গুরু?

পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ একবার দেওঘর বিদ্যাপীঠে এসেছিলেন, তখন আমি বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমি তাঁর সেবা করার দায়ীত্ব পেয়েছিলাম। আমার পরিচিত একজন মহারাজকে প্রণাম করতে এসেছে, আমি মহারাজকে বললাম, 'মহারাজ উনি আপনার আশ্রিত'। মহারাজ বললেন, 'ও-রকম বলবে না, বলবে, ঠাকুরের আশ্রিত'। বোকা বোকা ভক্তরাই বলে, আমার গুরু অমুক, তোমার গুরু কে? সেখান থেকে আরও বোকা যারা, তারা বলবে, আমার ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর, আমার ধর্ম তোমার ধর্ম। তুমি মানবে না? এই দেখ, তোমার গলাটা কেটে দিচ্ছি। গলা কাটা যাবার আগে মেনে নাও।

ঠাকুরকে যাঁরা প্রশ্ন করছেন, যাঁরা শুনছেন, তাঁদের কোন পাত্রতা নেই বোঝার। আপনারা যে এতদিন ধৈর্য ধরে শুনে যাচ্ছেন, অবশ্যই আপনাদের পাত্রতা আছে। ওনাদের পাত্রতা ছিল না, তাই ঠাকুর যতটা পারেন তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলছেন। অতশত জানার কি দরকার, অনন্তের ভাব কে বোঝে? আগে আগে আমরা অনন্তের উপর অনেক বর্ণনা করেছি, দেখানো হয়েছে অনন্ত কি রকম। যেখানে ঠিক ঠিক অনন্ত, সেখানে অনন্তকে যদি যোগ করে দেন, তাও অনন্ত থাকবে। অনন্ত থেকে যদি অনন্তকে বার করে নেন, তাও সেটা অনন্ত থাকবে। গণিতের দিক দিয়ে এটা হয় না, গণিতে জিনিসটা অনেক জটিল হয়ে যায়। কোন জিনিসকে যদি ইনফিনিটি দিয়ে ভাগ করেন, ওরা বলে আনডিফাইনড্; অনেক সময় জিরো বলে কিন্তু আনডিফাইনড্। ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ইক্যুয়াল টু ইনফিনিট, এটাই ঠিক ঠিক। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে*।

প্রতিবেশী –আমাদের যে বিকার, একঘটি জলে হয় কই? ইচ্ছা করে ঈশ্বরকে সব বুঝে ফেলি!

এই প্রশ্ন করা দিয়েই বোঝায় কত কাঁচা মন। প্রথম প্রথম যখন ইন্টারনেট এসেছিল, সেই সময় খুব মজার মজার কথা আসত। এগুলো কেউ হয়ত বানিয়ে ছিল। এটা কি? ইন্টারনেট। ঠিক আছে পুরো একটা ইন্টারনেট আমাকে দিয়ে দাও। বোঝেই না, ইন্টারনেট জিনিসটা কি। আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, খুব সরল মানুষ। একটা ভিডিও এসেছে, ওনাকে বলা হল। উনি শুনে বললেন, ঠিক আছে, ওটার একটা প্রিন্ট আউট দাও। ছবির প্রিন্ট আউট হয়, সেখান থেকে মনে করলেন ভিডিওরও বুঝি প্রিন্ট আউটও হয়, বা ভাবছেন ওই রকম কিছু একটা হবে। সত্যিকারের ঘটনা। যখন ধারণা না থাকে, তখন কথাগুলো ঠিক এইভাবেই হয়। কেন? ঈশ্বর যতক্ষণ মুখের কথা হয়, তখন কথাগুলো এইভাবেই বলা হয়। ঈশ্বর যখন শাস্ত্রীয় কথা হয়ে যায়, চিন্তন করা কথা হয়ে যায়, তখন অনেকটা দমে। সাধনার কথা যখন আসে তখন আরও দমে যায়। সিদ্ধি যখন হয়, এই যে চিত্তবৃত্তির কথা বলা হল, তখন চিত্তবৃত্তি শেষ হয়ে গেছে। সিদ্ধির পর এমন আনন্দে সে ডুবে যাবে, আজকে সংসারে যে আনন্দ আমরা পাচ্ছি; আহার, নিদ্রা, মৈথুনে যে আনন্দ পাচ্ছি; পাচ্ছি আনন্দ কিন্তু এগুলো মাধ্যম; তাই না, এই মাধ্যমগুলির জন্য ইন্দ্রিয় দরকার, মন দরকার। যখন সরাসরি আনন্দ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন, তখন আপনার আর ইন্দ্রিয় লাগবে না, মন লাগবে না, বস্তুও লাগবে না।

যাঁর ঈশ্বরজ্ঞান হয়েছেন, তিনি যে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবেন, যে সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হবেন, যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হবেন; তখন আর এই ভিডিওর একটা প্রিন্ট দাও, এই রকম কথা আর বলবেন না। সমুদ্র, একঘটি জল, এই উদাহরণগুলো যখন দেওয়া হয়, এগুলো দিয়ে বোঝা যায় না। যদি বুঝতে হয়, আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করলাম, বোঝার এটাই একমাত্র পথ। ওই ভাবের মধ্যে এমন মিশে যাবেন যে, মনের মধ্যে আর কোন প্রশ্ন থাকবে না। স্বাভাবিক ভাবে আপনি জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে ঠাকুর এত কিছু করলেন? বা, ঠাকুর কেন বলছেন, আমার এখন ভাব পাল্টাচ্ছে? এটা বোঝার জন্য, যদি আপনি রমণমহর্ষি, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর উদাহরণ নেন, ওনারা একটা ভাবে পাকা হয়ে ওখানে স্থিত হয়ে যাচ্ছেন। অন্যান্য ধর্মের প্রবর্তকরাও ওই একটা ভাব নিয়ে ওখানেই স্থিত হয়ে যাচ্ছেন।

ঠাকুর শুধু আচার্য নন, ঠাকুর শুধু অবতার নন। ভারতের এই যে দশ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ইতিহাস, তার মূর্তরূপ। রোমা রোঁলা তাঁর বর্ণনায় বলছেন, ভারতের পাঁচ হাজার বছরের যে ধর্ম ইতিহাস, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন তাঁর মূর্তরূপ। ধর্ম বলতে পারেন, কারণ আমাদের যে ধর্মগুলি পালন করা হয়, সেগুলোও ঠাকুর পালন করেছেন। এটা আমি রোমা রোঁলা থেকে ধার করে বলছি না, এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। কেউ যদি বলে, আমাকে পুরো হিন্দু ধর্মটা দিয়ে দিন, যেমন একজন বলছেন, পুরো ইন্টারনেটটা আমাকে দিয়ে দিন; এটা কঠিন আছে। কারণ আমাদের শাস্ত্রে এ-রকম কিছু নেই। ঠাকুরের যে ব্যক্তিত্ব, যা কিনা পুরো সনাতন ধর্মের মূর্তরূপ। উপনিষদের যে তত্ত্ব, বেদের যে স্তুতিগুলো, পুরাণের যে কথাকাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের যে ধর্মদ্বন্দ্ব, গীতাতে যেমন সমস্ত কিছুকে এক জায়গায় নিয়ে এসে যে সার, আর সমস্ত কিছুকে বাস্তবিক করা; থিয়োরেটিক্যাল কোন কিছু নেই –সব কিছু ঠাকুরের মধ্যে মূর্তমান।

শুধু ঠাকুরকে জানার জন্য কথামৃত তো বটেই, লীলাপ্রসঙ্গ, ভক্তমালিকা, সব মিলিয়ে এক সঙ্গে যদি ছবি করেন, সেই ছবিটা আপনাকে নিজে তৈরী করতে হবে। কেউ যদি তৈরী করে দেন, ওটাতে হবে না, আপনাকে নিজে তৈরী করতে হবে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন, সত্যিই তাই তো, ঠাকুর হলেন পুরো সনাতন ধর্মের মূর্তরূপ। আমাদের ক্লাশের লেকচারের ভিডিওগুলো যদি দেখেন বা শোনেন, আমরা হিন্দু ধর্মের কত শাস্ত্রের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ব্যাখ্যা করেছি; আর শাস্ত্র ছাড়া আমরা তো অন্য কিছু বলি না। এগুলো সব শুনে, শোনার পর একটা ধারণা করার পর যখন ঠাকুরের দিকে তাকাবেন, দেখবেন সব কিছু ঠাকুরের মধ্যে আছে।

ঠাকুরের একটা বৈশিষ্ট্য, কেউ যদি বোকা বোকা কথা বলত, তিনি কখনই বলতেন না যে, এগুলো বোকা বোকা কথা। তিনি বক্তার নিষ্ঠাটা দেখতেন। যে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করছেন, কথাটা বোকার মত কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা আছে। তখন ঠাকুর তাঁর মত করে উত্তর দিতেন। যার জন্য আমরা দেখছি, একজন থিয়েটারওয়ালাকেও তিন তাঁর মত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঈশ্বরদর্শন ব্যাপারটা কি। এখানেও দেখুন ঠাকুর কি রকম প্রশ্নকর্তার মত করে উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তা বটে। কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে।

প্রতিবেশী –মহাশয়, কি ঔষধ?

সবাই চায়, একটা সহজ কোন উপায় পেতে। সবাই জীবনে সাফল্য পেতে চায়, জীবনে সবাই সুখী হতে চায়, আনন্দ পেতে চায়, সবাই জ্ঞান পেতে চায়; কিন্তু খাটতে কেউ চায় না। না খেটেই যদি সব কিছু পাওয়া যায়। ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, বিকারের ঔষুধ কি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সাধুসঙ্গ, তাঁর নামগুণগান, তাঁকে সর্বদা প্রার্থনা। সাধুরা ঈশ্বরের আদর্শকে পালন করছেন। তাঁর পাঁচটা দোষ থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরীয় কথার একটু আদর্শ, মূর্তরূপ তো নয়, আদর্শ; ত্যাগ-তপস্যা তো থাকেই। তার সাথে নামগুণগান। এবার তাঁর কাছে গেলেন, আর প্রার্থনা, কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা না, ঠাকুরের সঙ্গে এক হওয়ার প্রার্থনা, তাছাড়া আর কিছু না। এটা কোন প্রার্থনার মধ্যে নয়, এটা কোন চাহিদের মধ্যে নয়, এটা আপনার স্বরূপ। এই তিনটিই আপনার স্বরূপ। সাধুরা যে আদর্শের রূপ, সেটা আপনার ভিতরেও আছে; নামগুণগান, সেই নামেরই গুণগান করছেন, যেটা আপনার স্বরূপ। ঈশ্বরের কাছে যখন প্রার্থনা করছেন, তাঁকেই প্রার্থনা করছেন, সেটার জন্যই প্রার্থনা করছেন, যেটা আপনার স্বরূপ।

আমি বলেছিলাম, মা, আমি জ্ঞান চাই না, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, – মা আমায় তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও; আর আমি কিছু চাই নাই।

এই হল ডুবে যাওয়া, এক হয়ে যাওয়ার প্রার্থনা। আমি প্রায়ই বলি, কঠোপনিষদের যে মন্ত্র, *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।।* যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, হে নচিকেতা, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মেশালে যেমন সব জলটাই শুদ্ধ হয়ে থাকে, আত্মজ্ঞানে আত্মাকে ঋষিরা ঠিক সেইভাবেই জানেন। এই শুদ্ধে শুদ্ধকে মিশিয়ে দেওয়া, সব কিছুতে; এটা যে শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভক্তির ক্ষেত্রে হয় তা না, এটা সংসারেও হয়। যেখানে পবিত্র সম্পর্ক, সেখানে শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশে যায়। আগেকার দিনে আমরা দেখেছি, স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা এক অপরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতেন, শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছেন। গুরু-শিষ্য, সেখানেও শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। চাকরি যখন করছেন, সেখানেও শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলে মিশে এক; না পছন্দ হলে ছেড়ে বেরিয়ে যান। আজকের দিনে যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড, সেখানেও যদি আপনি এটা করেন, তবেই সবাই শান্তিতে থাকতে পারবে, তা নাহলে থাকতে পারবেন না। ঠিক তাদের মত যদি না হয়ে যান, ওই ওয়ার্ল্ডে আপনি টিকতে পারবেন না। তাঁদের মত যদি না হয়ে যেতে পারেন, তাহলে তাঁদেরকে আপনার মত করে নিন; অবশ্য সেই ক্ষমতা যদি আপনার থাকে।

যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলছেন, 'হে অর্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সবরকম পাপ থেকে আমি মুক্ত করব।' *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।* ঠাকুর এখানে শরণাগতির কথা বলছেন। *সর্বধর্মান্*, পাপ-পূণ্য সব কিছু থেকে মুক্ত করবেন। আশ্চর্য দেখন, ঠাকুর কেন এই কথা বললেন, আগে অতটা বুঝতাম না, কিন্তু পরে যখন আচার্যের ভাষ্য পড়লাম, সেখান আচার্য শঙ্কর ঠিক এই কথাই তাঁর ভূমিকাতে লিখছেন, গীতার সার কি? এটাই। হয় ঠাকুর তোতাপুরীর কাছে এই রকম কিছু শুনেছিলেন। কিন্তু গীতার

শঙ্করভাষ্য তিনি কোথাও কারুর কাছে শুনেছিলেন, এই কথা কোথাও আমরা পাই না; আর সম্ভাবনাও কম। ঠিক ঠিক এটা বলা খুব আশ্চর্যের, কারণ শঙ্করাচার্যও একই কথা বলেছেন, যেটা ঠাকুর এখানে বলছেন –এটাই গীতার সার। শেষমেশ তোমার পাপ-পূণ্য, তোমার চাহিদা-অচাহিদা, তোমার কাম-ক্রোধ, সব কিছু ছেড়ে আমাতে চলে এসো। তার মানে শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলে মিশে যাওয়া। আর আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব। অর্থাৎ, আর সংসারে তোমাকে আসতে হবে না। তুমি আর কোনদিন পাপপূণ্যের চক্করে পড়বে না। তুমি চিরজ্ঞানী হয়ে যাবে।

তিনি সব ভার লবেন। তখন সব বিকার দূরে যাবে। এ-বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এই দেখুন, ঠাকুর এত কিছু বললেন, বিকারের ঔষধ আছে বলে সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –এ-বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? না, বোঝা যায় না। যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, চিত্তবৃত্তির ব্যাপারটা, সম্ভব না। বুদ্ধি নিশ্চিত করে দেয়, এই জিনিসটা এই। ভগবান কোন বস্তু নন, আত্মজ্ঞান কোন বস্তু না। সেইজন্য বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। আমরা যেভাবে বিচার করে কোন জিনিসকে বোঝার চেষ্টা করি, এক্ষেত্রে সেইভাবে সম্ভব না।

একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে? এই যে বোধ, সংসার বোধ থেকে উপরে নিয়ে যাবেন, তিনি না দিলে হয় কি? কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি যদি মনে করেন, আপনি আলাদা, ঠাকুর আলাদা; ঠাকুর আপনাকে সুপার কম্প্যুটার মাধ্যমে এই পথ সেই পথ বলে দেবেন, তা কখনই হবার নয়। অন্তর্যামী রূপে তিনি আপনার ভিতরে রয়েছেন, মা-বাবা রূপে তিনি সামনে রয়েছেন, আচার্য রূপে, হিতৈষী রূপে আপনার আশেপাশে আছেন, তাঁদেরকে দিয়ে তিনি আপনাকে বলে যাচ্ছেন, এইটি কর, এইটি করো না। আর আপনার যে নিজের মন, যে মন আচার্যদের কাছে শুনে, শাস্ত্র শুনে, বিচার করে, গুরুর কথা শুনে ঠিক ভাবে চিন্তা করা উচিত, সেই মন দিয়ে হয়। যার মধ্যে কোন স্বার্থ থাকবে না, কামিনী-কাঞ্চনের গন্ধ থাকবে না, সংসারের প্রতি কোন আসক্তি থাকবে না।

তাই বলছি –তাঁর শরণাগত হও –তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে? মানুষের মন যখন মন রূপে থাকে, তখন তার কোন শক্তি নেই। এই মন যখন আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়, সে তো ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেল। চাইলে সেই মন ত্রিভুন দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এই কথা বলার পর এই প্রসঙ্গ শেষ হয়ে যায়। আর কথামৃতে আমাদের পঞ্চোদশ পর্বটাও এখানে সমাপ্ত হল।